মিলনান্তক

নারায়ণ সান্যাল

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়—১৩৪৯

প্রকাশক
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

ডিং-ডং···ডিং ডং···

মিউজিক্যাল কল বেল। আওয়াজটি শ্রুতিমধুর। সেটা অবশ্য কোনও সান্ত্বনা নয়। বেজার হবার পক্ষে কর্কশ-নিনাদী 'বাজার'-এর সঙ্গে কোনও ফারাক নেই তার। উঠে বসল ডক্টর বসু। পাশের খাটেই শুয়ে আছে বন্দনা। চোখ পিটপিট করে বন্দনাকেই প্রশ্নটা পেশ করে: সাত সকালে কে এল জ্বালাতে? দুধওয়ালা?

বন্দনা পাশ ফিরে শোয়। পাশ-বালিশটা আঁকড়ে ধরে। ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে কোনমতে জবাব দেয়, দুধওয়ালা বোতল রেখে চলে যায়। দেখ গে, তোমার কোন পাওনাদার!

পাওনাদার? পাওনাদার কেন হতে যাবে? রুগীও তো হতে পারে। স্লিপারটা পায়ে গলাতে গলাতে স্বগতোক্তি করে, রোববারেও যে মেজাজে ঘুমাব তার জো নেই···

বন্দনা চোখ খোলে না। নিমীলিত নেত্রে বলে, চটছ কেন? রুগীপত্তরও তো পথ ভুলে আসতে পারে!

কুনাল জবাব দেয় না। বন্দনা ওর মনের কথাটাই বলেছে, কিন্তু 'পথ ভুলে' কথাটার খোঁচা দিতেও ছাড়েনি। ডক্টর কুনাল বসুর পসারটা জমেনি এখনও। বছরখানেক বিয়ে করেছে, চেম্বার খুলে বসেছে, কিন্তু আশানুরূপ পসার জমাতে পারে নি এই নতুন পাড়ায়।

ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা প্লাস্টিকের পর্দাটা টেনে দেয়—অর্থাৎ তার এক-কামরা ফ্ল্যাটকে দ্বিখণ্ডিত করে।

হ্যাঁ, এক কামরার ফ্ল্যাট। না একতলা, না দোতলা। মাঝামাঝি। মেজানাইন তবে ঘরটা বড়। সংলগ্ন বাথরুমও আছে। নিচেটা গ্যারেজ নয়, ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেনসারি। পর্দাটা টেনে দেওয়ায় দরজার দিকে এক-চিলতে একটা ড্রয়িং-রুম পয়দা হল। খান দুই সোফা, একটা সোফা-কাম-বেড আর সেন্টার টেবিল কোনায় একটা পুতুলের আলমারি, তার উপর ট্রান্‌জিস্টার। পর্দার ওপাশে বন্দনা যে শুয়ে আছে, পর্দা টেনে দেওয়ায় সেটা আর নজর হয় না।

ডিং-ডং···ডিং-ডং!

নবাব খাজা খাঁ! সবুর সইছে না···স্বগতোক্তি করে আবার। দরজাটা খুলে দিতেই একগাল হাসির মুখোমুখি হল কুনাল বসু। বাঁ বগলে ছাতা, ডা- হাতে

একটা চুবড়ি, উর্ধ্বাঙ্গে হাফ-হাতা গেরুয়া পাঞ্জাবি, নিম্নাঙ্গে টিবিও-ফিবুলার মাঝামাঝি-তক্ খেটো ধুতি, একগাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কপালে আধুলির মাপে সিঁদুরের টিপ এবং এক মুখ হাসি।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল ডক্টর বোসের, ও আপনি! কি ব্যাপার এত সকালে?

—সকাল আর কোথায় বাবাজী? বেলা সাতটা বাজে যে!

—তা বাজুক। কিন্তু আপনি কি মনে করে? এ মাসের চেক্ পান নি?

হাঁ হাঁ করে ওঠেন বৃদ্ধ, একী কথা বাবাজী! মেঘলা হলে সূর্য্যিও কাজে ফাঁকি দেয়। কিন্তু তোমার মাসান্তের চেক প্রথম হপ্তা পেরয় না···

—তা হলে?—দ্বারপথ প্রায় রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে কুনাল।

বৃদ্ধ বোধকরি একটু অপমানিত বোধ করেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্ষুব্ধতার আভাস, তোমার সঙ্গে আমার কি শুধু টাকারই সম্পর্ক? তোমার বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তত্ত্বতালাশ নিতেও তো আসতে পারি? না কি?

কুনাল এবার দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়। বলে, তাহলে বসুন ঐ চেয়ারে। একটু মুখে-চোখে জল দিয়ে আসি—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে! আমি বসছি। তুমি মুখ হাত ধুয়ে এস। আমার তাড়া নেই।

মসৃণ মোজেইক মেজেতে ক্যাম্বিস জুতোর কর্দম-আলিম্পন রচনা করতে করতে করালীচরণ গিয়ে বসলেন গদি-আঁটা সোফায়।

এ ঘরে ফিরে আসতেই বন্দনা ফিসফিস্ করে প্রশ্ন করে, কে গো? পাওনাদার না রুগী?

টুথব্রাশে পেস্টের প্রলেপ লাগিয়ে বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে কুনাল জবাব দেয়, দুটোর একটাও নয়। কুটুম। তত্ত্বতালাশ নিতে এসেছেন।

—কুটুম! কে গো?

—নামটা আর করব না। তোমার হিণ্ডালিয়াম-হাঁড়িও হাঁ হয়ে যেতে পারে!

—বুঝেছি! মক্ষিচুষ! দিনটা আজ ভালয় ভালয় কাটলে হয়।

করালীকিঙ্কর সাহার ঐ রকম একটা বদনাম আছে বটে। সকালে তাঁর মুখদর্শন করলে সারাটা দিনে একটা-না-একটা অঘটন ঘটবেই। করালীকিঙ্কর কুনালের পিতৃবন্ধু। বাবা স্বর্গে গেছেন, কিন্তু বন্ধুত্বের নাগপাশ এখনও জড়ানো —বন্ধুপুত্রের মজ্জায় মজ্জায়। রুণু, মানে কুনালের বোনের বিবাহের সময় রানাঘাটের পৈতৃক বাড়িটা বন্ধক দিয়ে কুনালের বাবা করালীর কাছে কিছু

কর্জ করেছিলেন। জীবদ্দশায় সে ঋণ শোধ হয়নি—কুনালের মেডিকেল কলেজে পড়ানোর খরচ যোগাতে ঋণভার বরং বেড়েই গেছে। পিতার মৃত্যুর পর ঐ কুসীদজীবীর সঙ্গে সে একটা রফা করেছে। সুদে-আসলে মিশিয়ে মাসে সে চারশ' টাকা করে শোধ দিয়ে যাচ্ছে। অ্যানুইটির হিসাব মতো আরও এক বছর—না এক বছর নয়, তের মাস এই ঋণের বোঝা ওকে টেনে যেতে হবে। তারপর মুক্তি। এবং তারপরেই পৈতৃক ভিটার দলিল ও দখল ফেরত পাবার আশা। কুনাল পাস করে বেরিয়েছে আজ মাত্র বছর দেড়েক। পসার এমন কিছু জমেনি। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকজন পসারওলা ডাক্তার আছেন। এটা ওর কর্মক্ষেত্র নয়, ওর ভাষায় জাম্পিং বোর্ড! কুনালের বাবা ছিলেন রানাঘাটের নামকরা ডাক্তার। সেখানেই ও পাকাপাকি গিয়ে বসবে। কিন্তু যতদিন না ঐ পৈতৃক ভিটার দখল পাচ্ছে ততদিন সে মোলাসেস্-এ স্যাণ্ড! ঋণ শোধ করাটাই এখন ওর মূল লক্ষ্য। ঐ ঋণ সম্বন্ধে একটা রহস্য ওকে নিরন্তর পীড়িত করে —অনেক গবেষণা করেও রহস্যটার কোন কিনারা হয়নি। বাবা মৃত্যুশয্যায় ওকে বলে গিয়েছিলেন—করালীর কাছে তাঁর সাত হাজার টাকার ঋণ আছে—হিসাবের খাতাও তাই বলে, কিন্তু শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পর করালী যে বন্ধকী তমসুকখানা বার করলেন, তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল ঋণের পরিমাণ বিশ হাজার টাকা! না, কোন কাটাকুটি নেই, কোন কারচুপির ইঙ্গিতমাত্র নেই —বাবার সইটাও সন্দেহাতীত। সাক্ষী হিসাবে যে দুজনের নাম আছে তার একজন স্বর্গতঃ অপরজন নগেন মজুমদার। তিনিও জানালেন, তার যতদূর স্মরণ হয় করালী নগদে বিশ হাজার টাকাই দিয়েছিলেন। অগত্যা মেনে নিতে হয়েছিল কুনালকে। সেই ঋণভারে কুনাল কুব্জপৃষ্ঠ। তার জীবনের প্রভাতকালটাই পঙ্গু হয়ে পড়েছে। এক কামরার এই মেজানাইন ঘরে দিন গুজরান করে চলেছে কোনক্রমে। দিবারাত্র পরিশ্রম করে। সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত নিচের ডিস্পেনসারিতে রুগী দেখে। দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত কাজ করে 'ওরিয়েণ্টাল ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারিতে।' কুনাল মূলতঃ প্যাথলজিস্ট। বীক্ষণাগারের অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে রোগনির্ণয়েই তার পারদর্শিতা। তবে প্র্যাকটিসটাও রেখেছে। তাই বিকালে বাড়ি ফিরে আবার রুগী দেখতে বের হয়—সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টা। একটা পুরানো মরিস মাইনর গাড়ি কিনেছে। নিজেই চালায় দিবারাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা রোজগার করে তার একটা বৃকোদরভাগ তাকে পাঠিয়ে দিতে হয় ঐ কুসীদজীবীকে। আরও তের মাস তাকে ঐ কৃচ্ছ্রসাধন করে যেতে হবে। তারপর সখ-আহ্লাদের কথা। তাও

কি হবে? তারপরই এখানকার পাট চুকিয়ে নতুন করে বসতে হবে রানাঘাটে, ওর পৈতৃক ডিস্‌পেনসারিতে। তারও একটা মোটা খরচ আছে। বন্দনা অনেকদিন ধরেই বলছে ইন্সটলমেণ্টে একটা ফ্রিজ কিনতে। রানাঘাটের বাড়িটা মেরামত কথারও দরকার। চুনবালি খসে খসে পড়েছে জানলা দরজার অনেকগুলো পাল্লা অনেককাল না-পাল্টা। বুড়ো ভাম একটা পয়সাও খরচ করে না মেরামত বাবদ। কেন করবে? গচ্ছিত ধন-বইতো নয়!

আধঘণ্টা পরে। ঠিকে ঝি এসে গেছে। বন্দনা মুখ-হাত ধুয়ে জনতা স্টোভে চায়ের জল বসিয়েছে। কতদিন ধরে বন্দনা বলছে একটা পোর্টেবল গ্যাসের ব্যবস্থা করতে। তা ওর কর্তা কানেই তোলে না। গ্যাসে কত সুবিধা কেরোসিন পাওয়া কি সোজা? অথচ গ্যাসের সিলিণ্ডার এখন নাকি সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। ফোন করে দেওয়ার দিন তিনেকের মধ্যেই—নমিতাদি বলছিল। অবশ্য কুনালকেও দোষ দেয় না বন্দনা—ঐ করালীবুড়োর করাল গ্রাস থেকে মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু সবার আগে উদ্ধার করা চাই। বন্দনা তার সব সখ-আহ্লাদ আপাতত শিকেয় তুলে রেখেছে। এখনও সংসারে তৃতীয় প্রাণী আসেনি। সে এসে পড়ার আগেই···হে ঠাকুর! দেখ, যেন ঐ করাল করালী এসে তারও মুখের গ্রাস কেড়ে না নেয়।

গোপালের মা?—বন্দনা ডাকে এ-ঘর থেকে।

যাই মা—ঠিকে ঝি সাড়া দেয়। ঘর মুছছিল সে। ন্যাতাটা বালতিতে ডুবিয়ে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, ডাকলে?

ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠস্বর গোপালের মায়েরও রপ্ত হয়ে গেছে। কুল্লে একখানি তো মাত্র ঘর, পর্দা দিয়ে ভাগাভাগি করা। এ-প্রান্তের আলাপচারি ও-প্রান্তে বসে সহজেই শোনা যায়। তাই কণ্ঠস্বর খাদে নামানো সকলেরই অভ্যাস হয়ে গেছে। বন্দনা বললে, হ্যাঁ। এই এক কাপ চা বাইরের ঘরে দিয়ে এস তো। একজন বুড়ো মতন···

গোপালের মা হাসি চাপে। বাইরের ঘর! মা এমন ভাব দেখায় যেন তিন-কামরার ফ্লেলাট-বাড়ির ভাড়াটে! নলচের আড়ালে যে বুড়ো মতন বাবু বসে আছেন তা যেন গোপালের মায়ের জানতে বাকি। সে শুধু বলে, উনি কে মা? বাবুর কোন আত্মীয়?

রুগী যে নয় তা গোপালের মা বুঝেছে। রুগীরা উপরে আসে না, এলেও তাদের চা খাওয়ানোর রেওয়াজ নেই। গৃহকর্ত্রীর আত্মীয় নয়—গোপালের মা জানে—গিন্নিমায়ের কোন আত্মীয় কস্মিনকালেও পথভুলে আসে না। শুনেছে

গিন্নিমায়ের বাপ-মা নেই, থাকার মধ্যে আছে এক দিদি, আর এক মামা। তাদের সঙ্গে গিন্নি মায়ের নাকি বনিবনাও নেই। তাছাড়া গিন্নিমায়ের আত্মীয় হলে পর্দার ওপারে অমন উবু হয়ে বসে থাকত না। সুতরাং ডাক্তারবাবুর আত্মীয় হওয়াই স্বাভাবিক।

বন্দনা ওর কৌতূহল চরিতার্থ করে না। প্রতিপ্রশ্ন করে, বাবু বাথরুম থেকে বেরিয়েছেন?

এই এক ন্যাকামি! আবার মনে মনে হাসে গোপালের মা। যেন কলঘর বাড়ির—হুই ও-প্রান্তে! কলঘর থেকে মানুষটা বেরুলে তুমি দেখতে পেতে না? মায়ের ভাবখানা যেন সাতমহলা বাড়ির কোথায় কি ঘটছে তার খবরাদি করতে গিন্নি-মা হিম্‌সিম খাচ্ছেন। গম্ভীরভাবে বললে, না তো।

কুনালের ধরনই ঐ রকম, ভাবে বন্দনা। শ্রীবিষ্টু বলে একবার বাথরুমে ঢুকতে পারলে হল। অবশ্য দিনে ঐ একবার। দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, স্নান-সবকিছু একবারেই সেরে নেয়। ধড়াচূড়া একবার শ্রীঅঙ্গে ওঠালে সেই রাতের আগে খোলে না।

একটু পরে গোপালের মা পর্দা সরিয়ে এ ঘরে ফিরে আসে। তার হাতে একটি চুবড়ি। তাতে জবাফুল, বেলপাতা এবং সাত-আটটি চিনি সন্দেশ। বললে, বুড়ো বাবু এইটা তোমারে দিতে বললেন। ৺মায়ের থানে গেছিলেন। পেসাদ। এই এক বখেড়া জুটল—কালীঘাটের প্রসাদ। না যাবে মুখে দেওয়া, না যাবে ফেলা। ফেললে মায়ের অভিশাপ, মুখে দিলে ফুড-পয়জন। বন্দনা চুবড়িটা মাথায় ঠেকিয়ে বললে, তুমিই এটা নিয়ে যাও গোপালের মা। ছেলেপিলেকে দিও।

—আর বুড়োবাবু বললে, দু খানা বিস্কুট দিতে। বললে, সাতসকালে বাসি মুখে কালীঘাট গেছিল। বাসি পেটে চা খাবে না।

বন্দনা বিনা বাক্যব্যয়ে একটি প্লেটে খানচারেক বিস্কুট এবং দুটি সন্দেশ—ঐ প্রসাদীসন্দেশই, ধরিয়ে দিল গোপালের মায়ের হাতে।

আরও আধঘণ্টা পরে কুনাল এসে বসল বৃদ্ধের মুখোমুখি। বললে, এবার বলুন?

বৃদ্ধ একগাল হাসলেন। বলেন; এস বাবাজী, বস! তারপর? পসার কেমন জমছে? বৌমার শরীর-গতিক ভালো তো?

কুনাল পুরো দশ সেকেণ্ড অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধের দিকে। তারপর পুনরুক্তি করল, এবার বলুন?

ঢোক গিললেন করালী। গলকণ্ঠটা ওঠানামা করল বার কতক। বললেন,

তা বটে, তুমি ব্যস্ত মানুষ, কুশল আলোচনায় সময় কোথা? তোমার কাছে একটা ডাক্তারী পরামর্শই নিতে এসেছি বাবা।

—বলুন? তবে একটা কথা বলে রাখি। বাড়িতে আমি কন্‌সালটেশন ফি নিই চার টাকা।

বৃদ্ধ শুধু বাঙলা স্বরবর্ণ মালার আদ্যঅক্ষরটা শুনিয়ে দিলেন।

তারপর যেন সামলে নিয়ে বলেন, তা তো বটেই। তা দেব। আমার যেমন তেজারতী কারবার তোমার তেমনি ডাক্তারী কারবার—

কুনাল একটা সিগ্রেট ধরালো। করালীর সামনে সে ইতিপূর্বে সিগারেট খায়নি, আজ ইচ্ছে করেই খেল। আজ করালী তার পিতৃবন্ধু নন, ক্লায়েণ্ট। কাঠিটা ছাইদানিতে রাখতে রাখতে বললে, আজ্ঞে না। আপনার তেজারতী কারবার ছাড়া আরও পাঁচটা রোজগারের ব্যবস্থা আছে—কাটচেরাইয়ের কল আছে জঙ্গল ইজারা নেওয়া আছে, কোষ্ঠীবিচার, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আছে—আমার শুধু এই একটিই উপার্জনের রাস্তা।

বৃদ্ধ নির্বিকারভাবে কোঁচার খুঁটটা খুললেন। একটু কাত হয়ে বসলেন। তারপর চারখানি একটাকার মলিন নোট বের করে সেণ্টার-টেবিলে কাগজচাপার তলায় চাপা দিয়ে বললেন, এবার তাহলে কাজের কথায় আসি?

কুনাল নোট চারখানি পকেটস্থ করে বললে, আসুন।

—'লিউকেমিয়া' কাকে বলে বাবা?

খণ্ড মুহূর্তের জন্য কুনালের মনে হল সে বুঝি আজও ডিগ্রি পায়নি। ভাইভা-বোর্ডের সামনে এসেছে মৌখিক পরীক্ষা দিতে। সামলে নিয়ে বলে, Leukaemia, whether acute or chronic, is a type of blood-cancer when the leucocytes or white blood cells in the blood becomes abnormally high. There are two types, according to the kind of white blood cells affected, namely polymorphs or lymphocytes. In the former case···

কুনালকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে করালী কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, সাদা বাঙলায় একটু বুঝিয়ে বলবে বাবাজী?

—বলব। যদি সাদা বাঙলায় প্রশ্নটা পেশ করেন। হঠাৎ ঐ উৎকট রোগটি সম্বন্ধে এমন অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়লেন কেন? রুগী কে? তার ঐ রোগ হয়েছে তা কি করে বুঝলেন?

করালীকিঙ্কর কিন্তু অত সহজে তাঁর হাতের তাস দেখাতে রাজী হলেন না।

ফি যখন দিয়েছেন, তখন ইচ্ছা মতো প্রশ্ন করার হক তাঁর বর্তেছে, ভাবখানা এই রকম। বলেন, ও রোগের কি চিকিচ্ছে নেই? শিবের অসাধ্য?

কুনাল আত্মসংবরণ করল। করালীকিঙ্কর যে কী জাতের মানুষ তা ভাল-মতই জানা আছে ওর। তিনি নানান বিদ্যায় পারদর্শী। বহু রকম বিভূতি পেয়েছেন। খালি হাতে পদ্মগন্ধ আনতে পারেন। সাদা জলের গেলাস নামাবলী চাপা দিয়ে মুহূর্তে তা শরবতে রূপান্তরিত করতে পারেন। শোনা যায়, যাগ-যজ্ঞ করলে নাকি দশ টাকার নোট একশ টাকাতে রূপান্তরিত করাও সম্ভব। কুনালের অবশ্য সবই শোনা কথা, তবে প্রত্যক্ষদর্শীকে বলতে শুনেছে। সাত হাজার টাকার বন্ধকী-তমসুকটা বিশ হাজার টাকায় রূপান্তরিত হওয়া যদি 'বিভূতি' না হয়! কুনালের বাবা রামতারণ বসু একবার তাঁর বন্ধুর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, করালী যদি ভুলে একধা পেরেক খেয়ে ফেলে তাহলে ওর পেট চিরে পাওয়া যাবে ক্ষুর! তাই কুনাল জবাবে বললে, লিউকেমিয়া অনেক জাতের হতে পারে। কোনটা সারানো যায়, কোন-কোনটা বিদেশে সারানো যায় বলে শুনেছি, ভারতবর্ষে যায় না। কোনটা সত্যই শিবের অসাধ্য।

—অসুখটা কেমন করে ধরা যায়?

—রক্ত পরীক্ষা করালে।

—না হলে নয়? নাড়ি টিপে, বুক দেখে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না?

কুনাল অসীম ধৈর্যে বললে, না!

—ধর আমি যদি একজন লিউকেমিয়ার রুগীকে নিয়ে আসি, তুমি তার রক্ত পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবে তার কোন জাতের 'লিউকেমিয়া' হয়েছে? মানে ঐ শিবের অসাধ্য ব্যামো কি না?

—পারব। কিন্তু কেন বলুন তো? কার কী হয়েছে?

—একেবারে হাণ্ডেড-পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে— লোকটা কদ্দিন বাঁচবে?

কুনাল তার ক্লায়েন্টকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, মিস্টার সাহা! আপনার সঙ্গে এভাবে হারাদিন বকবক করবার সময় আমার নেই। আপনি এবার 'আনতে' পারেন। আপনার কনসালটেশান শেষ হয়েছে!

ধক্ করে জ্বলে উঠল বৃদ্ধের দুটি কোটরগত চোখ। মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে প্যাকেট-বাঁধা একটা পুলিন্দা বার করে রাখলেন টেবিলে। ধীরে সুস্থে খুঁট খুলে তার গর্ভ থেকে বার করলেন দুখানি কাগজ। বললেন, কুনাল, তুমি কাজের মানুষ। বড়লোক। আমিও

কিন্তু গাঁয়ের গরীব চাষী নই। ইনকাম্‌ট্যাকসো দিয়ে থাকি। এই কাগজ দুটো চিনতে পার? এখানা তোমার বাস্তুভিটার দলিল আর এখানা সেই বন্ধকী তমস্থক।

কুনাল স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে থাকে।

আমার প্রশ্নের ঠিক মতো জবাব দিলে, আমি যা চাইচি তাতে সাহায্য করলে আমি এই কাগজখানা তোমাকে ফেরত দেব, আর এই তমস্থকখানা তোমার সামনেই পুঁড়িয়ে ফেলব। আমি সাত সকালে তোমার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতে আসিনি বাবাজী!

কুনাল সামলে নিল নিজেকে। বললে, এবার বলুন, রুগী কে?

বৃদ্ধ সে প্রশ্ন শুনতে পেলেন কি না বোঝা গেল না। ফিরে গেলেন তাঁর পূর্ব প্রশ্নে, রক্ত পরীক্ষা করে তুমি বলতে পারবে—লোকটা কতদিন বাঁচবে?

কুনাল ভিন্ন পথ ধরে। বোঝে এ বৃদ্ধকে প্যাথলজি বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম। শকুনিটা কিছু একটা মতলব নিয়ে এসেছে। বোধকরি কোনও অধর্ণ কতদিন বাঁচবে সেটা নিশ্চিত জানতে চায়। অথবা কোনও শাঁসালো যজমানের উইল-ঘটিত কোনও ব্যাপার। কৌতূহলই জয়ী হল। শুধু কৌতূহল নয়, ওর চোখের সামনে লোভনীয় দুখানা কাগজও পড়ে আছে। কুনাল সজ্ঞান মিথ্যা ভাষণ করল, রক্ত পরীক্ষা করলে বলতে পারব।

—ঠিক কত মাস বাঁচবে?

—ঠিক কত সপ্তাহ বাঁচবে!

—কত 'ফি' দিতে হবে?

—চুয়ান্ন টাকা।

—ঠিক আছে। তাই দেব। কালকেই তোমাকে নিয়ে যাব রুগীর কাছে। কখন আসব বল?

—রুগীকে ল্যাবরেটারিতে আনতে পারেন না?

—কী দরকার? জ্বরটা নেই, তবু দুর্বল আছে এখনও। আর জানাজানিটা যত কম হয় ততই ভাল।

—ঠিক আছে, কাল বিকাল চারটের সময় আসুন। বাড়িতে নয়, আমার ল্যাবরেটারিতে। ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি—

—ঠিকানা দিতে হবে না বাবাজী। আমি চিনি। কিন্তু একটা সর্ত আছে। এসব কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না। রুগীকে বা তার আত্মীয়স্বজনকে তো নয়ই, এমন কি বৌমাকে পর্যন্ত নয়।

—বৌমা! বৌমা কে?

—রামতারণের পুত্রবধূ।

—ও! কিন্তু মানে ··আপনার মতলবটা কি খুলে বলুন তো?

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছেন ততক্ষণে। বলেন, মতলব আবার কিসের?

কুনাল গম্ভীর হয়ে বলে, বসুন। দেখুন মিস্টার সাহা। আমি খোলা কথার মানুষ। আপনি তিন জাতের স্ট্যাণ্ড নিতে পারেন। এক নম্বর, খোলা-মেলা ব্যাপার। আপনি আমাকে প্রফেশনালি এনগেজ করেছেন। আমি তাতে রাজী। সে-ক্ষেত্রে আগামীকাল আপনি আমাকে যে রুগীর কাছে নিয়ে যাবেন, যার জন্য আপনি আমাকে প্রফেশনাল ফি দিচ্ছেন তাকে আমি দেখব, কিন্তু আপনিই বলুন মিস্টার সাহা, সেক্ষেত্রে রুগীকে দেখে আমি যা বুঝলাম তা আমি তাঁর আত্মীয়স্বজনকে বলে আসতে পারি। পারি না? আমার প্রগ্‌নসিস্‌টা আমার স্ত্রীর কাছ থেকেও গোপন রাখব কেন? আপনি চুয়ান্ন টাকা ফি দিয়েছেন বলে? বৃদ্ধ নির্বাক, কিন্তু ধীরে ধীরে পুনরায় বসে পড়েন।

—দ্বিতীয়ত, যে জন্য আপনি ঐ দলিল দুটি আমাকে দেখালেন এবং বললেন যে, আমি সহযোগিতা করলে আপনি আমার রক্ত শোষণ থেকে বিরত হবেন—যার বিনিময়ে আমি আমার ধর্মপত্নীর কাছ থেকেই কথাটা গোপন রাখব—আপনি সে পথেও চলতে পারেন। পারেন না?

বৃদ্ধ এখনও নির্বাক।

—তৃতীয়, আপনি হাত ধুয়ে ফেলে অন্য কোনও ডাক্তারের দ্বারস্থ হতে পারেন। তাতেও আমার আপত্তি নেই। এবার বিবেচনা করে বলুন মিস্টার সাহা, আমাদের সম্পর্কটা কোন জাতের। অর্থাৎ কোন পথ আপনি চলতে চান?

বৃদ্ধ এর পরেও অনেকক্ষণ কথা বললেন না। তারপর মুখ তুলে বললেন, তার আগে আমাকে একটা কথা বলতে বাবাজী। তুমি কি এল. আই. সি-র লাইসেন্স ডাক্তার?

কুনাল এই অসঙ্গত প্রশ্নের ধরনটা ধরতে পারে না। একটু অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলুন তো? আপনি কি আজকাল ইন্সিওরেন্স-এর দালালীও করছেন নাকি?

হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালেন করালী। গুছিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে গেলেন, আজ নয় বাবাজী! কাল বলব।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল কুনাল। হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল তার মাথায়। ডেকে ওঠে, দাঁড়ান।

বৃদ্ধ ঘুরে দাঁড়ালেন দ্বারের কাছে।

কুনাল বললে, আপনার পরিকল্পনাটা আমি বুঝতে পেরেছি করালী কাকা। কিন্তু না।···আমি ওর মধ্যে নেই। এ অসম্ভব। এ তো সর্বনেশে কথা।

বৃদ্ধের চোখ দুটি ছোট ছোট হয়ে গেল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বললেন, আজ নয়। কাল সবটা বলব। তোমার কোনও রিস্ক থাকবে না। আর প্রাপ্তিটাও তো বড় কম নয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। মোটকথা, কালকের আগে একদম মুখ খুলবে না কুনাল। আমার প্রস্তাবটা শুনে দেখ, বাজিয়ে দেখ। তোমার কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকলে তোমাকেই বা আমি জড়াব কেন বাবাজী? তুমি তো আমার বন্ধু রামতারণের ছেলে।

॥ ২ ॥

—অফিসে যাবার আগে আমাকে গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে যাস্‌তো বড় খুকি।

অতসী জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে যাচ্ছিল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে। নটা পঁয়ত্রিশের বাসটা ধরতে না পারলে অফিসে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে। সওদাগরি অফিস—হাজরিটার দিকে কড়া নজর। সকালের এই সময়টা অতসী ডানে-বাঁয়ে তাকাবার অবকাশ পায় না। তবু তাকাতে হল। ওর বড় মামা বলাই গাঙ্গুলী বারান্দার ও-প্রান্তে বসে বাঁ হাতে দাড়ি কামাচ্ছে। আগে দৈনিক ক্ষৌরি করত, এখন হপ্তায় দুদিন। কামানোর সরঞ্জাম আর হাত-আয়না নিয়ে সে বসেছে আসন পেতে। সেখান থেকেই কথাটা ছুঁড়ে দিয়েছে।

অতসী দড়িতে টাঙানো গামছাটা পেড়ে নিয়ে বললে, টাকা! কি হবে?

সেফ্‌টি রেজার,—নাহলে রক্তারক্তি কাণ্ডই ঘটে যেত একটা। চড়াৎ করে ঘুরে বসেছে বলাই। চোখ পাকিয়ে বলে, কি হবে মানে? টাকা দিয়ে লোকে আবার কী করে? খরচ করে।

—তা তো জানি, কিন্তু কিসে খরচ হবে?—চল্‌তে চল্‌তে প্রশ্ন করে অতসী।

—তুই কি আমার কৈফিয়ৎ চাইছিস? আমার হাত-খরচা বলে কিছু থাকতে নেই!

থেমে পড়ে অতসী। ঘুরে দাঁড়ায় বাথরুমের দোরগোড়ায়, বলে, কী আশ্চর্য! চটছ কেন বড়মামা? হাত-খরচা তো তোমাকে মাসের প্রথমেই দিয়েছি! মাসের এই শেষ শনিবারে হঠাৎ বেমক্কা কুড়িটা টাকা—

ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলাই বললে, চটি কিনব। চটি জোড়া একেবারে ফাৎলাফাই হয়ে গেছে। আর তাপ্পি দেওয়া চলছে না।

—ওঃ চটি। তা বেশ তো, পায়ের মাপটা দিও, অফিস থেকে ফেরার সময় কিনে আনব।

বলাই দুম করে উঠে দাঁড়ায়, কেন? তুই কিনবি কেন? আমার চটি আমি কিনব। চিরকাল কিনিনি? তুই বাজারের কী জানিস?

অতসী জবাব দেয় না। বাথরুমের দ্বার পথে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসে। মা যেমন হাসে, স্কুল-পালানোর ইচ্ছা নিয়ে ছেলে যখন বলে, মা, পেট কামড়াচ্ছে।

—কী? হাসছিস যে? হাসির কি হল এতে!

অতসী জবাব দেয় না। শাড়ি-সায়া নিয়ে স্নানঘরে ঢুকে যায়।

মামা-ভাগ্নীর ছোট্ট সংসার। দেড় কামরার। অতসী এই মামার কাছে মানুষ। মামী মারা যাবার পর সেই এখন সংসারের কর্ত্রী। শুধু তাই নয়, তারই উপার্জনে চলছে এই দুজনের ছোট্ট সংসার। আজ বছর পাঁচেক। বলাই বর্তমানে বেকার। তার ডান হাতখানা কনুই থেকে কাটা। করাত-কলে এক দুর্ঘটনায় সে আজ পঙ্গু—অতসীর উপার্জনের ভাগিদার, কিন্তু সেজন্য বলাই সঙ্কোচ করে না কিছু। কারণ বাপ-মরা ঐ অতসীকে সেই মানুষ করেছে—শুধু অতসীকে নয়, তার ছোট বোন বন্দনাকেও। বন্দনার বিয়ে দিয়েছে—ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছে তার। নির্ঝঞ্ঝাট সংসার, বন্দনার বর পাসকরা ডাক্তার। প্যাথলজিস্ট। দিব্যি পসার জমাচ্ছে। অতসীটা অবশ্য বিয়ে করেনি। ভালই করেছে—না হলে আজ ঐ পঙ্গু মানুষটাকে কে দেখভাল করত? কারখানা থেকে বলাই অবশ্য মাসে বিশ টাকা করে পেনশন পায়। পেনশন নয়, খেসারতি। পেত না, পাচ্ছে শুধু ঠাকুর মশায়ের সহৃদয়তায়। নগেন মজুমদার একটি হারামজাদ ব্যক্তি! তোর কারখানার করাতকলে একটা মানুষ তার ডান হাতখানা খুইয়ে এল তবু দয়া হল না তোর? প্রমাণ করাতে চাইলি—বলাই গাঙ্গুলী নিজের দোষেই হাতটা খুইয়েছে। সে মত্ত অবস্থায় ছিল! হয়তো তাই প্রমাণিত হয়ে যেত, হয়তো একটি পয়সাও আদায় হতো না। ইউনিয়ন অবশ্য মামলা ঠুকে দিয়েছিল—কিন্তু মালিকের সঙ্গে মামলা করে শ্রমিক আবার কবে জেতে? ভাগ্যে ঠাকুরমশাই মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটার ফয়শালা করে দিলেন, তাই তো বলাই আজও মাস-মাস বিশ টাকা করে খেসারতি পায়। যতদিন বাঁচবে কোম্পানি তাকে এ টাকা যুগিয়ে যাবে। ঠাকুরমশাই অদ্ভুত কর্মিৎকর্মা মানুষ। সিদ্ধ পুরুষ। নানান জাতের বিভূতি পেয়েছেন! পুজা-আর্চা, সাধন-

ভজন নিয়ে আছেন—কিন্তু দুনিয়ার মানুষের উপকার করে বেড়ান। কার মেয়ের পাত্র জুটছে না, কার ছেলের চাকরি জুটছে না, কোথায় কার অসুখ করেছে—ঠাকুরমশাই হুমড়ি খেয়ে পড়েন। নগেন মজুমদারের স্ত্রী—সেই স্থূলকায়া ভদ্রমহিলা—কি যেন নাম, বলাইয়ের মনে থাকে না—সে নাকি ঠাকুরমশায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছে। সেই হিসাবে উনি হলেন মজুমদার পরিবারের কুলগুরু। তাছাড়া ব্যবসায় সংক্রান্তও কী সব লটঘট আছে। ঠাকুরমশাই জঙ্গলের ইজারা নেন, কাঠ চালান আসে নগেন মজুমদারের কাঠচেরাই কলে। তা সে যাই হোক ঐ ঠাকুরমশায়ের কৃপাতেই বলাই মাসান্তে কুড়িটা টাকা খেসরাত পায়। ঠাকুরমশাই দেবতা।

অতসী আর বন্দনা। পিঠোপিঠি দুই বোন, ভাই নেই ওদের। না, ঠিক পিঠোপিঠি নয়, বন্দনা ওর চেয়ে চার বছরের ছোট। মাকে অতসীর মনে পড়ে না, তা বন্দনার কোথা থেকে পড়বে? বাবা মারা যাবার পর ওরা দু-বোন যখন মামাবাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল তখন অতসীর বয়স নয়, আর বন্দনার পাঁচ। দিদিমা বলত 'উমনি-ঝুমনি'। বলত, 'দু-বোনকে একসাথে এক বুড়ো বরের গলায় গেঁথে দেব।' অতসীকে ভয় দেখাতো, বুড়ো-বরের সঙ্গে বোন-সতীনের ঘর করতে কী সুখ বুঝবি অনে।'

অতসী বুঝতো না। বুঝবার বয়স তখন ছিল না। মা নেই ওদের, ছোট-বোনকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতো। বন্দনাকে ফ্রক পরানো, চুলের জট ছাড়ানো, সাজানো-গোছানো টিপ টিপ করে কিলানো আর তারপর বুকে টেনে নিয়ে সোহাগ করা। সে যেন এক নতুন ধরনের পুতুলখেলা। বন্দনা ওর জ্যান্ত পুতুল। অনুদি, শান্তিমাসীমাদের সে দেখেছে বিয়ের পর ভাইবোনদের ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে। সে বড় দুঃখের। সে বড় বেদনার। তাই দিদিমা যখন বলত—একই বরের সঙ্গে দু-বোনের বিয়ে দিয়ে দেবে তখন নবমবর্ষীয়া অতসী মনে মনে খুশিই হত। ভাবত—এটাতো ভালই; দিদিমা যেমন একপাশে অতসী, একপাশে বন্দনাকে নিয়ে শুয়ে থাকে তেমনিভাবে ওদের সেই বুড়ো বর দু-বোনকে দু-পাশে নিয়ে শোবে। কিন্তু বুড়ো কেন? প্রতীপদার মত চটপটে, গল্প-বলতে-পারা, সদ্য-গোঁফ ওঠা একটা ছোকরা বর হলেই হয়।

বন্দনা রাত্রে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলত, এ্যাই দিদি, বোন-সতীন কাকে বলে রে?

অতসী কিছু না বুঝেই ভারিক্কি চালে বলত, ও-সব পাকা-পাকা কথা তোকে ভাবতে হবে না। নে, ঘুমো।

আজ সেসব কথা মান পড়লে অতসীর হাসি পায়। কী ছেলেমানুষ ছিল ওরা। ছোটখুকি, মানে বন্দনা ওকে এক মুহূর্ত না-দেখে থাকতে পারত না। ভীষণ ন্যাওটা ছিল দিদির। সারা দিন পায়ে পায়ে ঘুরত। তারপর ক্রমে দিন-বদলের পালা এল। দিদিমা স্বর্গে গেল। ছোটমামা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। বড়মামা বিয়ে করল। বড় মামী কিন্তু লোক ভালো। নিজের সন্তান হয়নি, ওদের দু-বোনকেই নিজের সন্তানের মতো মানুষ করতে থাকে। স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল ওদের। ছোটখুকির অবশ্য একেবারেই পড়াশুনায় মন ছিল না। বকে বুঝিয়ে, মেরে অতসী তাকে বাগে আনতে পারেনি। একই মায়ের পেটের বোন, একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে, তবু অতসী তিল তিল করে অনুভব করে বন্দনা স্বতন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার পর থেকেই বন্দনার মনের একটা দিগন্ত ওর কাছে রহস্যঘন হয়ে গেল। আর সে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণের কথা বলে না। বোনকে যেন আর চেনাই যায় না। সে কী ভাবে, কী করে একদিন টের পেল স্কুল পালিয়ে বন্দনা লুকিয়ে ম্যাটিনি-শো সিনেমা দেখেছে। নিশ্চয়ই একা নয়, কিন্তু প্রচণ্ড প্রহার সত্ত্বেও সে স্বীকার করল না—কে ছিল তার সঙ্গে, ছেলে না মেয়ে। পাড়ার এবং স্কুলের বখাটে মেয়েদের সঙ্গে ওর ভাবটা বেশি। কে জানে, বখাটে ছেলেদের সঙ্গেও কিনা। অতসীর মনে হত বন্দনা ভিন্ন-জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

অবস্থাটা ঘোরালো হয়ে উঠল পরপর দুটি দুর্ঘটনায়। হঠাৎ ক'দিনের জ্বরে ভুগে বড়মামী চোখ বুজল। আর ছয়মাস যেতে-না-যেতে একদিন কারখানায় বড়মামার ডান হাতখানা কাটা পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখল অতসী। সে তখন থার্ড ইয়ারে পড়ে। বন্দনা ক্লাস-এইটে ঘষটাচ্ছে। সংসারের সব দায়-দায়িত্ব এসে পড়ল অতসীর ঘাড়ে। রান্নার দায়িত্বটা নিতে হয়েছিল বড়মামী মারা যাবার পর; এবার ঠিকে ঝি-টিকেও ছাড়াতে হল। বাসন মাজা, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা—সবই চাপল অতসীর ঘাড়ে। বন্দনা যে একেবারে সাহায্য করত না তা নয়, বরং অতসীই ওকে ভারী কাজ করতে দিত না। এমনিতেই বন্দনা ছিল কিছু আয়েসী—তার উপর অতসী বলত, ওসব ভারি কাজ করতে হবে না তোকে। তোর হাতে কড়া পড়ে যাবে।

কুনালও ঠাট্টা করে বলত, সেই ভালো। ডিভিশন-অব-লেবার। অতসী বাসন-মাজুক, বাটনা বাটুক আর বন্দনা মশায় টাঙাক, ধোবার হিসেবে রাখুক। যদিও তাহলে মশারিটা হবে উটের পিঠ আর ধোবার খাতায় যোগের ভুল।

বন্দনা চোখ পাকিয়ে বলত, ভাল হবে না কিন্তু কুনালদা। কিল খাবার জন্যে পিঠ সুড়সুড় করছে বুঝি?

কুনাল বলত, তোমার কিল তো পুষ্পবৃষ্টি। ভয় অতসীর কিলকে। হুঁ হুঁ বাবা। রীতিমতো বাসন-মাজা মসলা-পেষা হাত।

কুনাল ততদিনে ঘরের মানুষ হয়ে গেছে। সে তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, নীলরতন সরকারে। বড়মামাকে ঐ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই আলাপ। বড়মামা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরেও যোগসূত্রটা ছিন্ন হয়নি। কুনাল তার আগেই বাঁধা পড়েছে বিনি সুতোর বন্ধনে। সপ্তাহে দু-তিন দিন মামার তত্ত্ব তালাশ নিয়ে আসত। বন্দনা উপস্থিত না থাকলে দুজনে বারান্দার একান্তে রোগীর সম্বন্ধে গোপন আলোচনা করত। সেই রকম একটা সন্ধ্যায় আধো-আলোর আবছায়ায় অতসীর ঐ কড়াপড়া হাতটাকে টেনে নিয়ে—না, না, না। সেসব কথা অতসী আর ভাববে না। সে অধ্যায় ভুলে যেতে হবে। ছোটখুকি আজ সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গেছে—এ সংসারের সঙ্গে কোন যোগসূত্রই রাখেনি; কুনাল ওর স্মৃতিপটে আজ একটা আবছা সুখস্মৃতি।

কী যেন ভাবছিল অতসী? হ্যাঁ, সেই সবহারানোর দিনগুলোর কথা। কিন্তু শুধুই কি সব হারানো? ঐ সব খোয়ানোর পথ বেয়েই তো এসেছিল তার প্রথম বসন্ত। অনাদৃত কুমারীর জীবনে প্রথম প্রেম। নাঃ! আবার ও কথা কেন?

কারখানার দুর্ঘটনার পর মাস-তিনেক বড়মামাকে হাসপাতালে থাকতে হল। রোজ বিকালে অতসী গিয়ে দেখা করত। বন্দনা যেত না, হাসপাতালের গন্ধটা সহ্য হত না তার। অগত্যা সংসারের যাবতীয় দায়ের সঙ্গে এই দায়িত্বটাও নিতে হয়েছিল অতসীকে। ভালই হয়েছিল। বড়মামার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়ে যেত ঐ ছেলেটার সঙ্গে: কুনাল বসু। নিতান্ত বাল্যকালে প্রতীপদাকে ওর ভালো লাগত। এ ছেলেটার রঙ প্রতীপদার মত ফর্সা নয়, অত সুন্দর নয়—কিন্তু ওর হাসিতে মুক্তো ঝরে। অতসী সমস্ত দিনমান উৎকণ্ঠ হয়ে থাকত কখন বিকাল হবে। ভিজিটিং আওয়ার্স আসবে। কোন কোনদিন ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হলে কুনাল ওকে বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যেত। বলত, কাল আসছ তো?

—আসব। আপনি থাকবেন তো?

—কি মনে হয়?

বড়মামা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর বোঝা গেল অবস্থাটা। অর্থ-

নৈতিক অবস্থাটা। রোজগার বন্ধ, অথচ সংসারের আর পাঁচটা দাবী হাঁ করে আছে। তার চেয়েও বড় সমস্যা হল—হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর বলাই গাঙ্গুলী কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করল। একে তো স্ত্রী-বিয়োগে লোকটা দিশেহারা পাগল-পাগল হয়েছিল, ডান হাতখানা খোয়ানোর পর যেন সে অন্য মানুষ। মদ ধরল বেকার মানুষটা। আর ধরল রেস্-এর নেশা। মদ সে আগেও খেত—কখনও সখনও—মামীর সঙ্গে ঝগড়া হলে; অতসী টের পেত। এখন কিন্তু মদই মামাকে খেতে শুরু করল। রেসও খেলত আগে, তাও কালেভদ্রে, মেজাজ খুশ থাকলে। এখন সে উদ্দাম হয়ে উঠল। অতসী দেখেও চোখ বুজে ছিল—কে জানে, সেটাই তার ভুল হয়েছিল কিনা। তবু জীবন-সংগ্রামে পরাজিত ঐ সৈনিকটার প্রতি তার অনুকম্পাই হয়েছিল বেশি—আহা! ও-ভাবেই যদি মানুষটা ভুলে থাকতে পারে তো থাকুক না। বন্দনা অনেক বেশি সাবধানী, অনেক বেশি সংসারাভিজ্ঞ—বারণ করত দিদিকে। বলত, বড়মামাকে হাতে কাঁচা টাকা দিসনি দিদি। ও আমাদের ফতুর করে ছাড়বে।

অতসী বুঝত, কিন্তু রুখে দাঁড়াতে পারেনি। এটা বোধহয় ওর চরিত্রের একটা দুর্বলতা। অন্যায়ের প্রতিবাদে ও সোচ্চার হতে পারে না। চেষ্টা করে মানিয়ে নিতে। না পারলে, সব দুঃখকষ্ট নিজের মাথায় তুলে নেয়। তাছাড়া অতসী তো জানে—বড়মামা চিরকাল এমন ছিল না। দুই ভাগ্নিকে সে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসতো। তাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে, মানুষ করেছে; বলত—আমার যা থাকবে তা তো ওদের দু বোনের জন্যই। আর টাকা? টাকা কার? এল কোথা থেকে? যদি ওড়ায় তবে বড়মামা নিজের টাকাই ওড়াচ্ছে। অতসী কি তার মালিক? ছোটখুকি বলত, তোর আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বালা করে দিদি।

কুনালও বলত, বন্দনা তো ঠিকই বলছে অতসী। তুমি ওকে প্রশ্রয় দাও কেন?

ছোটখুকি তার সমর্থক পেয়ে বলত, বলুন তো কুনালদা, এ দিদির আদিখ্যেতা নয়?

অতসী কোন প্রতিবাদ করত না। মনে মনে হাসত। সে তো জানে—ঐ পঙ্গু মানুষটা একদিনেই কিছু পাষণ্ড হয়ে ওঠেনি। তার পরিবর্তনটা এসেছে তিলে তিলে। একের পর একটা আঘাতে। প্রথমেই দিদিমার মৃত্যু। তা বুড়ি মা আর চিরদিন কার সংসারে বেঁচে থাকে? কিন্তু ছোট ভাইটা? রাজনীতি

করত। একদিন বারো যেন ডেকে নিয়ে গেল সন্ধ্যার ঝোঁকে। গেঞ্জি গায়ে, পায়জামা পরনে ছোটমামা দোর খুলে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, অতু, আমার ভাতটা ঢেকে রাখিস, ফিরতে আমার রাত হবে। ব্যস্। আর কোনদিনই ফিরে এল না মানুষটা। তারপর বড়মামীর মৃত্যু এবং তারপর নিজের হাতখানা গেল কাটা। তিল তিল করে একটা অতলস্পর্শী কালো গহ্বরের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে বড়মামা—সব কিছু যদি সে ভুলে থাকতে চায় মদের বিস্মৃতিতে, কিংবা রেস্-এর মাদকতায় তাহলে অতসী আপত্তি করে কোন আকেলে? অতসী তো জানে, এত এত আঘাতেও বড়মামা সুবুদ্ধিটা একেবারে জলাঞ্জলি দেয়নি। তাই না একদিন হঠাৎ বড়মামীর গহনার বাক্সটা অতসীর হাতে তুলে দিয়ে বড়মামা বলতে পেরেছিল, এগুলো যত্ন করে তুলে রাখ বড়খুকি, আর আলমারির চাবিটাও রাখ। আমার হাত খরচার টাকা যখন যা লাগবে তোর কাছে চেয়ে নেব।

অতসী প্রথমটায় রাজী হয়নি সে দায়িত্ব নিতে। বলেছিল, কেন বড়মামা? তোমার কাছেই থাক না?

—না রে। না। তোদের দু-বোনের বিয়ের ব্যবস্থাও তো করতে হবে। আমার জিম্মায় থাকলে তোর বড়মামীর অত সাধের গহনাগুলো ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো হয়ে উড়ে যাবে।

অতসী তারপর নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল সে দায়িত্ব। বড়মামীর বিয়ের গহনা। আলমারির চাবি বেঁধেছিল আঁচলে। গহনাগুলো অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি। ঘোড়ার খুরে না হলেও সংসারের রথচক্রে বড়মামীর অত সাধের গহনাগুলো তিল তিল করে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে। না, দু বোনের বিয়ের প্রয়োজনে সেগুলো লাগেনি। অতসী এই আঠাশ বছর বয়সেও অনূঢ়া, বন্দনার বিয়েতে একটা পয়সাও খরচ করতে হয়নি; কিন্তু বিনা উপার্জনে সংসারটা তো আরও তিন বছর চলেছে। বড়মামার অ্যাক্সিডেন্টের সময় অতসী থার্ড-ইয়ারে পড়ে। আরও একটি বছর কলেজের মাইনে টানতে হয়েছে। বেকারীত্বও দীর্ঘ বছর খানেকের। তাই বড়মামীর সেই সৌখিন গহনার বাক্সটা আজ শূন্যগর্ভ। না, ভুল হল! একেবারে শূন্যগর্ভ নয়। তাই এখান্তে আছে একটি নিঃশেষিত বিলাতি সেন্টের শিশি। ওর জীবনে প্রথম প্রণয়োপহার—পঁচিশ বছরের জন্মদিনে। আর আছে রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধা একবাণ্ডিল চিঠি। উত্তীর্ণ যৌবনা অনূঢ়ার জীবনেও যে একদিন বসন্ত এসেছিল এগুলি তার নীরব সাক্ষী। বন্দনার বিয়ের পর কতবার মনে মনে সংকল্প করেছে—একদিন

সব পুড়িয়ে ফেলবে। প্রাণে ধরে পারেনি। আজও মাঝে মাঝে ছুটির দিনে রুদ্ধদ্বার অবকাশে সে খুলে বসে সেই চিঠির বাণ্ডিল।

যারা বলে, কোন মানুষ ভালো, কোন মানুষ কালো, তারা ভুল বলে। তারা ছবি আঁকার কায়দাটাই ধরতে পারেনি। সব পোর্ট্রেটই সাদা-কালোর সংমিশ্রণে; শুধু সাদা-কালোই বা হবে কেন? সাতটা রঙ মিলে-মিশেই আনে শুভ্রতা, সব রঙ হারালেই চিত্রপট মসিবর্ণ। কিন্তু এর মাঝে মাঝেও আছে নানান রঙের 'শেড'—সে রঙ একা চিত্রকরই চাপায় না—চড়ায় যারা তার কাছের মানুষ। কখনও তা কামনার রঙে রাঙা, কখনও তারুণ্যের রঙে সবুজ, কখনও প্রেমের রঙে ময়ূরকণ্ঠি, কখনও বঞ্চনার রঙে ধূসর! নিরুপায় চিত্রকর জীবন দর্পণে দেখতে পায়—তার ছবির রঙ আপনি আপনিই বদলে যাচ্ছে: ডোরিয়ান গ্রে-র ছবির মতো। তেমনি করেই বদলে গেছে অতসী।

শুধু অতসী? না, ওর বড়মামাও। এখন সে হাড়-পাঁজরা সর্বস্ব বৃদ্ধ। দেখলে মনে হয় পঁয়ষট্টি-সত্তর। আসলে ওর বয়স মাত্র পঞ্চান্ন। চুলগুলো বিলকুল সাদা। গেঞ্জি খুলে ফেললে পাঁজরার সব ক-খানা হাড় গোনা যায়। তবু পরিবর্তনটা ওর দেহের চেয়ে মনেই হয়েছে বেশি করে। অতসীর মনে হয় ওর বড়মামার মনটা দুটো আলাদা টুকরো হয়ে গেছে। একটা মানুষের মধ্যে দুটো মন। দুটো ব্যক্তিসত্তা। একটা মন আজও অতসীকে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা কন্যার প্রতি পিতৃস্নেহই শুধু নয়, মায়ের প্রতি সন্তানের নির্ভরতা। অতসী শুধু ওর কন্যাই নয়, শৈশবের মা-ও। মনে পড়ে বন্দনার বিয়ের কথা। বন্দনা চিরদিনের মত সম্পর্ক ঘুচিয়ে যখন কুণালের হাত ধরে চলে গেল তখন অতসী উবুড় হয়ে পড়েছিল তার বিছানার উপর। তার বড়মামা তার বাঁ হাতখানা ওর পিঠে বুলিয়ে বলেছিল, কাঁদ অতু, কাঁদ। কেঁদে মনটা হাল্কা করে নে। দুনিয়া জানল না, হয়তো ছোটখুকিও জানে না—কিন্তু আমি তো জানি, তুই বুকের একখানা পাঁজরা খুলে আজ তোর বোনের আঁচলে বেঁধে দিলি। আবার সেই বড়মামার অন্তরেই আছে তার দ্বিতীয় সত্তা। আঘাত পেয়ে পেয়ে সে নির্মম, কঠোর, স্বার্থপর! অতসীকে হারাবার ভয়ে সে এমন সব কাণ্ড-কারখানা করে যা চিন্তাই করা যায় না। জীবন-সংগ্রামে পরাজিত মানুষটা সে এখন শুধুমাত্র অতসীর উপরেই নির্ভর করতে শিখেছে। বন্দনার উপর যে ভরসা করতে নেই, সে যে ভারসহ নয়, এ কথা ঐ মদো-মাতাল রেসুড়েটা কেমন করে জানি বুঝে নিয়েছিল। তাই অতসীকে হারাবার ভয়ে মানুষটা সর্বদা কাঁটা হয়ে থাকে। হয়তো তাই বড়মামা চায় না অতসীর জীবনে বসন্ত সার্থক হয়ে

উঠুক, অতসী স্বামী-সন্তান-সংসার নিয়ে সুখী হোক! অতসী কিছু আহা-মরি সুন্দরী নয়—রঙ তার কালো, বন্দনা তার চেয়ে অনেক বেশী রূপসী। বন্দনার আকর্ষণী ক্ষমতা তাই অনেক বেশি। তবু অতসী কিছু কুদর্শনাও নয়। আর সুরূপ-কুরূপ একটা কথার কথা। ওর কোন মানদণ্ড নেই। থাকুক, না থাকুক এ কথা তো অস্বীকার করা চলবে না যে, তা সত্ত্বেও তার জীবনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল কল্পলোকের রাজপুত্র—

অতসী যখন বাথরুম থেকে বার হয়ে এল ততক্ষণে বলাইয়ের দাড়ি কামানো শেষ হয়েছে। একটা হাতেই সে সব কাজ সারে—গুছিয়ে তুলে ফেলেছে দাড়ি কামানোর সাজ-সরঞ্জাম। অতসী ঘরে এসে শাড়িটা ভালো করে পরে; ভিজা-কাপড় গামছা মেলে দেয়। রান্নাঘরে এসে ঢোকে। এক চিলতে রান্নাঘর। দু-জন পাশাপাশি বসে খাওয়ার ঠাঁই নেই। অবশ্য বলাই এই সাত-সকালে ভাত খাবে কেন? তার তো অফিস-কাছারির বালাই নেই। ফলে অতসী একাই ভাত বেড়ে খেতে বসল। বলাই মোড়াটা টেনে এনে রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় বসল। বলে, পুরো কুড়িটা টাকা অবশ্য লাগবে না—কি বলিস? আমি তো আর বাটার দোকানে ঢুকছি না।

অতসী ভাতের গ্রাসটা গলাধঃকরণ করে বললে, তুমি কোন দোকানেই ঢুকছ না। না বাটা, না ফ্লেক্স, না ফুটপাতের দোকান। একটা কাগজে পায়ের মাপটা আমাকে এনে দাও। আমি ফেরার পথে কিনে আনব।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত লাফিয়ে ওঠে বলাই; বলে, তুই কী পেয়েছিস আমাকে, এ্যাঁ? ছেলেমানুষ? না! মাপ আমি দেব না। তুই কিনে আনলে সে চটি পায়েই দেব না আমি।

অতসী নির্বিকারভাবে ভাত ভাঙে।

—কী? চুপ করে আছিস যে?

তবু কথা বলে না অতসী। যেন ব্রহ্মচারীর আহার। গণ্ডুষ করে খেতে বসেছে। বলাই এক নাগাড়ে তড়পাতে থাকে—অতসীর নাকি বড় বাড় বেড়েছে! এসব আর সে সহ্য করবে না। যেদিকে দুচোখ যায় একদিন বেরিয়ে যাবে। ভায়ির হাততোলায় বেঁচে থাকার চেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া ভালো, ভিক্ষা করা ঢের ভালো!

নির্বিকার অতসী এঁটো ফেলে হাত ধুয়ে দড়িতে টাঙানো গামছায় হাত মোছে। চুপচাপ ঢুকে যায় মামীর ঘরে, এখন ওটাই অতসীর ঘর। মামীর

খিয়ের ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বসে চুলটা ঠিক করে। পাউডারের কৌটা খুলে দেখে সামান্য তলানী পড়ে আছে। পরের মাসের মাইনে পেলেই কিনতে হবে একটা। টুথপেস্টটাও ফুরিয়েছে। নেই, নেই—যেন এ সংসারের একটা বাঁধা গৎ। দিদিমা বলত, 'নেই বলতে নেই রে, বলতে হয় বাড়ন্ত।' তা সে যাই বল, ব্যাপারটা একই। পাউডারের পাফ্‌টা আলতো করে মুখে বুলিয়ে নিল। কপালে একটা কুমকুমের সবুজ টিপ পরল; ব্লাউস আর শাড়ির পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে। পাউডারের অভাবটা আজ বেশি করে বোধ করছে। আজ শনিবার। সকাল-সকাল ছুটি এবং ছুটির পর সে আজ বাগুইআটি যাবে। রঞ্জনদের বাড়ি। ছেলেটা মঙ্গলবার থেকে নাগাড় কামাই করছে। পর পর দুটো রিহার্সালে অ্যাবসেন্ট! আবার জ্বরজ্বারি বাধিয়ে বসেছে নিশ্চয়। এত জ্বর হয় কেন ওর—এই বয়সে? কত বয়স হবে রঞ্জনের? অতসীর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হবেই—তার মানে পঁচিশ ছাব্বিশ। পুরুষমানুষের পক্ষে তারুণ্যের মধ্যগগন; অথচ ছেলেটা অতসীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেমন·

—কী? টাকাটা দিবি, না দিবি না—সোজা কথা বলে দে।

ঘাড় ঘোরাতে হয় না! আয়নার মধ্যে দিয়েই দেখতে পায় বড়মামা এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে। অতসী এবার উঠে যায়। তাকের উপর থেকে একখণ্ড কাগজ আর পেন্সিলটা নিয়ে আসে। মামার চরণপ্রান্তে রেখে দিয়ে বলে, মাপটা দাও।

বলাই ছোঁ-মেরে তুলে নেয় কাগজখানা। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দেয় সারা ঘরময়। অতসী নির্বিকারভাবে তার ব্যাগে ভরে নিতে থাকে রুমাল, খুচরো পয়সা, ফাউন্টেন পেন।

—থাক। চাই না আমার চটি। দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দিচ্ছিস এই আমার ভাগ্যি! আমি তোর সংসারে চাকর বই তো নই! চাকরের আবার জুতো পরার সখ কেন?

অতসী হাত ঘড়িটা একবার দেখে নেয়—না, দেরি হয়নি তার। মিষ্টি হেসে বললে, কেন সকাল থেকে খামোকা চেঁচামেচি করছ বড়মামা?

—খামোকা! তুই একে খামোকা বলছিস? এক জোড়া চটি কিনবার জন্য মাত্তর কুড়িটি টাকা চেয়েছি—

—হ্যাঁ, কিন্তু আজ যে শনিবার, বড়মামা। শনিবারে যে চটি কিনতে নেই।

বলাই হঠাৎ হতচকিত হয়ে পড়ে। আমতা আমতা করে বলে, শনিবার তাই কী?

—শনিবার হচ্ছে রবিবারের আগের দিন, সেটা তুমিও জান, আমিও জানি। শোন, জালের আলমারিতে রুটি-তরকারি করা রইল। ও-বেলার। সন্ধ্যে রাতেই খেয়ে নিও, নাহলে তরকারিটা টকে যাবে। আর মনে করে জালের আলমারিটা বন্ধ করো বাপু, না-হলে কাল বিনা দুধে চা খেতে হবে—

বলাইয়ের হতচকিত ভাবটা কেটে যায়। বলে, মানে? তুই রাত্রে খাবি না?

—না। আমার ফিরতে দেরি হবে।

—দেরি হবে। কেন? আজ তো শনিবার, তোর তো সকাল সকাল ছুটি।

—ছুটির পর আমি অন্য এক জায়গায় যাব। নাও, সরো—

বলাই দোর ছেড়ে সরে দাঁড়ায় না। বলে, বুঝেছি! বাগুইআটি যাবি।

অতসী একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। না, আকাশ নির্মেঘ, ছাতা নেবার দরকার নেই। হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, সরো বড়মামা আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ মনোবল ফিরে পায় বলাই। তার অভিভাবকত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দৃঢ়স্বরে বলে, হোক দেরি! আমার কথার জবাব দে আগে। বলাই গাঙ্গুলী এখনও মরেনি! বুঝলি? বল আবার এ শনিবারে বাগুইআটি যাচ্ছিস?

রীতিমতো পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। অতসী করুণ স্বরে বললে, বললাম তো সেখানেই যাচ্ছি—ছেলেটা আজ পাঁচদিন কামাই করছে, নিশ্চয়ই জ্বরজারি হয়েছে। কিন্তু এ কী শুরু করলে তুমি, পথ দাও?

—পথ দেব? তুই অধঃপতনের পথে নেমে যাচ্ছিস আর আমি বাধা দেব না?

রীতিমতো একখানা নাটকই আরম্ভ করে দিল বলাই: লজ্জা করে না তোর? এতটা হাঁটুর বয়সী ছেলেকে নিয়ে বেলেল্লাপনা করতে সরম হয় না এই বয়সে? তুই কী ভেবেছিস? ঐ পুঁচকে ছোঁড়া তার মায়ের বয়সী ধুমসিকে বিয়ে করবে?

হঠাৎ চুপসে যায় অতসী। কীভাবে এই বিশ্রী অশ্লীল কথাটার প্রতিবাদ করবে বুঝে উঠতে পারে না। রঞ্জন ওর ছেলের বয়সী না হলেও, ছোট ভাইয়ের বয়সী—কিন্তু সে-চোখে তো অতসী কোনদিন দেখেনি ছেলেটাকে। ফুর্তিবাজ প্রাণবন্ত একটি তরুণ, যার দেহ দুর্বল, আর মন সজীব—যাকে ছোট ভাইয়ের মতই ভালবেসে ফেলেছে অতসী। অথচ তার নাম জড়িয়ে—

—ছি ছি ছি আয়নায় নিজের বদনখানা দেখতে পাস না তুই? ঐটুকু পুঁচকে ছোঁড়ার পিছনে লেগেছিস! মনেও ভাবিস না সে-কথা! কুনাল একদিন যেমন তোর নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে কেটে পড়েছিল—

—বড়মামা! অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে অতসী ততক্ষণে বসে পড়েছে ড্রেসিং টুলে। বলাই গাঙ্গুলীর লক্ষ্য হয় না। অতসীর সবচেয়ে বেদনার স্থানটা মাড়িয়ে দিয়েও যেন তার তৃপ্তি নেই। এক নাগাড়ে বলে চলে, তবু যদি ও ছোঁড়ার হুঁশ না হয় তবে তাকে দেখিয়ে দেব তোর কুষ্ঠিখানা। বুঝলি? শালা পালাবার পথ পাবে না! দেখব, কেমন করে তুই বিয়ের কনে সাজিস্। হুঁ হুঁ বাবা। বিষকন্যাকে বিয়ে করা অত সহজ নয়!

অতসী এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিল। ঐ 'বিষকন্যা' কথাটায় মুখ তুলে তাকায়। বড়মামার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। আর তৎক্ষণাৎ আলপিন্ আহত বেলুনের মত চুপসে গেল বলাই গাঙ্গুলী। হঠাৎ খেয়াল হয়—সে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ও কথাটা উচ্চারণ করার নয়। ওটা নিতান্ত গোপন কথা! দুরন্ত উত্তেজনায় সে মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেছে কথাটা! ধীরে ধীরে দরজা থেকে সে সরে দাঁড়ায়।

অতসী উঠে দাঁড়ায়। ম্লান হাসে এতক্ষণে। হাতবটুয়া খুলে দু-খানা দশ-টাকার নোট বার করে। একটু আগে যেভাবে কাগজ-পেন্সিলটা নামিয়ে রেখেছিল বড়মামার চরণপ্রান্তে সেই ভঙ্গিতেই নোট দুটো নামিয়ে রাখল ওর পদমূলে।

এবার অবাক হওয়ার পালা বলাইয়ের। অস্ফুট স্বরে বললে, ওটা কি হল?

এতক্ষণে বড়মামার চোখে চোখে তাকালো অতসী। হেসে বললে, ভাগ্নিকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছ; 'বিষকন্যা' বলে আঁতুড়ঘরে মুখে নুন গুঁজে দাওনি—এতেই আমি কেনা হয়ে আছি বড়মামা। তার উপর আজ সকালে যে আশীর্বাদ করলে তার পর তোমাকে প্রণামী না দিয়ে থাকতে পারি? নাও—ঐ কুড়িটা টাকা দিয়ে গেলাম—দুটি নাকে মুখে গুঁজে এবার রেস কোর্সে যাও। কোন ঘোড়া ধরবে? লাস্ট হোপ?

অতসীর সামনে আর বাধা নেই। বলাই দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে অতসী পথে নামল।

॥ ৩ ॥

বিষকন্যা।

আশ্চর্য! কথাটা আজও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না, অথচ অবিশ্বাস করে হেসে উড়িয়ে দিতেও পারে না আজকাল। দিন দিনই মনের জোর হারিয়ে যাচ্ছে তার। তবে নাকি কথাটা অনেকদিন ওঠেনি, তাই ভুলতে বসেছিল। একটা অপ্রিয় কুসংস্কার। ও ভুলে থাকাই ভাল। কিন্তু ভুলতে যে পারে না অতসী, সে ভুলে থাকতে চাইলেও দুনিয়া ভুলবে না! তাকে ভুলতে দেবে না। অতসীর জন্মের পরেই ঠাকুরমশাই ওর কোষ্ঠী বিচার করেছিলেন। ঠাকুরমশাই ওদেরও কুলগুরু। অভ্রান্ত নাকি তাঁর কোষ্ঠীবিচার! জন্মপত্রিকায় শনি-মঙ্গলের অবস্থান দেখে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন: জাতক বিষকন্যা।

তার মানে? তার অর্থ—এ মেয়ে যাকে ভালবাসবে তার মৃত্যু অবধারিত। অচিরে।

এসব কথা অতসী জানতে পারে অনেক পরে। তখন ও ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে। প্রথম শুনেছিল ছোটবোন বন্দনার কাছে। ছোটখুকি তখনও ফ্রকের যুগে, কিন্তু পাকামিতে ওস্তাদ। রাত্রে দিদির গলা জড়িয়ে বলেছিল, এ্যাই দিদি, তুই আমার বরকে বিয়ে করবি না কিন্তু।

অতসী অবাক হয়ে বলেছিল, তার মানে? তোর বরকে বিয়ে করতে যাব কেন?

—ঐ যে দিদিমা বলে, এক বরের সঙ্গে দুজনকে গেঁথে দেব।

কৌতুক বোধ করেছিল অতসী। বলে, কেন তোর ববকে বিয়ে করলে কী হয়?

আমার বর পটাস করে পটল তুলবে।

—মরে যাবে? কেন মরে যাবে কেন?

—তুই যে বিষকন্যা! তুই যাকে বিয়ে করবি ছ-মাসের মধ্যে সে পটল তুলবে। বুঝলি? ঠাকুরমশাই বলেছে।

—আমি কী?

—বিষকন্যা।

—বিষকন্যা। তার মানে?

—ঐ তো বললাম। তোর জন্মস্থানে কি বুঝি শনি-মঙ্গলের জঙ্গল আছে। তুই যাকেই ভালবাসবি তার বুকেই ছোবল মারবি। ফোঁস করে।

দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল ছোটখুকি।

প্রথমটায় অতসীর কোনও ভাবান্তর হয়নি। বিশ্বাসই হয়নি কথাটা। বলেছিল, কী বকছিস্ পাগলের মতো?

বন্দনা তখন বিছানার উপর উঠে বসে। বিষয়টা বুঝিয়ে বলে—

বড়মামা আর দিদিমার আলাপচারি গোপনে শুনে বন্দনা ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। অতসীর বিয়ের প্রসঙ্গ থেকেই নাকি আলোচনাটা শুরু হয়েছিল। সবটা অবশ্য বন্দনা বুঝে উঠতে পারেনি; যেটুকু বুঝেছে তা ঐ। জন্মলগ্নে অতসীর ভাগ্যবিধাতা নিদারুণ কৌতুকে ঐ সঙ্কেত রেখে গেছেন। আর কয়েক ঘণ্টা আগে বা পরে জন্মালে অতসী এ বিড়ম্বনাকে এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। গ্রহের চক্রান্তে অতসীর সমস্ত জীবনের উপর পড়েছে এক ধূমকেতুর ছায়াপাত। সে যাকে নিবিড় করে ভালবাসবে তারই সর্বনাশ!

অতসীর বিষনিশ্বাসে তার আয়ুক্ষয় অনিবার্য।

সে রাতটার কথা অতসী ভুলতে পারবে না কোনদিন। খাটের উপর দিদিমা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়েছে দু বোন। পুবের জানালা দিয়ে এক-পায়ে-খাড়া কর্পোরেশনের ঘোলাটে বাতিটার আলোয় মশারির এক প্রান্ত আলোকিত—বাদ বাকি, আলো-আঁধারিতে ঢাকা। একটা অজানা ভয়ে অতীন্দ্রিয় আশঙ্কায় অবাক হয়ে গিয়েছিল অতসী। বন্দনার বোধ হয় ঘুম আসছিল না, হঠাৎ ওর হাতটা টেনে কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল, এ্যাই দিদি! তুই কি ভয় পেলি নাকি? দূর! ওসব বাজে কথায় কান দিস্ না। আকাশের কোন কোনায় আছে শনি আর মঙ্গল গ্রহ, তার সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক! যত্তসব! ঘুমো।

অতসী অস্ফুটে বলেছিল, কিন্তু একটা কথা ছোটখুকি। কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়! দ্যাখ, আমি বাবাকে ভালবাসতাম, মায়ের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু তাঁকেও ভালবাসতাম নিশ্চয়, ওঁরা দুজনেই···

—দূর দূর দূর! কী পাগলামি শুরু করেছিস তুই! তুই আমাকেও দারুণ ভালবাসিস আমি কি মরে ভূত হয়ে গেছি?

অতসী সে-রাত্রে ও-কথার জবাব খুঁজে পায়নি। জানলা দিয়ে ... একমুঠো আকাশের মধ্যে সে জবাবটা খুঁজেছে- ... কথাটাকে সে ... না হেসে উড়িয়ে দেবে। হঠাৎ বন্দনা আবার ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ...

খুব সাবধান! বুড়ো বর কিছুতেই বিয়ে করবি না দিদিমার কথায়। বুড়ো মানুষ এমনিই পটল তুলবে আর দোষ হবে বিষকন্যার!

অতসী সে রসিকতারও জবাব দিতে পারে নি।

পরে সে ব্যাপারটা জেনেছে। কিছুটা দিদিমার কাছে, কিছুটা মামীর কাছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে। না পেরেছে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে, না মেনে নিতে। দিদিমাই পরে ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে, তুই ও নিয়ে কিচ্ছু ভাবিস্ না রুম্‌নি। ঠাকুরমশায় বিধান দিয়েই রেখেছেন। সব দোষ ওতেই খণ্ডে যাবে।

হ্যাঁ, সে ব্যবস্থার কথাও জানতে পেরেছিল অতসী। ওর অনিবার্য-বৈধব্যের কাটান। অতসীর বিবাহ স্থির হয়ে গেলে প্রথমেই ওর সঙ্গে ৺নারায়ণ-শিলার একটা বিবাহ অনুষ্ঠান হবে। নারায়ণ শিলার তো আর মৃত্যু নেই। ফলে ওর বৈধব্য-যোগ ওতেই কেটে যাবে।

—দিদি আপনার টিকিট হয়েছে?

সম্বিৎ ফিরে পায় অতসী। চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসে। অফিস-যাত্রী বাসের গর্ভে একটি লেডিস্ সীটে বসে আছে সে। হাতঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নেয়। নটা পঞ্চাশ। না, লেট হয়নি। হাত-বটুয়া খুলে খুচরো পয়সা বার করে বাড়িয়ে ধরে কণ্ডাকটারের দিকে। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। অফিস-টাইমে যেমন হয় আর কি। মানুষজন ঝুলছে হাতল ধরে। বাসটা দাঁড়িয়েছিল একটা স্টপে। ঐ ভিড়ের মধ্যেও এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ঠেলে-ঠুলে উপরে উঠতে চাইছেন। কণ্ডাক্টর যথারীতি দৈববাণী শুনিয়ে দিল, লেডিস সীট নেই কিন্তু বুড়িমা।

—না থাকে তো দাঁড়িয়েই যাব বাবা।

দুজন লোক নামল। ঐ ফাঁকে হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরলেন বৃদ্ধা। তাঁর বাঁ হাতে আবার একটা পুঁটুলি। ভিড়ের মধ্যে কে যেন বললে—এই অফিসটাইমটুকু বাদ দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন না বুড়িমা?

বৃদ্ধা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। জবাব দেন না। ওরই মধ্যে আবার একজন হাত বাড়িয়ে বুড়িকে টেনে নিল। বাসটা ছাড়ল।

সুর কেটে গেছে। অতসী আর অতীতে নেই; বর্তমানে। বাসের গর্ভে! কিন্তু বর্তমান মানে কী? আবার একটা দার্শনিক চিন্তা জাগল ওর মাথায়। বর্তমান মানে কি আজকের এই সকালটা? তারও তো খানিকটা অতীত, খানিকটা ভবিষ্যৎ। আজ সকালবেলা বড়মামা যখন জুতোর মাপের কাগজখানা

কুচিয়ে কুচিয়ে ছিঁড়ছিল সেটাও তো অতীত—অথচ তখন অতসী ছিল বড়-মামার মায়ের ভূমিকায়। দুষ্টু ছেলের দুষ্টামিতে মনে মনে হাসছিল সে। এইমাত্র ঘড়িতে সে দেখেছে নটা পঞ্চাশ। এখন তো সেটাও অতীত। ভবিষ্যতের পুঁজি থেকে মুঠো মুঠো মুহূর্তগুলি কুড়িয়ে নিয়ে অতীতের দিকে ছুঁড়ে ফেলার নামই কি জীবন? এভাবে ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফেলতে ফেলতে একদিন দেখা যাবে পুঁজি গেছে নিঃশেষ হয়ে। তখন খরচের খাতায় একটা ঢ্যারা চিহ্ন দিয়ে সরে পড়ার নামই দুনিয়াদারি?

কিন্তু ছি ছি ছি! ওটা বড়মামা কী বলল? রঞ্জু-রঞ্জন—

ছেলেটার সঙ্গে মাত্র মাসখানেক আগে পরিচয় হয়েছে। রমা ঘোষালের লীভ-ভেকেন্সিতে নিতান্ত অস্থায়িভাবে তিনমাসের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। বড়-বাবু ছেলেটাকে অতসীর সামনে এনে বলেছিলেন, অতসী, এই চক্কোত্তি হচ্ছে তোমার লীভ-ভেকেন্সির লোক। একেই ডেসপ্যাচে বসাও, কাজকর্ম শিখিয়ে নাও—আর প্রথম দু-চারদিন একটু দেখে দিও। চালাক-চতুর ছেলে, বি. এ. পাস, দুদিনেই শিখে নেবে। আমি চলি, বড়কর্তা ইতিমধ্যেই সেলাম দিয়েছেন—মানে, সেলাম দিতে ডেকেছেন।

বড়বাবু কোঁচা সামলে আলমগীরের ভঙ্গিতে বড় বড় ঠ্যাঙ ফেলে চলে গেলেন। অতসী মুখ তুলে দেখল ছেলেটার দিকে। রোগা, একহারা, অ্যানিমিক চেহারা—বহরে বাড়েনি, বেড়েছে মাথায়। পাকা ছয় ফুট লম্বা। নতুন চাকরিতে এসেছিস, প্রমীলা-রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছিস—কোথায় লাজুক-লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে থাকবি, তা নয় দিব্যি সপ্রতিভের মত হাত দুটো বুকের কাছে তুলে বললে, নমস্কার, আমি কি আপনার হেপাজতেই কাজ করব?

পাশাপাশি তিন টেবিলে খটাখট্ বন্ধ হয়েছে। জয়ন্তী, রেখা বিশ্বাস আর প্রমীলা পট্টনায়েক হাতের কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে আছে আগন্তুকের দিকে। ছেলেটি হাসিহাসি মুখে ওদের তিনজনের উপর মুণ্ডুটা 'প্যান' করে এনে দৃষ্টিটা ফোকাস করল অতসীর মুখেই। আবার বলছে, বসব কোথায়।

অতসী কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললে, কী নাম?

—রঞ্জু—আই মীন, রঞ্জন চক্রবর্তী।

—এইটাই প্রথম চাকরি?

—আজ্ঞে না। এর আগেও লীভ ভেকেন্সিতে 'ফিল্ আপ-দ্য-ব্ল্যাঙ্ক' করেছি, ইস্কুলে। অঙ্ক কষাতাম।

—ডেস্‌প্যাচ সেকশানের অভিজ্ঞতা আছে?

ছেলেটি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই বসল। বললে, না, নেই। সওদাগরী অফিসে এই প্রথম মাথা গলিয়েছি।

—কলকাতার কোন এলাকায় থাকা হয়?

এর জবাবে ছেলেটি বললে, বাগুইআটি। কিন্তু একটা কথা। এক অফিসে কাজ করব, কতক্ষণ আর ভাববাচ্য চালাবেন? আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

জয়ন্তী মুখ টিপে হেসে নিল। রেখা বিশ্বাসের আঙুলগুলো কী-বোর্ডে নেচে উঠল। প্রমীলা তার টাইপ-রাইটারের আড়ালে মুখ লুকালো।

অতসী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, এস আমার সঙ্গে। কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঐটা হচ্ছে ডেস্‌প্যাচ-সেকশান। আমরা তিনজনে চিঠি টাইপ করি, সেটা সই হয়ে এলে তোমাকে রেজিস্টারে এণ্ট্রি করে ডেস্‌প্যাচ করতে হবে। কী ভাবে এণ্ট্রি করতে হবে তা দেখিয়ে দিচ্ছি, এস।

রমা ঘোষাল ছিল ডেস্‌প্যাচ-ক্লার্ক। চার মাসের মেটার্নিটি লীভ পেয়েছে। গত সপ্তাহে ওরা তিন টাইপিস্ট পালা করে ডেস্‌প্যাচ সেক্‌শানের কাজটা চালিয়েছে। আজ রঞ্জন চক্রবর্তী অস্থায়িভাবে যোগদান করায় ওদের খাটনিটা কমল। কিন্তু দায়িত্বটা বাড়ল, অন্তত অতসীর। বড়বাবু তাকেই বিশেষ করে বলে গেছেন নবাগতের কাজটা দেখে নিতে। ইস্যু রেজিস্টারে ঠিকমত এণ্ট্রি না হলে, সই না হওয়া চিঠি ইস্যু হয়ে গেলে, অথবা রামের কপি শ্যামের বাড়ি রওনা দিলে ভবিষ্যতে অতসীই দায়ী হবে—ঐ নবাগত নয়। তাই সে ভাল করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে থাকে। বলে, প্রথমেই দেখে নেবে চিঠিগুলোতে সই আছে কিনা, দ্বিতীয়ত, যে চিঠির যেখানে 'টিক' দেওয়া আছে সেই ঠিকানায় চিঠিখানা যাচ্ছে কিনা; তিন নম্বর—ইস্যু রেজিস্টারে নাম্বার বসানো। ফাইল নম্বর বসানোই থাকবে, তুমি শুধু সিরিয়ালটাই বসাবে, বাই নম্বর আর ডেট বসাবে। আচ্ছা সরে বস, আমি খানকতক চিঠি এণ্ট্রি করে দেখিয়ে দিই—

রঞ্জন পাশের টুলে সরে বসল। অতসী রেজিস্টারখানা টেনে নিয়ে খানকতক চিঠি পর পর এণ্ট্রি করল। নম্বর বসালো,—রেজিস্টারে, চিঠিতে, খামের উপর। তারপর হঠাৎ খেয়াল হল রঞ্জন রেজিস্টারের দিকে তাকিয়ে নেই—একদৃষ্টে অতসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু বিরক্ত হয়ে বললে, কী? কাজটা শিখে নেবে না কী?

একগাল হেসে ছেলেটা বলল, আপনাকে আমি কি বলে ডাকব?

গাম্ভীর্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, অতসী বলে, সেইটাই বুঝি তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা ?

—না। তা ঠিক নয়। মানে, অফিসের কারও সঙ্গে তো আলাপ হয়নি, অথচ এখানেই মাস তিনেক কাটাতে হবে। রমাদেবী পূর্ণচন্দ্র লাভ করলে আমার অর্ধচন্দ্র মিলবে—

—তার মানে ?

—আপনি জানেন না ? আমি মিসেস্ রমা ঘোষালের লীভ ভেকেন্সিতে চার মাসের জন্য বহাল হয়েছি। তিনি সোনার চাঁদ কোলে নিয়ে খালাস হলেই আমি অর্ধচন্দ্র ঘাড়ে নিয়ে খালাস হব।

বেশ কথা বলে ছোকরা। অতসীর ভাল লাগে ওকে। একটা ছোটভাই থাকলে এইভাবে গল্প করত হয়তো। রঞ্জন আবার বলল, বড়বাবু টাইপিং সেক্‌শানে আসামীকে হাজির করে তার নামটা ঘোষণা করলেন, অথচ আপনাদের কারও নাম আমি জানি না।

অতসী কৌতুক বোধ করে। বলে, ঐ যাঁ দিকে সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটি হচ্ছে জয়ন্তী সোম, মাঝের জন রেখা বিশ্বাস, আর ওপাশে প্রমীলা পট্টনায়েক।

—পট্টনায়েক ? ওড়িয়া নাকি ?

—হ্যাঁ, কিন্তু চমৎকার বাঙলা বলতে পারে। কিন্তু একটা কথা, তুমি কি বিবাহিত ?

—না তো। কেন ?

—তাহলে তোমার জানা থাকা দরকার—ওরা তিনজনেই বিবাহিত !

—ও। আর আপনি ?

—কী আমি ?

রঞ্জন এই প্রথম অপ্রস্তুত হল। ওর স্বভাব-সপ্রতিভতার উপর অপ্রস্তুতির মেঘ ছায়া ফেলল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললে, আপনি তো নিজের নামটা বললেন না ?

—আমার নাম অতসী রায়।

—অতসী ! একটা ফুলের নাম, নয় ? নীল রঙের—অতসী, অপরাজিতা !

এবার হেসে ফেলে অতসী। বলে, আমার নাম নিয়ে কাব্য করতে হবে না ! মন দিয়ে কাজ কর।

—তা করছি ; আপনি কিন্তু মাঝে মধ্যে এসে দেখে যাবেন, আমি গড়বড় করছি কিনা—মানে প্রথম দিনটাই আপনাকে বিরক্ত করব মিস রায়।

—মিস্ রায়! তুমি আমাকে মিস্ রায় বলে ডেক না!

—তবে কি বলব? মিসেস রায়?

—না। আমাকে 'অতসীদি' বলে ডাকবে।

— কেন? আপনি কি করে বুঝলেন যে, আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়?

—ভারি ফাজিল তো তুমি! তুমি কেমন করে বুঝলে আমি তোমার চেয়ে ছোট?

—কোন অবিবাহিতা মেয়েই আমার চেয়ে বড় হতে পারে না—তাই!

অতসী থমকে গেল। অনিবার্য প্রশ্নটা করল না—কোন বিশ্বাসের জোরে রঞ্জন ধরে নিয়েছে আঠাশ বছরের এই শ্যামাঙ্গী অবিবাহিতা। বরং গম্ভীর হয়ে বললে, মিস্টার চক্রবর্তী! এটা অফিস! রঙ্গ-রসিকতার জায়গা নয়!

সেই প্রথম দিন।

দুদিনেই অতসী অনুভব করল, ছেলেটা ফাজিল হতে পারে, অসভ্য নয়। যা তার মনে আসে ফস্ করে বলে বসে। এদিকে দারুণ ফুর্তিবাজ। বুদ্ধিমানও; একটু একসেন্ট্রিক ও। প্রথম দিনের শেষে অতসী এসে রেজিস্টারখানা 'চেক-আপ' করেছিল। ভুল নেই কিছু। সকালবেলায় ধমক খেয়ে এবেলায় সে একটু নিষ্প্রভ। চুপচাপ কাজ দেখিয়ে যাচ্ছে। অতসীর নিজেরই মায়া হয়েছিল। তাই বললে, হাতের লেখাটা এমন কাগের ঠ্যাঙ বগের-ঠ্যাঙ কেন?

অম্লানবদনে ছেলেটা বললে, আমি কবিতা লিখি যে!

—কবিতা লেখ। কবিতা লিখতে হলে বুঝি হাতের লেখা খারাপ করতে হয়?

—করতে নয়, হয়ে যায়—মানে ইমোশানটার সঙ্গে আঙুল তাল রাখতে পারে না কিনা।

হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না অতসী। ছেলেটার মুখ চোখ দেখে মনে হয় না সে রসিকতা করছে। রীতিমত সিরিয়াস। অতসী বললে, তা হবে। আমি তো কবিতা লিখি না, তাই জানি না। সেই জন্যেই রবিঠাকুরের হাতের লেখা অত খারাপ ছিল!

—ওটা 'একসেপ্শান প্রুভস্ দ্য রুল'।

দিন-পনের পরে টিফিন আওয়ার্সে আবার ছেলেটা এসে পাকড়াও করল অতসীকে। বললে, আপনি আমার একটা উপকার করবেন?

—উপকার? কী জাতের উপকার?

—আমি একটা শাড়ি কিনব। আপনি পছন্দ করে দেবেন?

—শাড়ি কিনবে? কার জন্য? কেন?

—না, মানে আজ পে-প্যাকেট পেয়েছি তো। আমার বৌদির জন্য। আমার মা নেই, জানেন; বৌদির কাছেই মানুষ। তাই আজ একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে যাব ভাবছি। কিন্তু আমার পছন্দ যদি তাঁর ভাল না লাগে!

অতসী ওর অসহায় মুখভঙ্গি দেখে শুধু কৌতুক নয়, করুণাও বোধ করেছিল। বললে, কিন্তু তোমার বৌদিকে আমি দেখিনি, চিনি না, তিনি কী রঙের শাড়ি পরেন, কী তাঁর পছন্দ কিছুই জানি না—

—আপনি ঠিক পারবেন অতসীদি। বৌদি রঙিন শাড়ি পরে না, তবে চওড়া পাড় শাড়ি পছন্দ করে; লালরঙের পাড়, অথবা কল্কা পেড়ে—গোটা পঞ্চাশের মধ্যেই হয়ে যাবে, কি বলেন?

—ফর্সা না কালো?

—এই আপনার মতো।

—তাহলে সোজাসুজি বল না বাপু—'কালো।'

—বলব? না বাবা। এর জবাবে যে-কথাটা মনে আসছে তা বলে ফেললে আপনি আবার ধমকে উঠবেন: "মস্টার চক্রবর্তী, এটা অফিস! রঙ্গ-রসিকতার জায়গা নয়!'

—ঠিক আছে। আজ অফিস ছুটির পরে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

—থ্যাঙ্কু!

—ওটা আবার কি হল? দিদিকে কি কেউ 'থ্যাঙ্কস্' দেয়?

—আয়াম সরি!

অফিস ছুটির পরে লেডিজ ট্রামটা ধরতে গেল না দেখে রেখা এখান কৌতুক বোধ করল, প্রমীলা পট্টনায়েক হয়ে পড়ে কৌতূহলী, জয়ন্তী সোম উদগ্রীব। কিন্তু কোন কিছুকেই ভ্রূক্ষেপ করল না অতসী। রঞ্জনের সঙ্গে ট্রামে চেপে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে রওনা দিল একখানা শাড়ি সওদা করতে।

অফিস-ছুটির জনাকীর্ণ ট্রাম। তবু তাতেই ঐ ছেলেটা টেনে তুলল তার অতসীদিকে। ভিতরে ঢুকতে পারেনি। একটু হাতলের ছোঁয়া সম্বল। রঞ্জন বাঁ-হাত দিয়ে আলিঙ্গন করে ওকে ভূতলশায়িনী হতে দিল না। ওর সেই আলিঙ্গনপাশে কেমন যেন অস্বোয়াস্তি লাগছিল অতসীর। দু স্টপ যেতেই বলল, এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল, কি বল?

—আমিও তাই বলি। আসুন নেমে পড়ি।

দীর্ঘদেহী যুবকটির বাহুবন্ধ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল অতসীর।

দুজনেই ট্রাম থেকে নামল বৌবাজার-সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর মোড়ে। রঞ্জন সৌজন্য দেখিয়ে বললে, রিকশা নেব একটা ?

—কেন ? এটুকু হাঁটতে পারবে না ?

—আমি কেন পারব না ? আপনার কথাই ভাবছি আমি।

—আমার হাঁটা অভ্যাস আছে।

—তবে চলুন। বেশ গল্প করতে করতে চলে যাবো।

গল্প করতে করতেই ওরা এগিয়ে চলে উত্তরমুখো, সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যু ধরে। অতসী শ্রোতার ভূমিকা পালন করছিল মূলত। রঞ্জন চক্রবর্তীই বক্-বক্তা। তার বাল্যের গল্প, কৈশোরের গল্প, কলেজ জীবনের কথা। ওর কবিতা লেখার ঝোঁক, ছোট গল্পও লিখেছে। ছাপানো যায়নি কোথাও। অভিনয় করতে খু—ব ভালবাসে। অনেক অনেকবার প্লে করেছে। বাপ-মা দুজনেই গত—মানুষ হয়েছে দাদার সংসারে। ওরা দু ভাই এক বোন। বোনটির বিয়ে হয়ে গেছে, থাকে কানপুরে। দাদা রেলে কাজ করে। টি. টি. আই। সপ্তাহে দু দিন বাড়ি থাকে—বাকিটা পথে পথে। বৌদি লোক ভালো—খুব ভালো। রঞ্জনের দুটি ভাইঝি ও একটি ভাইপো আছে। দাদার সঙ্গে ওর বয়সের ফারাক দশ বছরের। রঞ্জন বি. এ পাস করেছে আজ দু-বছর। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো আছে। জুৎসই একটা চাকরি ধরতে পারছে না। আগেকার দিন হলে দাদা নিশ্চয়ই রেলে ঢুকিয়ে দিত। আজকাল অত সহজে হয় না। তাছাড়া ভারি কাজ রঞ্জন করতেও পারবে না—

—ভারি কাজ মানে ?

—মানে 'স্ট্রেনুয়াস' কাজ আর কি। আমি দেখতেই এমন তালঢ্যাঙা, ভিতরটা একেবারে ফাঁপা, বুঝেছেন ? প্রায়ই ঘুরে ঘুরে অসুখ বাধাই।

—ভাল করে চিকিৎসা করাও না কেন ?

কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠে হঠাৎ। বলে, বেকার মানুষ তো! এতদিন দাদা পড়িয়েছে। এখন পাস করে কোথায় দুটো পয়সা দিয়ে সাহায্য করব তা নয়, রাজকীয় চিকিৎসা করাও।

—রাজকীয় চিকিৎসা করাতেই হবে তার মানে কি ?

—এমনি ডাক্তারে দেখেছে। টনিক-মনিক দ্যায়, খাই, ভাল থাকি, আবার ঘুরে ফিরে জ্বর হয়। দেখছেন না কেমন অ্যানিমিক ?—হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

ভারী মায়া হয় অতসীর। কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়ে বলে, আমার কি মনে হয় জানো রঞ্জন, ঐ কবিতা লেখার জন্যই তোমার এ রোগ হচ্ছে—

কোথায় প্রতিবাদ করবে তা নয়, এক কথায় মেনে নিল ছেলেটা। বললে, ঠিক বলেছেন! বৌদিও তাই বলে?

—কী বলে?

—বলে, দিনরাত কবিতা লিখলে রোগ চেপে বসবে। বাইরে রোদে, আলো হাওয়ায় ঘুরে আসতে বলে।

ভ্রূকুঞ্চিত হয় অতসীর। খোলা-মেলা, আলো-হাওয়া? তাহলে কি—

—ডাক্তারবাবুও কি তাই বলেন?

—না। আপনি যা ভাবছেন তা নয়।

—আমি আবার কি ভাবছি?

—যে কথা আমিও প্রথম প্রথম ভাবতাম। টিউবারকুলোসিস্ নয়। ডাক্তার-বাবু বলেছেন।

—তাহলে?

রক্তশূন্য হাত দুটি উল্টে দিয়ে রঞ্জন বলেছিল, গড নোজ!

কলেজ স্ট্রীট বাজার থেকে পছন্দ করে একখানা ধনেখালি কিনে দিয়েছিল রঞ্জনকে। জমি, পাড়, দাম সবই পছন্দমত হল। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই পাগল ছেলেটা বললে, অতসীদি! এবার আপনার জন্য একটা পছন্দ করুন। আপনাকেও একখানা শাড়ি প্রেজেন্ট করব আমি।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় অতসী। বলে, তুমি কি পাগল?

অনেক পীড়াপীড়িতেও যখন রাজী হল না তখন বললে, তাহলে আর একটা অনুরোধ রাখুন। চলুন আমার সঙ্গে কফি হাউসে। আজ পে-প্যাকেট পেয়েছি —প্রথম রোজগার! 'না' বললে আমি কিছুতেই শুনব না। আড়ি করে দেব আপনার সঙ্গে।

অতসী সেদিন পাগল ছেলেটাকে আশাহত করতে পারেনি।

…কিন্তু এ কী! বাস যে ওর অফিস-স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে!

ভিড় ঠেলে কোনক্রমে সে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়ে। পিছন থেকে সুরসিক কোন যাত্রী মন্তব্য করেন, দিদির দিবাস্বপ্ন হঠাৎ ভেঙেছে বোধ হয়।

॥ ৪ ॥

বংশী চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে বললে, অতসীদি, চা খেয়ে একবার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। উনি খোঁজ করছিলেন আপনাকে।

অতসী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল—সাড়ে এগারোটা। এই সময় এক রাউণ্ড করে চা দিয়ে যায় বংশী সবাইকে। প্রমীলা চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে বললে, ও হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি, আপনি তখন বাথরুমে গেছিলেন। বড়বাবু এর আগেও একবার আপনার খোঁজ নিয়েছিলেন।

অতসী তাকিয়ে দেখল 'হল'-এর ও প্রান্তে। কাগজপত্রের মধ্যে বড়বাবু—মনোজ ঘোষ—ডুবে আছেন, এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। প্রকাণ্ড বড় 'হল কামরা'—সওদাগরী অফিসে যেমন হয়। এ-পাশে টাইপিং সেক্‌শান, মাঝে অ্যাকাউণ্টস্, ও-পাশে ক্যাশ,—শুধু সাহেবদের ঘরগুলোই কাচ দিয়ে আড়াল করা। দৃষ্টির আড়াল নয়, শব্দের। মনোজবাবু লোক ভালো—সমস্ত অফিসের কাজকর্ম তার নখদর্পণে। অনেক দিনের মানুষ, এ অফিসে তাঁর বিশ বছর চাকরি হয়ে গেছে। সময়ে শক্তও হতে জানেন, আবার প্রয়োজনে দিলদরিয়া। কন্‌ফার্মড ব্যাচিলার। জনশ্রুতি, যাকে যৌবনে ভালোবাসতেন সেই মেয়েটি একটি বিলেত-ফেরত এঞ্জিনিয়ারের কণ্ঠলগ্না হওয়াতেই বড়বাবু নীলকণ্ঠ! জেনেশুনে বিষ পান করে ব্যাচিলার! তাই বোনেদের মানুষ করেছেন। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন শ্রীরামপুর থেকে। সেখানে পাকি বাড়িও করেছেন। সখের মধ্যে সখ: থিয়েটার। কলকাতায় হেন থিয়েটার নেই যা উনি দেখেননি। নিজেও থিয়েটার করতে ভালবাসেন। ওঁরই উদ্যোগে এ অফিসে আজ দশবছর ধরে বছরে একবার থিয়েটার হয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছু করতে রাজী—চাঁদা তোলা, 'হল' ভাড়া করা, স্যুভেনির ছাপানো, তার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা থেকে নাটক চয়ন, কুশীলব নির্বাচন, পরিচালনা মায় থিয়েটারের পাট চুকলে যদি লোকসান যায় তবে গাঁটগচ্ছা। রীতিমত নাট্যামোদী লোক বলতে যা বোঝায়। কৈশোরে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখেছেন, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়—এঁরাই ওঁর আদর্শ। শম্ভু মিত্তির—উৎপল দত্ত—অজিতেশ—রুদ্রপ্রসাদদের নিয়ে মাতামাতিটা তাঁর পছন্দ নয়। ফলে নাটক যা নির্বাচিত হয় তা বিগত যুগের। এখনও রঙমহল-বিশ্বরূপা-স্টার ভাড়া করে উনি চালিয়ে যান: সাজাহান, বঙ্গে বর্গী, মিশরকুমারী, সিরাজুদ্দৌলা। বড়বাবু বলে কথা!—কেউ

হ্যাঁ-হু করতে সাহস পায় না। তাছাড়া প্রতিবাদ করা মানেই দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিতে হবে, এবং সে দায়িত্ব ঐ জুতো সেলাই-তক-চণ্ডীপাঠ! সুতরাং আফ্‌সের সব কিছুই যদিচ হাল-ফেশানের, বার্ষিক 'ফাংশান্‌টা' হয় সাবেকী কেতায়। সেই সভাপতি বরণ—প্রধান অতিথি বরণ—সম্পাদকের দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠান্তে বিগত যুগের একটি নাটক আবার নতুন যুগে মঞ্চস্থ হয়।

'—বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি…'

'—কী! মায়ের প্রতিমা চূর্ণ হবে! গোলার আঘাতে চূর্ণ হবে! মা মা…'

'—সত্য সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ …'

কোন নাটক অভিনীত হবে তা নির্ভর করে একমাত্র প্রভুর 'পিক্'-এ। এ বছর বড়বাবু কোন 'রোল'টা করতে ইচ্ছুক—ডক্টর ভোস্, ভক্সর পণ্ডিত, না চাণক্য! অর্থাৎ কাকে কপি করবেন: অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু, না শিশির-কুমার।

এ বছর মনোরঞ্জন চৌধুরী ওঁর মনোরঞ্জন করেছেন নিশ্চয়, তাই এবার ধরা হয়েছে—'মাটির ঘর'।

অতসী প্রতিবারই এক আধটা ছোটখাটো পার্ট করতে বাধ্য হয়। নায়িকা নয়, সাইড রোল। নায়িকা কোনবার রমা ঘোষাল, কোনবার জয়ন্তী সোম। ঐ আর এক বাতিক বড়বাবুর। অফিস-স্টাফের বাইরে থেকে কোন কুশীলব নির্বাচন করেন না তিনি। স্ত্রী ফিমেল রোলেও। এ বছর রমা ঘোষালের দৈহিক অক্ষমতায় জন্য বাধ্য হয়ে নির্বাচিত হয়েছিল জয়ন্তী সোম। কিন্তু কোথাও কিছু নেই সে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বড়বাবু তাই বাধ্য হয়ে অতসীকে চান্স দিয়েছেন। অতসী রাজী হত না, কিন্তু বিশেষ একটি কারণে সে রাজী হয়েছে এবার।

চায়ের কাপটা শেষ করে অতসী উঠল। গলিপথ অতিক্রম করে এসে হাজির হল বড়বাবুর টেবিলে। একজন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি, ইঙ্গিতে অতসীকে বসতে বললেন। অতসী বসে পড়ে একখানা ভিজিটার্স চেয়ারে। কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল আগন্তুক ভদ্রলোক থিয়েটারের ড্রেস ভাড়া দিয়ে থাকেন। কথাবার্তা সেরে তিনি বিদায় হলে বড়বাবু অতসীর দিকে ফিরলেন।

—আপনি আমার খোঁজ করছিলেন?

—হ্যাঁ। তুমি আমার একটি উপকার করবে মা?

এ আবার কী ধরনের কথা! বড়বাবু হুকুম করেন, ওরা তামিল করে। অতসী হ্যাঁ না কিছুই বলে না—বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

—আজ বিকেলে তোমার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে? একটা জায়গায় যেতে পারবে?

অতসী মনে মনে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। অফিস ছুটির পর সে বাগুইআটি যাবে বলে স্থির করে রেখেছে। এখন বড়বাবু কী ফ্যাসাদ বাধান কে জানে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অতসী বললে, আজ বিকালেই সেখানে যেতে হবে? আজ আমি অন্য এক জায়গায়…

—ও! তবে থাক। আমি নিজেই তাহলে…

—কোথায়? কদ্দূর? কাজটা কী?

—তা দূর আছে। বাগুইআটি। মানে রন্টুটার একটা খবর নিতে হয়—

অতসী সামলে নিল নিজেকে। বললে, তা ঠিক। আজ পাঁচ দিন সে কামাই করছে, মঙ্গলবার থেকে। আবার জরজারি বাধায়নি তো? গোটা সপ্তাহ ডেস্‌প্যাচ সেকশানে—

—চুলোয় যাক তোমার ডেস্‌প্যাচ সেক্‌শান! আমার যে 'হল' বুক করা আছে। এদিকে ছেলেটা 'সিক' রিপোর্ট করে ছুটি চেয়েছে। ছোকরা ডোবাবে কিনা বুঝতে পারছি না। যে-সে 'রোল নয়, মাটির ঘরে 'কল্যাণ'—

অতসী সুযোগ বুঝে বলে, একেবারে অজানা-অচেনা ছেলেকে প্রথমেই অত ইম্পর্টেন্ট পার্টটা দেওয়া বোধহয় আমাদের ঠিক হয়নি।

বড়বাবু উৎসাহে পাঞ্জাবির পকেট থেকে নস্যির ডিবাটা বার করে ফেলেন। চট করে এক টিপ-র নাসারন্ধ্রে চালিয়ে দিয়ে রুমালে নাকটা মুছে নেন। তারপর একগাল হেসে বলেন, তুমি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ অতসী? অত কাঁচা গোলা মনোজ ঘোষ নয়, বুঝেছ? রীতিমত বাজিয়ে নিয়েছি আমি। দু-দুবার ওর অভিনয় আমি দেখেছি—টিপু সুলতানে 'মঁসিয়ে লালী' আর বিপ্রদাসে 'দ্বিজদাস'। শুধু শুধুই ওকে লীড নেকেন্সিতে নিতে রাজী হয়েছি ভেবেছ?

—অতসী অবাক হয়ে বলে, কোথায় দেখলেন ওর অভিনয়?

—একবার ওদের কলেজে, একবার একটা ক্লাবে। তখন থেকেই ছোকরাকে নজরে নজরে রেখেছি। কী 'টল' ফিগার দেখেছ? একটু সিকৃলি, কিন্তু 'ড্রেস থো' করতে জানে; মডুলেশানও আছে। কিন্তু আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল…

অতসী বললে, ঠিক আছে বড়বাবু, আমি আজই খোঁজ নেব।

—তুমি পারবে অতসী? তুমি যে বলছিলে, তোমার কি যেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট…

—সেটা কাল সকালেও হতে পারবে। কাল তো রোব্বার!

—তুমি আমাকে বাঁচালে মা। দাঁড়াও ওর ঠিকানাটা তোমাকে দিই।

অতসী সঙ্কোচে বলতে পারল না, বাড়িটা তার চেনা। তিন সপ্তাহ আগে এক শনিবার রঞ্জন তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বাগুইহাটি। বড়বাবু একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন, বাস-পথের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। অতসী সেটা সযত্নে ব্যাগে ভরে ফেলল। এবার সে উঠে দাঁড়ায়। বড়বাবু আবার বললেন, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ অতসী।

অতসী সলজ্জে বলে, এ-সব কী বলছেন আপনি? সহকর্মী অসুস্থ হলে···

—না। আজ বাগুইহাটি যাচ্ছ বলে নয়। 'তন্দ্রা' করতে রাজী হওয়ায়।

অতসী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বলি-বলি করেও কথাটা বলতে পারে না। বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, কিছু বলবে মনে হচ্ছে?

—না।

—তাহলে আমিই বলি। আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি তুমি 'তন্দ্রার' রোলটা করতে রাজী হয়েছ বলেই শুধু নয়, তুমি নীরবে একটা নোংরা প্রতিবাদ করেছ বলে।

—প্রতিবাদ! কিসের প্রতিবাদ?

—একটা মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ। একজন জেনুইন-অ্যাকটারের মাথায় মিথ্যা কলঙ্ক চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ। 'অভিনয়' হচ্ছে 'অভি' পূর্বক 'নি-'ধাতু 'অল'। তুমি আমার অন্তরের নৈকট্যে এসে গেছ তোমার ব্যবহারে। আই কনগ্র্যাচুলেট য়ু অ্যাজ এ ড্রামা-লাভার।

অতসী সলজ্জে মাটির দিকে তাকায়।

এ বৃদ্ধ নাট্যামোদীর সমস্ত প্রগতিবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গিকে সে এই মুহূর্তে ক্ষমা করতে পেরেছে।

নাট্যরসিক মনোজ ঘোষ যে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে রমা ঘোষালের লীভ-ভেকেন্সিতে চার মাসের জন্য ঐ অনাত্মীয় অজ্ঞাতকুলশীল কুশীলবকে চাকরীতে ঢোকানোর জন্য তদ্বির তদারক করেছেন এটা কারই বা জানা? কেই বা খবর রাখে বড়বাবুর কাছে কতজাতের উমেদার আসে ঐ রকম লীভ-ভেকেন্সিতে দু-চারমাসের চান্স পেতে—পরিচিত-বন্ধু বা আত্মীয়দের সুপারিশ নিয়ে। সব দিকে নজর না রাখলে বছরে বছরে এমন রাজসূয় যজ্ঞ করা যায়? 'মাটির ঘর' ধরবেন বলে যখন মনস্থ করেন তখনই মনে মনে রমা ঘোষালকে 'তন্দ্রা'র চরিত্রে নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটার কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই! সামনে বাৎসরিক ড্রামা ফাংশন আর তুই কী এক বখেড়া বাধিয়ে বসলি!

'মাটির ঘর' ফেলে আঁতুড়ঘর! কোনো মানে হয়? অবশ্য বখেড়াটা বেধেছে কয়েক মাস আগেই—তখনও 'মাটির ঘরের' ভিত পত্তন হয়নি। বর্তমানে তার যা দৈহিক অবস্থা তাতে তাকে নায়িকার রোল কেন, কোন চরিত্রেই নেওয়া চলে না। মেটার্নিটি লীভ পেয়ে অব্যাহতি পেল রমা ঘোষাল। কিন্তু কর্মিৎকর্মা লোকের স্বভাবই ঐ। লোকসানটা নিয়ে তারা হা-হুতাশ করে না—লোকসানের পরিপূরক হিসাবে পয়দা করে লাভ। রমা গেল, এল রঞ্জন। 'তন্দ্রা' হরণের ক্ষতিপূরণ হল 'কল্যাণীয়েষু'তে। ছেলেটা মঞ্চিয়ে লালী এবং হিজদাসের চরিত্রে তৃপ্ত করেছিল বড়বাবুকে—কল্যাণ সে ভালমতই করবে।

'মাটির ঘর' এ তিন-তিনটে ইম্পর্টেন্ট নারী চরিত্র: তন্দ্রা, ছন্দা আর নন্দা। বড়বাবু রমা ঘোষালকে হারানোর পর মনে মনে নির্বাচন করে রেখেছিলেন: জয়ন্তী, প্রমীলা আর রেখাকে। চমৎকার কাস্টিং। অতসীকে টাইপ-রোলে চান্স দিয়েছেন—ছন্দার ননদ। প্রথম দিন রিহার্সালে বসেই তিনি চরিত্র-বণ্টন তালিকাটা পড়ে শোনালেন। 'অলক' এ কোম্পানীর চিরকালের হিরো সুরজিৎ ঘোষ। 'চঞ্চল' করবে সেলস ডিপার্টমেন্টের সুব্রত নাগ, 'উৎপল' করবে বিশু, আর 'কল্যাণ' করবে নবাগত রঞ্জন চক্রবর্তী। নায়কের রোলে চান্স নেই, সুব্রতর আশা ছিল কল্যাণের রোলটা পাবে অর্থাৎ এতদিনে তার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে দইয়ের হাঁড়িটা নামবে। কোথা থেকে ছপ্পড়-ফোঁড়া ঐ ডাঁচাড়া ছেলেটা এসে ছিনিয়ে নিল সে সুযোগ। সুব্রত বুঝল—এই জন্যেই বড়বাবুর ঐ 'নেপোটিজম'। রমা ঘোষালের লীভ ভেকেন্সিতে এনে হাজির করেছেন ঐ 'নেপো'কে দধিভক্ষণের সুযোগ পাইয়ে দিতে। তবে বড়বাবুর কথার উপর কেউ কোনদিন কথা বলেনি। সুব্রত আড়চোখে একবার দেখে নিল নবাগত নেপোকে—রঞ্জন চক্রবর্তীকে।

বড়বাবু বললেন, নেকস্ট বুধবার অফিস ছুটির পর আমরা রিহার্সালে বসব। তোমরা সবাই আমার সিস্টেম জান, তাই শুধু রঞ্জনকেই বিশেষ করে বলছি—রিহার্সালে প্রম্পটিং হবে না কিন্তু। আদ্যোপান্ত পার্ট মুখস্থ থাকা চাই।

রঞ্জন সংক্ষেপে শুধু বলেছিল: ও কে!

বড়বাবু তখন 'মাটির ঘর' নাটকটার মূল বক্তব্য এবং বিভিন্ন চরিত্রের ব্যঞ্জনা বুঝিয়ে দিতে থাকেন—যেন, 'মাটির ঘর' ওদের অচেনা কোন নাটক। পাণ্ডুলিপি অবস্থায় তার প্রথম অভিনয় হচ্ছে! কেউ কোনও কথা বলেনি।

বড়বাবু বলে কথা!

ঝামেলা বাধল ঐ প্রথম বুধবারেই রিহার্সাল-অন্তে। জয়ন্তী সোম জ

বড়বাবুর কাছে এসে বললে আমাকে মাপ করতে হবে স্যার, আমি 'তন্দ্রা' করব না। হয় 'ছন্দা' অথবা 'নন্দা'-র পার্ট আমাকে দিন।

এ জাতীয় অস্বাভাবিক কথা দশ বছরের ইতিহাসে কখনও শোনেননি বড়বাবু। মিনিটখানেক তিনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন জয়ন্তীর দিকে। তারপর বলেন, কেন?

গম্ভীরভাবে জয়ন্তী বলে, সেসব কথা শুনে আপনার কাজ নেই। নিতান্ত নিরুপায় না হলে এমন কথা আপনাকে কেন বলব বলুন?

মনোজ ঘোষ বুঝে উঠতে পারেন না, এক্ষেত্রে কী করণীয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন তাঁর চরিত্র বণ্টন নির্ভুল হয়েছে। তন্দ্রার চরিত্রটাই কঠিন, জয়ন্তী অভিনয় কুশলতায় সবচেয়ে পারদর্শী, রমার অবর্তমানে। প্রমীলাও ভাল অভিনয় করে, তবে উচ্চারণ দোষ আছে। রেখা বিশ্বাস বয়সে এতই ছোট যে তাকে বড়বোনের পার্ট দেওয়া চলে না। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত বড়বাবু বলে চলেন, এমন করলে তো চলবে না জয়ন্তী, তোমার কী জাতের অসুবিধা হচ্ছে তা আমাকে জানতে হবে বইকি—আমার কাছে আর সঙ্কোচ কী? বল মা, খুলে বল?

মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি জয়ন্তী বলেছিল, আমার শাশুড়ী খুব কনজার্ভেটিভ। উনি জানতে পারলে আমাকে আর থিয়েটার করতেই দেবেন না।

হালে পানি পান না। জয়ন্তীকে উনি আজ তিন-চার বছর ধরে চেনেন। ওর স্বামীকেও। শাশুড়ীকেও দেখেছেন বার্ষিক ফাংশনে। জয়ন্তীকে ওর শাশুড়ী ঠাকরুন 'মিশর কুমারী'তে নাচ্‌তে, বঙ্গেবর্গীতে 'গৌরী' এবং সিরাজুদ্দৌলায় 'ঘসেটি বেগমে'র ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছেন, আজই বা তন্দ্রার ভূমিকায় দেখলে আঁৎকে উঠবেন কেন? বেশ বুঝতে পারেন, মেয়েটা আসল কথা ভাঙছে না। বাধ্য হয়ে তিনি অতঃপর ডেকে পাঠালেন প্রমীলা আর রেখাকে। ওদের বললেন জয়ন্তী বলছে, তন্দ্রার পার্টটা তার সুট করছে না। এখন বল, কী ভাবে চরিত্রগুলো অদল-বদল করা যায়? প্রমীলা 'তন্দ্রা' করবে?

প্রমীলা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, না! আমি রাত জেগে ছন্দার পার্ট মুখস্থ করেছি। আর ছন্দা আমাকে সুটও করছে। আমি কেন পার্ট বদলাব?

রেখা নিজে থেকেই বললে, আমাকে নিশ্চয়ই আপনি তন্দ্রার রোলটা করতে বলবেন না। প্রমীলাদি আর জয়ন্তীদিকে আমার ছোট বোন বলে দর্শকদের কেউ মেনে নেবে না।

রেখা সত্য সীমন্তিনী। বয়সে সবার ছোট। তাছাড়া সে গান গায়। নন্দার গান আছে।

অগত্যা ওদের বিদায় দিয়ে বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন অতসীকে। ভিতরে কিছু একটা ব্যাপার আছে। সেটা কী তা তাঁকে জানতে হবে। অতসীকিন্তু কোন হদিস বলতে পারেনি। সে অবাক হয়েছিল খবরটা শুনে। বলেছিল, আজ্ঞে না, আমাকে তো ওরা কিছু বলেনি। জয়ন্তীও কিছু বলেনি।

—আশ্চর্য! অথচ তোমরা চারজন পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ কর।

তা করে। ওরা চারজনেই টাইপিস্ট। অতসীই একমাত্র স্টেনো-টাইপিস্ট।

বি. এ. পাস করে যখন চাকরির অভাবে বসেছিল তখন স্টেনোগ্রাফিটা শিখেছে। এজন্য ওদের তিনজনের চেয়ে ও কিছু বেশি মাইনে পায়। ভিন্ন স্কেলে। কিন্তু সেজন্য নয়, অন্য একটি কারণে ঐ চারজন মহিলা-কর্মীর মধ্যে অতসীই একমাত্র অন্তেবাসিনী। বয়সে সে সবাচেয়ে বড়, চাকরিতে সিনিয়ার-মোস্ট; সেটাও কিন্তু কারণ নয়। কারণটা জীবনের রঙ্গমঞ্চে ও জুনিয়ার-মোস্ট! তাদের সবজাতের রঙ্গ-রসিকতা গুজ গুজ ফুস্‌ফুস্‌ স্তব্ধ হয়ে যায় অতসী এসে পড়লে। ওরা তিন সৌভাগ্যবতী সীমন্তিনী যে সমতলের বাসিন্দা অনূঢ়া অতসী তার নাগাল পায়নি।

বড়বাবুকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল—ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবে এবং কী করণীয় তাও জানাবে।

তদন্ত করে দেখেছিল অতসী। অভিযোগটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। সমাধানটা যে কী জাতের হতে পারে তারও হদিস পায়নি। একটা নিরুদ্ধ রাগে সে যেন ফেটে পড়তে চাইছিল। ইচ্ছা করছিল—ঠাস ঠাস করে কতকগুলো চড় মারতে। কিন্তু কাকে? জয়ন্তীকে? নাকি ঐ ছেলেটাকে? কিংবা নিজের গালেই।

প্রথমটা কিছুতেই ওরা ভাঙতে চায়নি ব্যাপারটা। ক্রমাগত একথা সেকথা বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। অহেতুক খানাই পানাই। শেষে অতসী রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, তোমরা তিনজনে এমন করলে আমি কী করতে পারি বল? বড়বাবু বললেন, ভিতরের কথাটা জেনে একটা 'পসিব্‌ল্‌ সাজেস্‌শান' দাও। অথচ তোমরা···

জয়ন্তী বলল, পসিবল্‌ সাজেস্‌শান? আমি দিচ্ছি। আপনি 'তন্দ্রা'-র রোলটা করুন, আমি আপনার 'অঞ্জনা'র এক দিনের রোলটা করে দেব।

কোথাও কিছু নেই রেখা বিশ্বাস খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে, সেই বেশ হবে!

অতসী অপমানিত বোধ করে। গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি যদি ও-কথা রসিকতা করে না বলে থাক তাহলে আমার জানা দরকার তোমার কী জাতের অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ আমাকেই তো সেটা 'ফেস' করতে হবে?

রেখা আগ বাড়িয়ে বললে, আপনার সে অসুবিধা হবে না অতসীদি। আপনার তো আর শাশুড়ী নেই—

অতসী ধমকে ওঠে, তুমি চুপ কর রেখা! আমি জয়ন্তীর সঙ্গে কথা বলছি।

.এবার প্রমীলা নিজে থেকেই নাক গলায়। ওদের দুজনের দিকে ফিরে বলে, আই থিংক, য়ু আর নট কোয়ার উইথ অতসীদি! সব কথা ওঁকে খুলে বলা দরকার!

জয়ন্তী বললে, বেশ, তুই বল?

অতসী এবার প্রমীলাকেই ধরে পড়ল, তুমিই বলতো প্রমীলা, কী ঘটেছে?

প্রমীলা সংকোচ করল না। অকপট সত্যভাষণ করল। জয়ন্তী বলছে, রিহার্সালের সময় যে সীনে কল্যাণ তন্দ্রাকে জড়িয়ে ধরবে সেখানে রঞ্জনবাবু জয়ন্তীকে সত্যি সত্যিই 'এমব্রেস্‌' করেছিলেন। আই মীন 'রিয়্যাল এমব্রেসিং'!

অতসী বুঝতে পারেনি তাও। বলেছিল, সে তো আমরা সবাই স্বচক্ষে দেখলাম। 'ফেক্‌ এমব্রেসিং' হওয়ার কথাও তো নয়। তাতে হল কী?

আবার কথা বলল রেখা, কী যে হল তা আপনাকে বোঝানো যাবে না অতসীদি! জয়াদি ম্যারেড! ও বুঝতে পারে।

ভ্রূকুঞ্চিত হয় অতসীর। জয়ন্তীর দিকে ফিরে বলে, ইজ দ্যাট দ্য রীজন? রিহার্সালের সময় রঞ্জন তোমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল···ওয়েল, যাতে তুমি অস্বোয়াস্তি বোধ করেছ?

জয়ন্তী ওর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ তাই।

অতসী মিনিট খানেক জবাব দিতে পারেনি। তারপর বললে, আমি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের সকলের চোখের সামনেই তো ঘটনাটা ঘটেছিল! নাটকে নির্দেশ আছে 'কল্যাণ তাহাকে নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।' ডিরেকটার যেভাবে দাঁড়াতে বলেছিলেন ঠিক সেইভাবেই তো রঞ্জন তোমাকে বুকে টেনে নিল। এর মধ্যে অশালীন তো কিছু ছিল না।

—ও আপনাকে বোঝানো যাবে না অতসীদি!

—কেন যাবে না? কি দিয়ে বুঝলে ওটা অশালীন?

—সর্বাঙ্গ দিয়ে!···বলছি তো, ও বোঝানো যায় না, বোঝা যায়! আপনি নিজে 'তন্দ্রা'র পার্টটা নিয়ে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।

আবার খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে রেখা বিশ্বাস।

প্রমীলা ধমক দেয়, এ্যাই তুই হাসছিস্‌ কেন?

রেখা সামনে নিয়ে বসে, আমার একটা প্রস্তাব আছে অতসীদি ! লেট্‌স হ্যাভ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট। নেক্সট রিহার্সালে জয়াদি অ্যাবসেন্ট হোক—আর আপনি প্রক্সি দিন তন্দ্রার রোল-এ। আপনি দেখুন ব্যাপারটা যাচাই করে। যাকে বলে 'ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান' !

অতসী এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, রেখার বাক-প্রয়োগের চাতুর্যটা খেয়াল করেনি। সে অ্যাকসেপ্ট করেছিল ঐ চ্যালেঞ্জ: ঠিক আছে! তাই হোক ! প্রমীলা বলে, কিন্তু একটা সর্ত আছে অতসীদি। আমরা স্বীকার করতে পারিনি। আপনি যদি তেমন কিছু 'ফীল' করেন তাহলে বড়বাবুকে জনান্তিকে আসল কারণটা জানিয়ে দেবেন।—এগ্রীড ?

দৃঢ়স্বরে অতসী বলেছিল, না! জনান্তিকে নয়! আমি সোচ্চারে প্রতিবাদ করব রিহার্সাল রুমেই। আমি যদি তেমন কিছু 'ফীল' করি তবে সর্বসমক্ষে ছোঁড়াটাকে টেনে একটা চড় কষাব !

আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল রেখা বিশ্বাস।

কথা রেখেছিল অতসী। কায়দা করে জয়ন্তী 'ক্যাজুয়াল লীভ'-এ অনুপস্থিত হল। অতসী রাজী হল প্রক্সি দিতে। রেখা বিশ্বাস আর প্রমীলা পট্টনায়েক সেই বিশেষ দৃশ্যে নাটকীয় পরিবর্তনের জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রহর গুণছিল। কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হল। রঞ্জন যখন বুকে টেনে নিল অতসীকে তখন কিছুই ঘটল না।

ওরা ভেবেছিল ভিতরের কথাটা বুঝি কেউ টের পায়নি। ওরা ভুল ভেবেছিল। প্রমীলা পট্টনায়কের স্বামী লক্ষ্মণ পট্টনায়েক অ্যাকাউন্টস্-সেকশানের করণিক। ধর্মপত্নীর কাছ থেকে যে গোপন তথ্যটা সে জেনেছিল তা বিশ্বাসভাজন সহকর্মীদের গোপনে জানিয়েছিল—অবশ্য ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতেও বলেছিল। বলা বাহুল্য সেই সেই সহকর্মীরা যখন তাদের বন্ধুবান্ধবদের গোপন বার্তাটা জ্ঞাপন করে তখন তারাও উপযুক্ত গোপনীয়তার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই অতসী না জানলেও সেদিন রিহার্সাল-রুমে উপস্থিত প্রত্যেকটি প্রাণীই অন্তরে অন্তরে ঐ চরম দৃশ্যে চপেটাঘাতের ক্লাইমেক্সের প্রতীক্ষায় ছিল।

ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় ফেরায় হতাশ হল সকলেই।

অতসী আন্দাজ করেছিল, বোধকরি রঞ্জন চক্রবর্তী অনুমান করতে পেরেছে—কী কারণে জয়ন্তী সোম বেঁকে বসেছে। আর সে জন্যই আলিঙ্গন দৃশ্যে এমন নিষ্ঠাবান আবেষ্টনী গড়ে তুলল যাতে অঙ্গে-অঙ্গে স্পর্শ হল না আদৌ। ব্যান্ডেজ-তাপ্পারের পেলব স্পর্শে সে আবেষ্টনীর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল বটে, কিন্তু

রীতিমত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। অতসী বেশ বুঝতে পারে, জয়ন্তীর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। কেমন যেন একটা আশাভঙ্গে হতাশ হল সে।

আশাভঙ্গ! কেন? সেও কি মনে মনে ঐ নাটকীয় দৃশ্যটা প্রত্যাশা করেছিল? রঞ্জন চক্রবর্তীকে সর্বসমক্ষে টেনে একটা চড় মারা? অথবা···

না! নিশ্চয় নয়। খুশিই হয়েছে অতসী। একটা বিশ্রী ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড মহড়া শেষ হলে বড়বাবু বললেন, অতসী! আই হ্যাভ কাম টু এ ডিসিশন। শোন। তন্দ্রার রোলটা তুমিই করবে। আর জয়ন্তী করবে ছন্দার ননদ অঞ্জনা।

অতসী রীতিমত হকচকিয়ে যায়: কী বলছেন বড়বাবু। রঞ্জন আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের ছোট। আমাকে, আমাকে—

—না, চার-পাঁচ বছরের ছোট নয়। বছর দুয়েকের ছোট হতে পারে। ওটা মেকআপে ম্যানেজ করা যাবে। কিন্তু এটাই আমার ডিসিশন। না কি তুমিও জয়ন্তীর মত বলবে তোমার অসুবিধা হচ্ছে?

অতসী মুখ তুলে দেখল, সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আর অপরাধীর মত মুখ নিচু করে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জন। বললে, না আমার আপত্তি শুধু ঐ বয়সের ডিফারেন্সের জন্যই; আর কোনও অসুবিধা নেই।

—দ্যাটস্ সেটল্‌ড্ দেন।

সেদিন রিহার্সাল ভাঙবার পর রঞ্জন এগিয়ে এসে বলেছিল, অতসীদি, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

চোখে-চোখে কথা হয়ে গেল প্রমীলা আর রেখার। অতসী ভ্রূক্ষেপ করল না। বলল, চল, যেতে যেতে কথা হবে।

পথে বেরিয়ে অতসী বললে, কি বলছিলে?

—কোন চায়ের দোকানে গিয়ে বসবেন? রাত তো বেশি হয়নি।

—তা হয়নি। কিন্তু তুমি 'একটা কথা' বলতে চেয়েছিলে। মনে হচ্ছে 'একটা' ছেড়ে দুটো কথা বলতে চাও?

—সেটা নির্ভর করছে, আপনি 'একটা' কথার জবাবে আর একটা কথা বলেন কিনা, তার উপর।

ডালহৌসী পাড়ায় এই রাত আটটাই গভীর রাত। অধিকাংশ দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে। একটা ট্রাম ধরে ওরা এসপ্লানেডে চলে এল। একটা

রেস্তোরাঁয় ঢুকে বসল দুজনে। অতসী বললে, আজ আমি তোমাকে খাওয়াব। বল কী খাবে?

রঞ্জন আপত্তি করল না। বলল, কোব্‌রেজি কাটলেট।

বয় এসে অর্ডার নিয়ে চলে যাবার পর অতসী বলে, এবার বল?

থালি প্লেটে কর্কটা দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে মুখ নিচু করে রঞ্জন বলে, আমি জানি, কেন মিসেস সোম ভদ্রার পার্টটা করতে অস্বীকার করেছেন।

অতসী কৌতুক বোধ করে। বলে, কেন বলতো? আমি তো শুনিনি কিছু?

—আপনি আমায় 'লেগপুল' করছেন। নিশ্চয় শুনেছেন আপনি!

মায়া হয় অতসীর। বলে, হ্যাঁ, শুনেছি। কথাটা সত্যি?

—কী কথা!

—ন্যাকামি কর না! সত্যই আগের দিন দুষ্টুমি করেছিলে কিছু? জয়ন্তীকে নিয়ে?

—মা কালীর দিব্যি! আচ্ছা, আপনি তো আজ নিজেই দেখলেন—

—বাজে বক না! তাতে কী প্রমাণ হয়?

—আপনিই বলুন, তাতে কী প্রমাণ হয়?

—অনেকগুলি বিকল্প সিদ্ধান্ত হতে পারে। এক নম্বর, তুমি হয়তো জানতে পেরেছিলে আজ কোন রকম দুষ্টুমি করলে থাপ্পড় খেতে হবে; দু-নম্বর প্রথম দিনের দুষ্টুমির পর তুমি ভয়ে ভয়ে নিজেই সংযত হয়েছ; তিন নম্বর, তুমি শুধু জয়ন্তীকেই ঐভাবে জড়িয়ে ধরতে চাও, আমাকে নয়—

বাণবিদ্ধ বোবা জন্তুর মত রঞ্জন চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

—কী হল? জবাব দিচ্ছ না যে?

—কী জবাব দেব? ওর তো একটাও সত্য কথা নয়।

আবার কৌতুক বোধ করে অতসী। বলে, একটাও নয়? তিন নম্বর হেতুটাও নয়? অর্থাৎ আমাকেও ঐ ভাবে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা তোমার হয়েছিল, শুধু সাহসে কুলায়নি?

রঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। বলে, থাক অতসীদি, আমার 'একটা কথা' শেষ হয়েছে। উঠুন।

—উঠুন কি গো? খাবারের অর্ডার দিয়েছি না? বস।

আবার বসে পড়ে রঞ্জন। মাথা নিচু করে প্লেটের উপর আঙুলের দাগ কাটতে থাকে নীরবে। অতসী বলে, কী ভাবছ এত?

—আপনি কি সত্যিই 'ভদ্রা'র রোলটা করবেন?

—উপায় কি ? আমার তো অস্থায়ী চাকরি নয়। বড়বাবুকে চটাতে পারব না। বাধ্য হয়ে তোমাকে সহ্য করতে হবে।

রঞ্জন গম্ভীর হয়ে বললে, হবে না। আমার তো স্থায়ী চাকরি নয়। প্রয়োজন হলে রিজাইন দেব। আমি আপনার স্বামীর রোল করছি না।

অতসী ওর হাতটা চেপে ধরে, এ্যাই! কী পাগলামো করছ ? তুমি কেন 'কল্যাণ' করবে না ? তোমার কিসের আপত্তি ?

—সে আপনি বুঝবেন না।

—বুঝব না কেন ? এ তো সহজ কথা। জয়ন্তী সোম 'তন্দ্রা' করলে তবেই তুমি 'কল্যাণ' করবে। আমার অপোজিটে তুমি ও পার্ট করতে রাজী নও। এতে না বোঝার কী আছে ?

রঞ্জন প্রতিবাদ করে না। চুপচাপ বসে থাকে। অতসীই আবার বলে, কী হল ? জবাব দিচ্ছ না যে ? যা হোক কিছু বল। চায়ের দোকানে তো তুমিই ডেকে আনলে ?

—বলতে তো অনেক কিছুই চাই অতসীদি। কিন্তু আপনি ক্রমাগত আমার 'লেগপুল' করছেন। সিরেয়িয়াসলি কোন আলোচনাই করতে রাজী নন।

এবার সত্যই গম্ভীর হয় অতসী। বলে, আয়াম সরি। বল রঞ্জন, সব কথা খুলে বল।

রঞ্জন এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল অতসীর দিকে। তার মুখে কৌতুকের ছিটেফোঁটাও আবিষ্কার করতে না পেরে বললে, আমি সব কথাই স্বীকার করব অতসীদি। আপনি মাঝপথে আমাকে বাধা দেবেন না। সব শুনে যদি মনে করেন—আমাদের দুজনের স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করা ঠিক হবে না তাহলে আমিই সরে দাঁড়াব। আপনাদের থিয়েটার তাতে হয় না হয়, আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। এমন কি চাকরিরও তোয়াক্কা করি না আমি।

—বেশ, বল তোমার কথা।

রঞ্জন বলতে থাকে—

সে স্বীকার করে, হ্যাঁ জয়ন্তী সোমকে আগের দিন সে যেভাবে আলিঙ্গন করেছিল সেটা—যাকে বলে প্রমীলা পট্টনায়েকের ভাষায় 'রিয়্যাল এমব্রেসিং'—অকপট 'নিবিড় আলিঙ্গন'। কিন্তু নির্লজ্জ ভাবণে রঞ্জন বলল, বিশ্বাস করুন অতসীদি সেই খণ্ডমুহূর্তে আমি দুনিয়াকে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি যখন অভিনয় করি তখন আমি ভুলে যাই যে, আমি রঞ্জন চক্রবর্তী। এভাবেই গুরুর কাছে শিখেছিলাম। অভিনয়কে আমি ভালবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তাই সেদিন

রিহার্সালে আমি যখন তন্দ্রাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম—মাইও য়ু, জয়ন্তী সোমকে নয়—আমার স্ত্রীকে—তন্দ্রাকে, তখন তার মধ্যে ফাঁকি কিছু ছিল না।

বাধা দিয়ে অতসী বললে, কিন্তু আজ ?

—আজ—আপনি যাই মনে করুন অতসীদি—আজ তন্দ্রাকে দেখতে পাইনি রিহার্সাল-রুমে। আপনাকে বরাবর দেখতে পাচ্ছিলাম—তন্দ্রা নয়, অতসীদি—আমি অভিনয়ের অভিনয় করেছিলাম! ব্যাপারটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না—

অতসী গম্ভীরভাবেই বলল, না রঞ্জন, আমি বুঝতে পেরেছি। তাহলে কী করতে চাও ?

—আপনি যা বলবেন। আমি থিয়েটার করতে ভালবাসি—আপনাদের বড়বাবুর মতই আমি থিয়েটার-পাগল মানুষ—কিন্তু সেটা এতবড় কিছু নয়, যাতে—

—যাতে ?

—কী বলব ? যাতে আপনি বা আমি বিড়ম্বিত হই।

—আমার বিড়ম্বনার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে ?

—আসছে। আমি যদি অভিনয়ের অভিনয় না করে সত্যি অভিনয় করতাম তাহলে আপনি বিড়ম্বিত হতেন—যেমন হয়েছেন জয়ন্তী দেবী—হয় তো সর্বসমক্ষে আপনি আমাকে চড় মেরে বসতেন! আপনি আমাকে অব্যাহতি দিন অতসীদি; আমি অভিনয় শিল্পকে সত্যিই ভালবাসি। যাঁর কাছে এ শিল্পে আমার হাতেখড়ি —যিনি আমার গুরু, তাঁর কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: যদি বুঝতে পারি নাটক-বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছি না তাহলে পরিচালকের অনুমতি নিয়ে সরে আসব; অন্য কোনও অ্যাকটারকে চান্স দেব।

ম্লান হাসল অতসী। বললে, কিন্তু তাতেও তো কারও কোনও লাভ হবে না রঞ্জন। তুমি হার মানবে, থিয়েটারটা নিকৃষ্টতর হবে অথচ আমিও বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি পাব না—তোমার বদলে আর কারও বাহুবন্ধে আমাকে নিষ্পেষিত হতে হবে। কারণ তোমার মত এক কথায় হার মেনে আমি পিছু হটে আসব না। আমার কাছে অভিনয় অভিনয়ই!

বয় এসে খাবার দিয়ে গেল। অতসী দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিল। হাত ঘড়িতে দেখে নিল কটা বাজে। তারপর বললে, জবাব দিলে না যে ?

—জবাব আমি কি দেব বলুন। আপনি বলুন, আমার কী কর্তব্য ?

—প্রাণ দিয়ে কল্যাণের চরিত্রটা অভিনয় করা—এছাড়া কী ? অভিনয়ের

প্রয়োজনে ঐ খণ্ডমুহূর্তে তোমাকে মনে করতে হবে আমি তোমার অতসীদি নই, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় নই—আমি তন্দ্রা এবং তুমি আমার স্বামী। পারবে না? ম্লান হাসল রঞ্জন। বললে, পারব। আপনি পারবেন? ভুলে যেতে যে আমি রঞ্জন চক্রবর্তী নই। কল্যাণ! আপনার স্বামী?

—আমাকে পারতে হবে। চাকরির মায়ায় নয়, অভিনয় শিল্পের মুখ চেয়ে।

রঞ্জন বললে, তাহলে আপনাকে একটা গল্প বলি অতসীদি। বছর খানেক আগে 'কথাকলি' নামে একটা সৌখীন দলের হয়ে আমি অভিনয় করি। ওরা শরৎবাবুর 'বিপ্রদাস' ধরেছিল। আমার ছিল বিজদাদের পার্ট—সেখানেই আপনাদের বড়বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। গ্রীনরুমে এসে কংগ্র্যাচুলেট করে গিয়েছিলেন। আমার 'অপজিটে' 'বন্দনা' কে করেছিলেন জানেন? বিখ্যাত অভিনেত্রী কেতকী বসু!

—তাই নাকি? তুমি অভিনয়কালে ভুলে যেতে পেরেছিলে তো যে তিনি কেতকী বসু নন, বন্দনা?

—তাই তো বলছি। তিনিও এক হিসাবে আমার নাট্যগুরু। প্রথম দিন রিহার্সালে গিয়েছি। ক্লাব সেক্রেটারী আনন্দবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, মিস্ বসু, এই ভদ্রলোক বিজদাস করছেন, এঁর নাম রঞ্জন চক্রবর্তী। আমি হাত তুলে নমস্কার করে বলসাম, আপনার অপজিটে অভিনয় করতে হবে শুনে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—

—কেন আমি কামড়ে-টামড়ে দিই বলে এ-পাড়ায় বদনাম আছে নাকি?

হেসে হেসেই বলেছিলেন তিনি। তারপর প্রথম দিনই রিহার্সালের পরে বললেন, একটা কথা রঞ্জনবাবু! আপনি নর্মাল হতে পারছিলেন না কেন বলুন তো? অন্যান্য সীনে দিব্যি স্বাভাবিক অভিনয় করছিলেন অথচ আমার সঙ্গে যেখানে-যেখানে ডায়ালগ সেখানেই আপনি আড়ষ্ট।

আমি সসঙ্কোচে বলেছিলাম, মুশকিল কি হয়েছে জানেন, আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না যে, আপনি বিখ্যাত অভিনেত্রী কেতকী বসু।

উনি বললেন, কিন্তু তাহলে তো চলবে না। মনের মধ্যে অমন ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নিয়ে সার্থক অভিনয় করা চলে না। এ আড়ষ্টতা আপনাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

আমি পুনরায় সলজ্জে বলেছিলাম, চেষ্টা করব।

—আমিও তোমাকে সাহায্য করব রঞ্জন। প্রথম স্টেপ হচ্ছে, তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকবে, এবং 'তুমি' বলবে, বুঝলে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, সর্বসমক্ষে ?

—ক্ষতি কি ? তুমি তো আমার চেয়ে বয়সে বড় ? কেউ কিছু মনে করবে না।

আমি বলেছিলাম, এক শর্তে রাজী আছি কেতকী দেবী। অভিনয় শেষ হয়ে গেলে আমি আবার 'কেতকী দেবী' বলব, 'আপনি' বলব।

উনি হেসে বলেছিলেন, সে তোমার যা খুশি।

গল্প শেষ হলে অতসী বললে, এখনও কি তুমি তাঁকে নাম ধরে ডাক ?

—না। প্রশ্নটা অবৈধ। সে সুযোগই আর আসেনি জীবনে। এই এক বছরে তিনি আরও দূরের মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর খ্যাতি আরও বেড়ে গেছে। ঐ অভিনয়-রজনীর পরে তাঁকে মাত্র একবারই দেখেছি। ওঁর একটি ফিল্মের 'প্রিমিয়ার শো'তে। আমি ছিলাম নিচের হলে, উনি ব্যালকনিতে। আমি ওঁকে দেখতে পেয়েছিলাম, উনিও পেয়েছেন কিনা তা বুঝতে পারিনি। অভিনয় শেষ হলে আমার সামনে দিয়েই ওঁরা নেমে চলে গেলেন—আমার সাহস হল না ডাক দিতে। যে ভদ্রমহিলা তাঁকে নাম ধরে ডাকবার অধিকার দিয়েছিলেন মাত্র একবছর আগে, যাঁর সঙ্গে প্রেমাভিনয় করেছি, তাঁকে 'মিস বসু' বলেই ডাকবার সাহস সেদিন সঞ্চয় করতে পারিনি। যদি তিনি চিনতে না পারেন ?

যেন একটা ভা—রী ট্রাজিক গল্প শুনিয়েছে। দ্বিজদাস-বন্দনার অনুরাগের অপমৃত্যুতে, ওরা এক মিনিট নীরবতা পালন করছে যেন। ইতিমধ্যে বয় এসে দু কাপ চা-খাবার রেখে গেছে টেবিলে। অতসী চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে বললে, তোমার গল্পটার ময়্যাল কী রঞ্জন ?

—ময়্যাল! ময়্যাল তো এইটাই যে, অভিনয় শিল্পকে যদি গ্রহণ করতে হয় তাকে পুরোপুরি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

—আর কিছু নয় ? আমি ভেবেছিলাম অন্য কিছু।

—অন্য কিছু মানে ?

—তুমি বুঝি কায়দা করে আমার অনুমতি চাইছ—নাম ধরে ডাকার এবং 'তুমি' বলে কথা বলার। স্বামীত্বের দাবী ফলানো—

রঞ্জন জবাব দিল না। নিঃশব্দে চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অতসীই আবার বলে, কী হল ? হয় স্বীকার কর, নয় প্রতিবাদ কর।

রঞ্জন মুখ তুলে তাকায়। বলে, দুটোই হবে মিথ্যাচরণ। প্রথমত সে উদ্দেশ্য নিয়ে গল্পটা আপনাকে শোনাইনি ; দ্বিতীয়ত, এখন মনে হচ্ছে : দ্যাট যে রিয়ালি হেলপ্।

—কী ? তুমি আমাকে 'অতসী' বলে ডাকবে সর্বসমক্ষে ?

রঞ্জন ম্লান হাসল।

কেমন যেন কৌতুক বোধ করল অতসী। বললে, এস মাঝামাঝি রফা করি। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার অসুবিধাটা : পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ! শোন, সর্বসমক্ষে তুমি আমাকে অতসীদিই বলবে, 'আপনি' বলে কথা বলবে—অনান্তিকে আমাকে নাম ধরে ডাকতে পার, 'তুমি' বলেও কথা বলতে পার।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রঞ্জনের। বললে : থ্যাঙ্কস!

অতসী ধমক দেয়, আবার বলে—থ্যাঙ্কস্! সেদিনই বলেছি না, দিদিকে 'থ্যাঙ্কস্' দিতে নেই ?

—আয়াম সরি!

সম্পূর্ণ বদলে গেছে রঞ্জন। একগাল হেসে বললে, এটাও কিন্তু ভুল বললাম অতসী। দিদিকে তো বলছি না এখন, বলছি—'তন্দ্রা'কে। প্রেম করছি যে। তাই 'সরি' বলার অধিকারও আমার নেই।

নিজের অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল অতসীর। চৌরঙ্গীর পর্দা-ঘেরা কেবিনে সে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে—এই আঠাশ বছরের জীবনে—হোক অভিনয়, তবু কেমন যেন অস্বোয়াস্তি বোধ করে। বেশ অনুভব করে পাগল ছেলেটার দৃষ্টি, তার হাসি, তার অ্যাটিচুড মুহূর্তে বদলে গেছে। ছেলেটা একটু অন্য ধরনের—কবিতা লেখে, অভিনয় পাগল, অন্য জাতের। প্রেম করার অনুমতি পেয়ে সে অন্য এক রঞ্জন হয়ে গেছে। পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে। ও যে সিগারেট খায় এটা জানাই ছিল না অতসীর। দিব্বি মুরুব্বি চালে দেশলাইয়ের উপর সিগ্রেটটা বারকতক ঠুকে রঞ্জন বললে, তুমি জান অতসী, কেন 'সরি' বলার অধিকার আমার নেই ?

কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠেছে অতসীর। পাগল ছেলেটা এরপর কী করে বসবে তার কি স্থিরতা। আমতা আমতা করে বললে, না। কেন?

—বলতে পার কে বলেছিল, Love means not ever having to say you're sorry. ?

—না। কে বলেছিল ?

—একটি লিউকেমিয়ার রুগী। বলেছিল তার স্বামীকে। এবার বল কোথা থেকে ? কুইজ টেস্ট হচ্ছে। পাঁচ সেকেণ্ড। টিক-টক্-টিক-টক্-টিক-টক্...

জবাব দেবার মত অবস্থা নেই তখন অতসীর। সে যে রঞ্জনের চেয়ে বয়সে

বড়, পাঁচ মিনিট আগেও ছোট ভাইয়ের মত রঞ্জনকে ধমক-ধামক দিয়েছে এসব কথা ওর মনেও পড়ল না। ছোট্ট মেয়ের মত মাথা দুলিয়ে বললে, জানি না। কোথা থেকে?

—এরিক শেগালের : Love Story!

তারপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে। এই এক মাসে না-হক দশ বারো বার ঐ ছেলেটার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে হয়েছে অতসীকে। সর্বসমক্ষে। জয়ন্তী প্রমীলা-রেখার দল জানতে চায়নি রঞ্জনের আলিঙ্গন পাশ 'রিয়েল এমব্রেসিং' কি না। প্রশ্নটা করতে সাহসই হয়নি তাদের। ব্যাপারটা যে নাট্য'বোদ' মনোজ ঘোষের অজানা নয় তা আজ টের পেল অতসী, তাঁর ঐ কথাটায় : তুমি নিহকে একটি সোচ্চার প্রতিবাদ করেছ বলে। আই কংগ্রাচুলেট য়ু অ্যান্ড এ ড্রামা-শালায়!

॥ ৫ ॥

এই এক মাসে অতসীর নিজেরও বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমটা নিজের কাছে স্বীকার করেনি—অশালীন-চিন্তা বলে মনের মধ্যে-জাগা প্রশ্নটাকে অবচেতনের গভীরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু মন জিনিসটা ভারী পাজী! যে চিন্তাটাকে শুভবুদ্ধির লগি দিয়ে জাগর চিন্তায় ঠেসে ধরবে—নিদ্রার অবকাশে সেটাই ঠেলে উঠবে স্বপ্নের মধ্যে! অবচেতনের তির্যক বাসনা চরিতার্থ করার ঐ এক পটভূমি—স্বপ্নের রঙ্গমঞ্চ! সেখানে ও তার আঠাশ বছরের গাম্ভীর্য নিয়ে অটল থাকতে পারে না, নিতান্ত ছেলেমানুষ হয়ে ওঠে! ভাগ্যে স্বপ্নগুলোর কথা আর কেউ জানতে পারে না!

দু-এক সপ্তাহ পার করে অতসী বুঝল : এভাবে হবে না। অবচেতনের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে হবে। হতভাগাটা কী চায়? কী ভাবে তাকে বাগে আনা যায়? সত্যিই তো আর সে ঐ একফোঁটা ছেলেটাকে—

মনোবিশ্লেষণ করে অতসী বুঝেছে, অবচেতন মন এতদিনে একটা ফাঁকি-বাজির খেলায় মেতেছে। কুনালের জায়গায় সে রঞ্জনকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কুনাল সম্বন্ধে সে সংযত হতে পেরেছিল। বন্দনাকে বিবাহ করার পর কুনালের কথাটা সে ভুলে যেতে পেরেছে—তাই অবচেতন মন-ব্যাটা এখন প্রতিশোধ নিতে চায়। ওকে অপদস্থ করতে চায়।

অভিনয় অভিনয়ই—কিন্তু সেই পরিধিতে মন ব্যাটা বাঁধা থাকতে চায় না। সে আরও সুযোগ পেয়েছে রঞ্জনকে ছাড়পত্র দেওয়ায়। রঞ্জনের এখন দ্বৈতসত্তা। সর্বসমক্ষে সে অতসীর ছোট ভাই—একান্তে সে তন্দ্রার স্বামী। মাঝে মাঝে অতসীর মনে হয়—পাগল ছেলেটাকে ওভাবে লাই দেওয়া ঠিক হয়নি। আবার পরক্ষণেই মনে হত, না! রঞ্জন কোনও অন্যায় সুযোগ নেবে না তার বদান্যতার। কিন্তু ওর আচরণটা বিসদৃশ। অফিসে সে অতসীদির কাছে কাজ বুঝে নেয়, অফিস ছুটির পর ট্রাম-স্টপেজে চুপচাপ অপেক্ষা করে। অতসী এলেই বলে, চল কোন চায়ের দোকানে ঢুকি।

অতসীর ভয় করে। এই ধেড়ে বয়সে কলঙ্ক রটবে বলে নয়, হাসির খোরাক যোগাতে হবে বলে। ঐ যে কথা বড় মামা আজ সকালে বলেছে: তোর লজ্জা করে না হাঁটুর বয়সী একটা ছেলের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করতে!

না! রঞ্জন ওর হাঁটুর বয়সী নয়, বেলেল্লাপনাও সে কিছু করছে না; কিন্তু যেটা করছে সেটাই কি সুরুচিসম্মত? 'রুচি' বস্তুটা দেশ-কাল-সমাজ নির্ভর। যে সমাজে ওরা বাস করে সেখানে রিহার্সাল-রুমে সর্বসমক্ষে রঞ্জন চক্রবর্তীর বিয়্যাল এমব্রেস-টাও স্বীকার্য; কিন্তু জনান্তিকে তার 'ফেক-লাভ স্টোরির' উদ্ধৃতি শোনাটা অপরাধ! সেটা সামাজিক নির্দেশ, অতসীর আন্তরিক সায় নেই তাতে। তার মনে হয়েছিল—যে কারণে ঐ অনাত্মীয় যুবকটির বাহুবন্ধে ধরা দেওয়াটা সামাজিক অপরাধ নয়—যেহেতু নাট্যশিল্পে একালে সেটা গ্রাহ্য, ঠিক সেই কারণেই ওর এ ছেলেমানুষীটাকে মেনে নেওয়াও অপরাধ নয়। ছেলেটার মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করাও তার কর্তব্য—ঐ নাট্যশিল্পের দোহাই দিয়েই। না হলে রঞ্জন চক্রবর্তীর তন্দ্রা যায় হারিয়ে, উপস্থিত থাকে মূর্তিমতী অতসী রায়। যুক্তিটা সাধারণ মানুষকে বোঝানো যাবে না, হয়তো মনোজ ঘোষ বুঝতেন। অতসী বুঝেছিল। এ শুধু রঞ্জনের মুখ চেয়ে।

কিন্তু শুধুই কি তাই? মনের অগোচরে পাপ নেই! অতসী যে নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না। নিজের অনুভূতিটাকে। দ্বিতীয় দিনে প্রমীলার রসিকতাটায় সে ছোট্ট কিশোরী মেয়ের মতই রাঙিয়ে উঠেছিল। প্রমীলা বলেছিল, মিস্টার চক্রবর্তী, আপনার পাঞ্জাবিতে সিঁদুরের দাগ লেগেছে। ওটা ভালো করে মুছে ফেলুন! বাড়ির লোক না হলে ভুল বুঝবে!

বেখা বিশ্বাস যথারীতি খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠেছিল—মানে?

অতসী চোখ তুলে দেখেছিল: সত্যই। ওর কপালের টিপ রঞ্জনের পাঞ্জাবিতে একটা দাগ দিয়েছে!

অনুভূতিটা অস্বীকার করে কি করে? সে জয়ন্তী নোম নয়। ওর আঠাশ বছরের জীবনে এ অভিজ্ঞতা হয়নি। প্রদীপদাকে ভাল লেগেছিল; তখন ও কিশোরী, কিংবা বালিকাই। প্রদীপদা বেশী দিন বাঁচেনি। কোনদিন তার বাহুবন্ধে ধরা দেবার প্রশ্নই ওঠেনি। কুনাল দু-একবার ওর হাত দুটি ধরেছে; কিন্তু রঞ্জনের মত সবল আলিঙ্গনে বুকে টেনে নেয়নি কোনদিন। সেদিক থেকে কুনাল ছিল খুবই পিউরিটান। মন জানাজানি হবার পরেও সাহস করে কোন দিন অতসীকে চুমু খায়নি। ফলে ওর আঠাশ বছরের অনাদৃত যৌবন সত্যই শিউরে উঠেছিল দ্বিতীয় মহড়ার দিন, যখন কল্যাণ তার তন্দ্রাকে সবলে বুকে টেনে নিয়েছিল। ওর বাহুবন্ধে সত্যই থরথর করে কেঁপে উঠেছিল অতসী। মনোজদা বলেছিলেন, ওয়াণ্ডারফুল! আজ অভিনয় যা করলে অতসী, সিম্প লি সুপার্ব!

অতসী মরমে মরে যায়। অভিনয়! অভি-পূর্বক নি-ধাতু অল! 'নি'কটে আসতে পারার সৌভাগ্যে সে যে নিজেই 'অভি'ভূত। কী বলবে? কেমন করে স্বীকার করবে আত্মসমর্পণের যে ব্যঞ্জনা তার সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে তা আদৌ অভিনয় নয়—তা একটা, ছি ছি ছি,—তার আঠাশ বসন্তের উপেক্ষিত স্বপ্নে-দেখা এক অনুভূতির বাস্তব প্রকাশ! একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণামেশানো আনন্দের অভিব্যক্তি। ভয়ে ভয়ে সে মুখ তুলে দেখেছিল—রিহার্সাল-রুমে উপস্থিত সকলের দিকে। আশ্চর্য! কী মূর্খ মানুষগুলো। কেউই ধরতে পারেনি অপরাধীকে। সকলেই একবাক্যে সমর্থন করেছিল বড়বাবুকে—তন্দ্রার চরিত্রটা সুন্দর করে পারছে অতসী।

বোধহয় রঞ্জনও বুঝতে পারেনি কিছু। অন্তত কথাবার্তায় স্বীকার করেনি। রঞ্জন ছেলেটা সত্যই পাগল! তার চোখে অভিনয়কালে অতসী অতসী নয়, সে তন্দ্রা। তার স্ত্রী, তার কামনার ধন। অতসীকে সে দেখেও দেখতে পায় না, দেখে তন্দ্রাকে। কিন্তু অতসীর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে? মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই। নিজের মনের মুখোমুখি যখন নির্জনে দাঁড়ায়—পাশবালিশ জড়ানো ঘুম-ন-আসা রাতে, বাসের জানলায় মাথা রেখে হু হু করে বাড়ি ফেরার পথে, কিংবা রুদ্ধদ্বার স্নানঘরে বিবসনা অবস্থায়—তখন শিউরে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। স্বীকার করতেই হয়—ঐ দীর্ঘকায় পুরুষটার বাহুবন্ধে যখন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল তখন সে তার নাট্যকথিত স্বামীর আলিঙ্গনে ধরা দেয়নি, কল্পনা-কুনালের বাহু-বন্ধেও নয়—ওর অনুভূতিতে সে পুরুষটা ছিল নিতান্তই রঞ্জন চক্রবর্তী—সেই খেয়ালী, ভাবপ্রবণ, নাটক-পাগল, কবি!

ছি ছি ছি। এ কী কাণ্ড করে বসেছে অতসী। দুনিয়া জানে না, দুনিয়া জানবে না কোনদিন—তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রমীলা-জয়ন্তী-রেখার দল পর্যন্ত ধরতে পারেনি, রঞ্জনও টের পায়নি—কিন্তু অতসী জানে, অভিনয়ের অছিলায় এ-এক সর্বনাশা আত্মরতির খেলায় মেতেছে সে। আত্মরতি ছাড়া আর কি? যেখানে প্রেমের পাত্র ওর আন্তর অনুভূতির নাগাল পায় না, অথচ অতসী একক মননে ঐ পুরুষের গায়ের গন্ধ, তার দেহস্পর্শ, তন্দ্রা-নায়ক-অপার্থিব জীবের প্রতি প্রযোজ্য প্রেম-কূজন থেকে উপাদান চয়ন করে একা-একাই একটা, হ্যাঁ যৌন-অনুভূতিতে আত্মতৃপ্তি পায়, তাকে আত্মরতি ছাড়া আর কী বলা যায়? রিহার্সালের দিনটিতে তার ভাবান্তর হয়, সকালে ঘুম থেকে উঠেই ওর মনে পড়ে আজ রিহার্সাল আছে। সেই সকাল থেকেই ওর মনের মধ্যে দুই-অতসীর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। অতসীর দ্বৈতসত্তা। মনের একটা অংশ প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে, দ্বিতীয় অংশ তাকে ক্রমাগত টিটকারি দেয়। এক মন বলে, আজ শাম্পু করবে বলেছিলে না? দ্বিতীয় মন ধমকে ওঠে, লজ্জা করে না ও কথা বলতে? এক মন বলে কত দিন থেকে বলছি একটা সেন্ট কেন; দ্বিতীয় মন প্রতিবাদ করে, তোমা গলায় দড়ি জোটে না?

প্রথম মন সলজ্জে বলে, না, না, তুমি যা ভাবছ ত নয়—গরম কাল তো, ঘামের গন্ধ হয়! দ্বিতীয় মন মুখ টিপে বলে—তাই বুঝি?

অফিস ছুটির পর প্রমীলা বলল, অতসীদি, আপনি বুঝি আজ রঞ্জনবাবুর বাড়িতে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, কে বলল?

—বড়বাবু বলছিলেন।

—চল না প্রমীলা, তুমিও চল—একা-একা এতটা পথ—

জবাবটা জানাই ছিল। অতসী জানত, লক্ষ্মণ পট্টনায়েক আজ ওকে বারে ম্যাটিনী শো'র দুখানি টিকিট কেটেছে। প্রমীলা দুঃখ প্রকাশ করল সঙ্গে যেতে পারছে না বলে; আরও বলল, সোমবার আপনার কাছ থেকে জানতে পারব, রঞ্জনবাবু কেমন আছেন।

এসপ্ল্যানেডের মোড় থেকে শ্যামবাজারের বাস ধরল অতসী।

বাসে যেতে যেতে ওর মনে পড়ছিল তিন সপ্তাহের আগের অংশখানটার কথা।

সেটাও একটা শনিবার। অনেক কমার্শিয়াল অফিসে আজকাল সপ্তাহে দুদিন ছুটি—শনি-রবি। ওদের এখনও তা হয়নি। শনিবার হাফ-ছুটি, বেলা

আড়াইটায়। সেবার অতসীকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল রঞ্জন। বলেছিল, বৌদি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তোমার গল্প অনেক করি কিনা।

—কেন ? আমার গল্প সাতকাহন করে বৌদিকে শুনিয়েছ কি করতে ?

—বাঃ! তুমিই তো আমার একমাত্র বান্ধবী এ অফিসে !

—তুমি কি বৌদির সামনে আমাকে নাম ধরে ডাকবে নাকি ? 'তুমি' বলবে ?

—পাগল ! তাহলেই বৌদি সব বুঝে ফেলবে—

—বুঝে ফেলবে ! কী বুঝে ফেলবে ?

—যে তোমার সঙ্গে আমি লুকিয়ে প্রেম করছি। তুমি আমার বৌ।

অতসী কণ্টকিত হয়ে ওঠে। ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে ওরা। বাসের অন্যান্য যাত্রীরা লক্ষ্য করছে না। তাহলেও পাগল ছেলেটাকে বিশ্বাস নেই। অতসী বলে, সে তো তুমি প্রেম করছ তন্দ্রার সঙ্গে, আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী ?

—বৌদি সিধাসাধা মানুষ, এত ঘোর প্যাঁচ বোঝে না।

এই কথোপকথনটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ। আর ঐ সঙ্গে কিছু মনো-বিশ্লেষণও করল অতসী। সে কি সেই মুহূর্তে তন্দ্রাকে ঈর্ষা করেছিল ? ওর মনে পড়ে গিয়েছিল কী একটা সিনেমার কথা। সুচিত্রা সেন একজন মানসিক রোগীর নার্সের পার্ট করছিল। রোগী ঐ নার্সের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেত তার হারানো প্রেমিকাকে। আর নার্স সেই তৃতীয় সত্তার বকলমে প্রেমের অভিনয় করত। অতসীর অবস্থাও আজ যেন সেই রকম। এই আধা-পাগলা ছেলেটা 'তন্দ্রা' নামে একটা অবাস্তব মেয়েকে ভালবাসে। তন্দ্রার স্বামী আছে, রূপ আছে, যৌবন আছে—আর অতসীর সে সব কিছুই নেই। তবু সেই অপার্থিব তন্দ্রাদেবীর সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গেছে। তার চরিত্রটা অভিনয় করে যাচ্ছে একজন খামখেয়ালীর উদ্ভট মানসিকতার খেসারত মেটাতে। এ খাষ্টামোতে কেন রাজী হল অতসী ? নাট্যশিল্পের মুখ চেয়ে ? ঐ ছেলেটার একটা উদ্ভট খেয়াল চরিতার্থ করতে ? নাকি তার নিজস্ব কামনা-বাসনার [illegible] পরিতৃপ্তির [illegible]

সেবার [illegible] এক প্যাকেট সন্দেশ কিনে নিয়ে গিয়েছিল। রঞ্জনের ভাইপো-ভাই [illegible] আলাপ করেছিল সকলের সঙ্গে। রঞ্জনের দাদা, বৌদি, [illegible] বলেছিলেন, আপনার কথা রঞ্জন [illegible] আপনাকে দেখতে। আপনি

এসেছেন, খুব ভাল লাগছে। আপনাদের থিয়েটারের টিকিট দেবেন কিন্তু ভাই—

অতসী বলেছিল, ও থিয়েটার আর আপনাকে দেখতে হবে না।

—কেন? কেন?

—এই খেড়ে বয়সে আমি নায়িকার পার্ট করব—আর রঞ্জন···

সঙ্কোচে থেমে যায়। বৌদি বলেন, একটুও বেমানান লাগবে না। আজকাল এমন সুন্দর মেক-আপ দেয় যে, বোঝাই যায় না। আর তাছাড়া তোমার ফিগারটা তো এখনও সুন্দর আছে···ঐ যা, আপনাকে 'তুমি' বলে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না ভাই—

—মনে করব, যদি আপনি আবার 'আপনি' শুরু করেন। আমি রঞ্জনের চেয়ে বড়, কিন্তু আপনার চেয়ে তো ছোট। আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

বৌদি খুশি হন। বলেন, বেশ, তাই বলব। তোমার পছন্দ করা শাড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কী করে বুঝলে আমি লাল কস্কাপাড শাড়ি পছন্দ করি?

—আপনার দেওর বলেছিল।

রঞ্জন্ আগ বাড়িয়ে বলে, তাছাড়া বৌদিকে লাল কস্কাপেড়ে শাড়িতে যা মানায়! বৌদি ধমক দেন, তুমি আমাদের মধ্যে কেন কোডন কাটতে এসেছ? মেয়ে-মহলে কথা হচ্ছে, এখানে ঘুরঘুর করা কেন? যাও, নিজের ঘরে বসে কবিতা লেখ গে!

অতসী অবাক হবার ভান করে বলে, রঞ্জন কবিতা লেখে বুঝি?

—আর বল না ভাই। ও একটা বদ্ধ পাগল।

ধমক খেয়ে রঞ্জন ইতিপূর্বেই পালিয়েছে। তাই বৌদি রঞ্জনের যাবতীয় পাগলামির বিস্তারিত বিবরণ দিতে থাকেন। তিনি যখন এ সংসারে আসেন তখন রঞ্জন ক্লাস এইটে পড়ে। তার আগেই শাশুড়ী গত হয়েছেন, শ্বশুর মারা যান আরও বছর দুই পরে। সুতরাং বৌদির মাধ্যমেই রঞ্জু তার মাতৃস্নেহের স্বাদ পেয়েছে।

অতসী বলেছিল, এবার দেওরের বিয়ে দিয়ে দিন। চাকরিতে তো ঢুকেছে। এখন সংসার হলে ঐ সব পাগলামি ঘুচবে।

বৌদি বলেছিলেন, চাকরি কোথায় ভাই? ও তো তিন মাসের নোভ-ভেকেন্সি। একটু স্থায়িত্ব না হলে কি দায়িত্ব চাপানো উচিত হবে? তাছাড়া ছেলেটা···

মাঝপথেই খেয়ে যান। অতসী বুঝতে পারে। প্রসঙ্গটা সে থামতে দেয় না। বলে, শুনেছি। রঞ্জন নিজেই বলেছে। বারে বারে ঘুরে ফিরে জ্বরে পড়ে। কী ব্যাপার? ঠাণ্ডার ধাত?

কেমন যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন বৌদি, না ভাই। ব্যাপারটা বোঝা যায়নি। অনেক ডাক্তার-বদ্যি দেখানো হয়েছে। কেউই ধরতে পারেনি। গ্ল্যাণ্ড-ম্যাণ্ড ফোলে, গায়ে হাতে ব্যথা হয়। জ্বরের তাড়সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। আবার ঠিক হয়ে যায়।

অতসী ইতস্তত করেছিল। 'ওরো চেক্-আপে'র কথাটা সঙ্কোচে বলতে পারেনি। সে প্রসঙ্গ তো রঞ্জনের সঙ্গে আগেই হয়ে গেছে। অভাবের সংসারে রাজকীয় চিকিৎসা একটা বিলাস।

বাণ্ডইআটির মোড়ে বাসটা এসে যখন থামল তখন পড়ন্ত বেলা। সামনেই একটা বাজার। চায়ের দোকানে একটা চাপ ভিড়। শনিবারে কী বুঝি চ্যারিটি খেলা হচ্ছে ময়দানে; তারই ফিরে হচ্ছে বেতারে। ভিড় এড়িয়ে অতসী বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। ওদের বাড়িটা বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় আধমাইল ভিতরে। রিক্‌শ নেবার দরকার নেই। হেঁটেই পাড়ি দেওয়া যাবে। কলকণ্ঠে সাইকেল রিক্‌শার ঝাঁক চলেছে। অতসী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনেই একটা মিষ্টির দোকান। কিনে নেবে নাকি কিছু? নাঃ। প্রতিদিন মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে গেলে ওঁরা অথোয়াস্তি বোধ করতে পারেন—কেমন যেন কুটুম-কুটুম লাগে তাতে। তাছাড়া অসুস্থতার খবর পেয়ে আজ দেখা করতে যাচ্ছে—

ঠিক তখনি নজর পড়ে এ-কোনায় একজন ফুল বিক্রি করছে। রজনীগন্ধা, বেলফুলের মালা, দণ্ডকলস আর গোলাপ। হঠাৎ বুদ্ধি খুলে যায়। রোগীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় ফুল নিয়ে যাওয়া চলে। অতসী একগুচ্ছ গোলাপ কিনল এক ডজন। দাম মিটিয়ে গোলাপের তোড়াটা হাতে নিয়ে কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। কাজটা কি ঠিক হল? কেন নয়? এর মধ্যে লজ্জা পাওয়ার কী আছে? আলতো করে তোড়াটা বুকের কাছে চেপে ধরে অতসী চলতে থাকে।

রাস্তা চিনতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বড় রাস্তাটাই এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে নতুন গড়ে ওঠা কলোনীর বুক চিরে। দু-দশ বছর আগে অঞ্চলটা ছিল মজা পুকুরে ভরা—আসশ্যাওড়া আর আকন্দের ঝোপে আকীর্ণ। ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বাড়ি, এমনকি শহরে হাল ফ্যাসানের বাস্তুও। বিসর্পিল

পথে এঁকে বেঁকে নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অতসী।

রঞ্জনের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একখানা কালো রঙের মরিস মাইনর। এতে অবাক হবার কি আছে?

আছে। গাড়ির নম্বর-প্লেটটা অতসীর অতি পরিচিত।

কোনও কার্য কারণ সম্পর্কের হদিস খুঁজে পায় না সে।

বাগানে করবী গাছতলায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল শান্তা—রঞ্জনের ভাই-ঝি। সে দেখতে পেল অতসীকে। উল্লাসে চীৎকার করে উঠল না: মা, দেখো কে এসেছে।

বরং পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কাছে। মুখটা থমথম করছে তার। অতসীর হাতখানা টেনে নিয়ে বললে, ডাক্তারবাবু এসেছেন। কাকামণিকে দেখতে।

সম্বিৎ ফিরে পায় অতসী। বলে, কেমন আছেন কাকামণি?

—জানি না!

সত্যই জানত না সাত বছরের মেয়েটা। কাকামণির জ্বর নেই, হাসি ঠাট্টা সবই করছে, বার্লি খায় না, ভাতই খাচ্ছে অথচ শহর থেকে বড় ডাক্তার তাঁকে দেখতে এসেছে। এক্ষেত্রে সে কী বলবে? কাকামণি ভালো আছে, না—না?

অতসী তার হাতটা ধরে বলে, এস ভিতরে যাই।

—না। আপনি যান। আমি এখানে থাকব।

অতসী পীড়াপীড়ি করল না। ছোট্ট বাড়ি। বোধহয় ওর মা ভিড় কমাবার জন্যে ওকে বলেছে—যা খেলগে যা। মেয়েটা জানে, এখন খেলতে নেই। খেলার ইচ্ছাও তার নেই। কিন্তু ডাক্তারবাবু বিদায় না হলে সে ভিতরে যাবে না।

কঞ্চির বেড়া দেওয়া গেটটা পার হয়ে, ইট-বাঁধানো পায়ে-চলা পথটা অতিক্রম করে বৈঠকখানায় ঢুকেই আর একটা ধাক্কা খেল অতসী। আর একজন অপ্রত্যাশিত আগন্তুক। কেমন যেন অমঙ্গলের একটা ছায়া ঘিরে ধরে ওকে। লোকটা অপয়া—বিশেষ করে অতসীর জীবনে। এই লোকটাই কীসব হিসাব কষে নিদান হেঁকেছিল: অতসী বিষকন্যা!

—তুমি! এখানে? কী ব্যাপার?

অতসী সামলে নিয়ে বললে, রঞ্জনবাবু আমাদের অফিসেই চাকরি করেন।

—অ! তা যাও, ভিতরে যাও। কুন্তল এসেছে ওকে দেখতে।

অতসী প্রশ্নটা না করে পারল না, আপনি এদের চিনলেন কেমন করে?

—৺ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় মা। রজত-রঞ্জনের গর্ভধারিণী আমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। যাও ভিতরে যাও—

অতসীর ইচ্ছা ছিল না ভিতরে ঢুকতে। অন্তত এই মুহূর্তে। তাকে একটু সামলে নিতে হবে। কিন্তু ঠাকুরমশাই বারে বারে তাগাদা দেওয়ায় সে ঘরের বিপরীত দিকে এগিয়ে যায়। তাছাড়া ঐ করালীকিঙ্করের মুখোমুখি এই বৈঠকখানাতে বসে থাকাও কোন কাজের কথা নয়।

সামনেই রুগীর ঘর। পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করে দেখল, ঘরে কুনাল এবং রঞ্জনের দাদা দাঁড়িয়ে আছেন। কুনাল একটি ডাক্তারী ব্যাগে কিসব গুছিয়ে রাখছিল—দ্বারপ্রান্তে নিঃশব্দে কে এসে দাঁড়িয়েছে, তা সে নজরই করেনি। সে চমকে ওঠে রোগীর কণ্ঠস্বরে। পিঠে বালিশ দিয়ে রঞ্জন আধশোয়া হয়ে বসেছিল খাটে। হঠাৎ দ্বারপথে দৃষ্টি পড়ায় সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: এসেছ? আমি জানতাম আজ তুমি আসবে। বাঃ! কী সুন্দর গোলাপ! আমার জন্য এনেছ নিশ্চয়? দাও, আমাকে দাও।

কুনাল মুখ তুলে তাকায়। এবং তৎক্ষণাৎ চমকে ওঠে। অস্ফুটে বলে, তুমি!

সে কথা কানে যায় না কারও। রঞ্জনই এক নাগাড়ে বলে চলেছে, আমার মন বলছিল আজ তুমি আসবে। আজ শনিবার তো। অফিস ছুটির পর তুমি নিশ্চয়ই…

হঠাৎ রঞ্জন বুঝি অনুভব করে, কোথায় কী একটা বিলক্ষণ ব্যাপার ঘটে গেছে। থিয়েটারের ভাষায় যাকে বলে 'ফ্রিজ' হয়ে যাওয়া। ওর চোখের সামনে গোটা রঙ্গমঞ্চটাই তেমনি ফ্রিজ হয়ে গেছে। থিয়েটার-পাগল রঞ্জন চক্রবর্তীর বোধ করি মনে পড়ে যায়—রঙ্গমঞ্চে সবাই যখন 'ফ্রিজ হয়ে যায়' তখন নীরবতাই বাঙ্ময়! সেও হঠাৎ চুপ করে যায়।

রজত চক্রবর্তীই প্রথমে কথা বললেন, এস মা, ভিতরে এস।

সলজ্জচরণে অতসী ভিতরে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। রজতবাবুই পুনরায় বলেন, ডাক্তারবাবু রঞ্জুকে দেখতে এসেছিলেন।

তারপর কুনালের দিকে ফিরে বললেন, রঞ্জুর সহকর্মী, মিস্ অতসী রায়।

কুনাল হাত দুটি বুকের কাছে জড় করে বললে, নমস্কার। আমার নাম কুনাল বসু।

আপাদমস্তক জ্বালা করে উঠল অতসীর। কুনালকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে

হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে দিল। রজতবাবুকে বলল, উনি আমার আত্মীয়। অপরিচিত নন।

রজতবাবু একটু অবাক হয়ে বলেন, সে কি! তাহলে ডাক্তারবাবু যে সেল্ফ ইন্ট্রোডাকশান দিচ্ছিলেন?

কুনালের বুদ্ধির তারিফ করতে হবে। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, আমি ভেবেছিলাম উনি বুঝি আমাকে ভুলেই গেছেন। পরিচয় না দিলে চিনতে পারবেন না। সম্পর্কটা কিঞ্চিৎ মধুর কিনা! আমি ওঁর ভগ্নিপতি!

—ও তাই বলুন।

অতসী সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে বললে, কেমন বুঝলেন ডাক্তারবাবু?

কুনাল লক্ষ্য করল, অতসীর সম্ভাষণে আত্মীয়তাটা স্বীকার করা হয়নি, অথচ কুনাল নিজেই যখন অপরিচয়ের দূরত্বে সরে থাকতে চেয়েছিল তখন অতসীই তাকে সে সুযোগ দেয়নি। কুনাল বুঝতে পারে, ঘটনার আকস্মিকতায় অতসী তার স্বাভাবিক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। এক্ষেত্রে সে কী স্ট্যাণ্ড নেবে তা স্থির করে উঠতে পারছে না। কুনাল একবার অতসী একবার রঞ্জনের মুখের দিকে দেখে নিল। তারপর বলল; খুব কঠিন ব্যামো! রঞ্জনবাবু একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। প্রেমরোগ! চিকিৎসা করা কঠিন।

রজত চক্রবর্তী ধীর পায়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

অতসীর আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে। কী একটা কঠিন জবাব সে দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই রঞ্জন বলে বসে, ঠিক ধরেছেন তো! কেমন করে বুঝলেন?

—আপনার নাড়ি টিপে!

—ঔষধ কী দিচ্ছেন? কিছু তো প্রেসক্রাইব করলেন না?

—ঔষধে এ রোগ সারবার নয়, সারবে নার্সিংএ! আপাতত তাই মিস্ রায়ের হাতে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। দেখুন, যদি উনি আপনাকে চাঙ্গ করে তুলতে পারেন!

অতসী কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। তার কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কুনাল এগিয়ে আসে। অতসীর হাত থেকে গোলাপের তোড়াটা নেয়। রঞ্জনের হাতে তুলে দেবার সময় বলে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে রঞ্জনবাবু, একটি ফুল আমি নেব?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

তোড়া থেকে একটি অর্ধস্ফুট রক্তমুখী গোলাপ তুলে নিয়ে কুনাল বলে, তুমি

যে নিজে হাতে আমার বাটন্-হোলে পরিয়ে দেবে এতটা ভরসা করতে পারছি না। তবু এই আকস্মিক-সাক্ষাতের মধুর স্মৃতি হয়ে আজকের একটা সন্ধ্যা এটা থাকুক না আমার জামায়!

নিজে হাতেই কোটের 'বাটন-হোলে' ফুলটা গেঁথে ব্যাগটা তুলে নেয় হাতে।

পর্দা ঠেলে বার হতেই রজতবাবু এগিয়ে এলেন।

অতসী শুনতে পেল কুনাল তাঁকে বলছে, না না, 'ফিস্' আমাকে আগেই দিয়ে দিয়েছেন করালীবাবু।

এবার রজতবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, না, না, উনি কেন দেবেন?

—সেটা তাঁর সঙ্গেই ফয়সালা করবেন। মোট কথা দুবার তো ফি নিতে পারি না আমি!

একটু পরেই রাস্তার দিক থেকে ভেসে এল মরিস্ মাইনর গাড়িটার স্টার্ট নেওয়ার শব্দ। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে অতসী দেখল—কুনাল গাড়িটা চালাচ্ছে, পাশে বসে আছেন করালীকিঙ্কর।

রোগশয্যা থেকে রঞ্জন ডাকল, এদিকে এস অতসী। বস এখানে।

অতসী চারিদিকে একবার দেখে নেয়। কাছে ঘনিয়ে এসে বলে, তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? সবার সামনে আমার নাম ধরে ডাকছ কেন?

—কে? আমি?·· হ্যাঁ, তাই তো! খুব ভুল হয়ে গেছে। ঈ—স!

অতসী প্রশ্ন করে, বৌদি কোথায়? তাঁকে দেখছি না তো?

—কে জানি। আছে কোথাও।

অতসী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পাশের ঘরে উঁকি মারে, বাইরের ঘরেও। দেখতে পায় না কাউকেই। আবার ফিরে এসে বসে খাটের একান্তে। কপালে হাত দিয়ে দেখে। না, জ্বরটা নেই।

রঞ্জন বলে, একটু দুর্বল হয়ে গেছি, এই যা। তার ভাবনার কিছু নেই—সোমবারে না হলেও মঙ্গলবার অপেন করব। 'কল্যাণ' আমি করছি—মনোজদা-কে বলে রাস্ত হবার কিছু নেই। অফিসের আর কি খবর বল?

প্রায় আধঘণ্টা গল্পগুজব করার পর অতসীর খেয়াল হল, সে রুগীর ঘরে একা বসে আছে। এমন তো হবার কথা নয়। রজতবাবু হয়তো ওদের এগিয়ে দিতে গেছিলেন তখন, এতক্ষণে তাঁর ফিরে আসার কথা। ছেলে-মেয়ে দুটোই বা কোথায় গেল? আর সবচেয়ে বড় কথা—বৌদি কোথায়?

আবার উঠে দাঁড়ায় অতসী। বলে, তুমি একটু চুপটি করে শুয়ে থাক। আমি দেখি বৌদি কোথায় গেলেন।

অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল। রান্নাঘরে। একটা মোড়া টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। অতসীকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন, ওর হাত দুটি ধরে কি যেন বলতে গেলেন। পারলেন না। উদ্গত অশ্রু ঢাকতে মুখ আঁচল চাপা দিলেন।

অতসী তো অপ্রস্তুতের একশেষ। কিন্তু থামল না সে। জোর করে চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে দিয়ে বললে, কী হয়েছে বৌদি? আপনি এমন করে ভেঙে পড়েছেন কেন!

বৌদি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেন। একটা পিঁড়ি পেতে দেন অতসীর জন্য। বলেন, বলছি ভাই. কিন্তু তার আগে বলত—ঐ ডাক্তার বসু তোমার ভগ্নিপতি?

—হ্যাঁ, কেন?

—কী রকম ভগ্নিপতি? মানে, ওঁর স্ত্রী তোমার কী রকম বোন হয়?

—আমার আপন বোন।

বৌদির মুখ চোখে বিস্ময়ের কোন চিহ্ন ছিল না। বরং তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন কিছুটা। ওর হাত দুটি টেনে নিয়ে বললেন, তাহলে আমাদের একটা উপকার করতে হবে ভাই।

—নিশ্চয়ই করব। কী ব্যাপার বলুন তো?

বৌদির কাছ থেকে জানা গেল, ডক্টর বসু আজ রঞ্জুর রক্ত নিয়ে গেলেন। বলেছেন, সোমবার সকাল দশটার সময় তাঁর ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে গেলে রক্ত পরীক্ষার ফলাফলটা জানা যাবে। বৌদি ওকে অনুরোধ করছেন—ও কি রবিবারের মধ্যে খবরটা এনে দিতে পারে না? রবিবারের সন্ধ্যার দিকে?

—রবিবার সন্ধ্যা আর সোমবার সকালের মধ্যে এমন কি তফাত?

বৌদি কাতর কণ্ঠে বললেন, রঞ্জুর দাদা আজ দু-দিন কিছু খাননি। বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। রঞ্জনের কাছ থেকে অবশ্য খবরটা গোপন রাখা হয়েছে, কিন্তু এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়?

—কী এমন খবর? কী অসুখ হয়েছে রঞ্জনের?

—হয়েছে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। তবে আগে যে ডাক্তারবাবু দেখেছেন তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, রক্তটা পরীক্ষা করাতে। সেই জন্যেই ঠাকুরমশাই আজ কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে এসেছেন ডক্টর বোসকে।

—কিন্তু অসুখটা কী? মানে, যেটা আশঙ্কা করা হচ্ছে?

—শক্ত নাম। আমার ঠিক মনে নেই—নামটা বোধহয়: লিউকোনিয়া।

—নিমুনিয়া? হতেই পারে না। সর্দি-কাশি তো ওর নেই।

—না না, নিমুনিয়া নয়, রক্তের ক্যানসার— কী যেন নাম···

বিদ্যুৎচমকের মত একটা নাম স্মরণে এসেছে অতসীর। কিন্তু জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করতে সাহস হচ্ছিল না। ওদিকে বৌদি আপ্রাণ চেষ্টা করছে খটমট ইংরাজী নামটা মনে করতে। অতসী নিরুপায়ভাবে বলে, নামটা কি লিউকেমিয়া?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিউকোমিয়া।

অতসী একটা আস্তব চীৎকারে ফেটে পড়তে চাইল। দু-হাতে মুখ ঢেকে কোনক্রমে আত্মসংবরণ করল সে। এবার বৌদিই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন— না না, ঐ শক্ত ব্যামো যে ওর হয়েছে এটা তো প্রমাণ হয়নি। তুমি ভেঙে পড়ছ কেন অতসী?

অতসী কি বলবে? কেমন করে বলবে? বললেও ওরা যে বুঝতে পারবে না! রঞ্জনের নিশ্চয়ই হয়েছে ঐ চিকিৎসার-অতীত অসুখটা। সংক্রামক ব্যাধি।

হ্যাঁ, সংক্রামক। চিকিৎসা বিজ্ঞান কী জানে? কতটুকু জানতে পারে ঐ কুনাল বসু তার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে? অতসী জানে। মর্মে মর্মে জানে, কেমন করে এই সংক্রামক অসুখটা প্রবেশ করছে ঐ অ্যানিমিক মানুষটার রক্তকণিকায়। করবে না? ও কেন বিষকন্যাকে বুকে টেনে নেবার দুঃসাহস দেখালো? একবার নয়, দুবার নয়—বার বার! অতসী কী করতে পারে?

বাবা-মা তাকে সহ্য করতে পারেনি, প্রদীপদা মরে বেঁচেছে। বড়মামী সব জেনে শুনে ভালবেসেছিল অতসীকে। কুনাল আর বন্দনা পালিয়ে বেঁচেছে— অতসীর ত্রিসীমানার মধ্যে আসে না বলেই আজও বেঁচে আছে।

ঐ বোকা ছেলেটা কেন এ ভুল করল? কেন ভালবাসল নাগিনী কন্যাকে? কেন বারে বারে তাকে জাপটে ধরল দু-হাত দিয়ে?

যেমন কর্ম তেমনি ফল!

এবার মর!

॥ ৬ ॥

সদর দরজাটা হাট করে খোলা।

সুইচ জেলে ঘরে ঢুকল অতসী। বলাই গাঙ্গুলী এড়োএড়ি হয়ে পড়ে আছে প্যাসেজটা জুড়ে। শরীর মন ক্লান্ত। তবু রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখল একবার। মীটসেল্‌ফটাও হাট করে খোলা। দুধের বাটিটা উল্টে পড়ে আছে। বড়মামা খেয়েছে, না বেড়ালে খেয়েছে, বোঝা গেল না। রুটি তরকারী ছিটিয়ে আছে ঘরময়। ভাগ্য ভালো, আজ বড়মামা বমি করে রাখেনি। না হলে এই অবেলায় সব সাফ করতে হত।

ওর ঘরটা তালা দেওয়া ছিল। বড়মামার ভরসায় এ ঘরটা সে খুলে রেখে যায় না। তালা খুলে ঘরে ঢুকল অতসী। জামা কাপড় ছাড়ল। বাক্সের আট-পৌরে শাড়িখানা হাতে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। হোক অবেলা, গা ধুলো। তারপর ফিরে এল ঘরে। বিছানাটা পরিষ্কার করল, মশারী খাটালো নিজের বড় মামার। ভেবেছিল বাইরেই কিছু খেয়ে নেবে। ফেরার পথে সে ইচ্ছে আর অবশিষ্ট ছিল না। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল ঢক্ ঢক্ করে। তুলতে গেল বলাই গাঙ্গুলীকে।

—বড়মামা। ওঠ, ঘরে গিয়ে শোবে চল।

খানিক ঠেলাঠেলির পর মাতালটা উঠে বসল। ঘোলাটে চোখ অতসীকে। চিনতে পারল। পকেট থেকে একমুঠো টাকা বার নে ধর। তোর টাকা।

অতসী ওর মুঠি থেকে টাকার গুছিটা নিল। একখানা দশ টাকার বাকি খুচরো। মাত্র তিন টাকা খরচ হয়েছে। সাতের টাকা রয়েছে অবশিষ্ট।

বলাই বললে, দেখলি? বলাই গাঙ্গুলী আর রেস্কুড়ে নয়! মাঠের দিকে সে যায়ই না। মাত্তর তিন টাকা খচ্চা করেছি। কালী মার্কা। মা কালীর দিব্যি।

—হ্যাঁ বুঝেছি! ওঠ, চল, ঘরে গিয়ে শোবে চল।

সুবোধ বালকের মত উঠে দাঁড়ায় এবার। ভাগ্নীর ঘাড়ে একটা হাত রেখে টলতে টলতে এগিয়ে যায়। ঘরে ঢুকেই আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, হাঁরে বা-খুকি! তোকে সকালে গালমন্দ করেছিলাম? না রে?

—কই না তো! যাও শুয়ে পড়।

—এ্যা-এ্যাই! তাই বল! কোন্ শালা বলে বলাই গাঙ্গুলী তার ভাগ্নিকে হেনস্তা করে। বড়খুকি তার কত আদরের ব'লে! বড়খুকিই তো আছে তার। বল? আর কে আছে বলাই গাঙ্গুলীর? তুই বল?

—তা তো বটেই। নাও শুয়ে পড়। আমি মশারীটা গুঁজে দিই।

– হ্যাঁ দে! শ'লার মশাগুলো বড় কামড়ায়। ট্যাকাগুটা তুলেছিস? ঐ যে কুড়ি ট্যাকা তুই দিয়ে গিস্‌লি! মাত্তর দু বোতল কালিমার্কা…

—জানি। এই তো বাকি টাকা তুমি দিয়ে দিলে।

—তবে? বাকি ট্যাকা কেন দেব না, বল? ট্যাকা কি রেস খেলে ওড়াবার জন্ত? রক্ত জল করা ট্যাকা। বলাই গাঙ্গুলী লেম্‌নটি নয়! বুঝলি?

বালসে মাথা দিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে।

অতসী ভালো করে মশারীটা গুঁজে দিয়ে নিজের ঘরে আসে। জানলার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ায়। দখিনা বাতাস বইছে। ফ্যান নেই ঘরে। অনেক-বার ভেবেছে এবার একটা ফ্যান কিনবে—কিন্তু কিনতে হলে দুখানা কিনতে হয়। মামার ঘরেও লাগাতে হয়। পরের বছর দু'খানাই কিনবে। ইন্সটলমেণ্টে। করে একটু ফ্যানের হাওয়া পেলে বড়মামা তৃপ্তি পেত।

করবে কুনীটা তুলে নিয়ে চুলের জট ছাড়াতে গিয়েই হাতে কাঁটা ফুটল। একবার নয়, মনে পড়ল ওর খোঁপায় বসানো আছে একটা রক্ত গোলাপ।

বাব-মা ণ ছেলেটার কাণ্ড।

জেনে শুনে ভ বাধা দেয়নি। বাধা দিতে চায়ওনি। অন্তসময় হলে হয়তো ওর অতসীর ত্রিসংসারে রজতবাবু অথবা হয়তো বৌদি বিরক্ত হতেন—কিন্তু বিধাতার ঐ বোধ কৌতুকে ওঁরাও আজ অন্ত চোখে দেখছেন ঐ অ্যানিমিক কেন বাচকে।

সত্যই কি ওর ব্লাড-ক্যান্সার হয়েছে? লিউকেমিয়া? যার চিকিৎসা নেই? অনিবার্য মৃত্যুর জন্ত পরীক্ষা করা? কতদিন বাঁচবে ছেলেটা?" ডাক্তার বলতে পারে? এক বছর? ছয় মাস? তিন মাস?

কী আশ্চর্য! এসব কথা এখনই ভাবছে কেন? একজন ডাক্তার আশঙ্কা করেছেন—এছাড়া আর তো কোন প্রমাণ নেই। হয়তো এসব কিছুই নয়। কালই জানতে পারা যাবে। না, কাল নয়, সোমবার। পরশু সকাল দশটায়। রজতবাবুও অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওকে অনুরোধ করেছেন, রবিবার সন্ধ্যাবেলায় একবার তার ভগ্নিপতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যদি রিপোর্টটা তৈরি হয়ে

থাকে তাহলে যেন অতসী ওঁদের পাড়ার যতীনবাবুকে একটা ফোন করে দেয় —যত রাতই হোক। যতীনবাবু দুখানা বাড়ির পরে থাকেন। বিশেষ প্রয়োজনে রজতবাবুদের ডেকে দেন। সেদিক থেকে যতীনবাবু লোক ভালো। অবশ্য পাড়ার সব বাড়ির বাসিন্দাই এ সুযোগ পায় না রজতবাবুর প্রতি ভদ্রলোকের একটু নেকনজর আছে—প্রয়োজনে রেলওয়ে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থাটা তাঁর মাধ্যমে করা যায়।

গোলাপটা নাকের কাছে নিয়ে একবার শুঁকল, তারপর রেখে দিল ড্রেসিং টেবিলে। হাসল অতসী। কাল সকালে উঠে নিশ্চিত দেখবে গোলাপটা শুকিয়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে। যাবে না? অতসী রায়ের নিশ্বাসের ছোঁয়া পেয়েছে যে!

অতসী মশারী-ফেলা পালঙ্কটার দিকে ফিরল এবার। আবার হাসি পেল তার। ওটাও একটা প্রতীক। ডবল-বেড বিছানার আধখানা হাঁ হাঁ করা মাঠ।

এ বাড়িতে তিনখানা ঘর। একখানা ছিল দিদিমার। ছেলেবেলায় ওরা দুবোন দিদিমার সঙ্গে শুতো। মাঝখানে দিদা, দুপাশে দুবোন—মেঝেতেই শুতো ওরা। তারপর দিদিমার চৌকি এল। তখন ওরা দু বোন গলা জড়াজড়ি করে মেঝেতে ঘুমাতো, দিদা খাটের উপর। দক্ষিণ দিকের বড় ঘরখানা বড়মামার—যে ঘরটার দখল পেয়েছিল ওরা দু বোন বড় মামী গত হওয়ার পর। বড় মামা এখন থাকে পূর্বদিকের ছোটঘরে—যে ঘরটা আগেকার আমলে ছিল ছোট মাধার পড়ার ঘর। এঘরের সব কিছুতেই বড় মামীর স্মৃতি জড়ানো। তার বিয়ের ডবল্-বেড খাট, ড্রেসিং টেবিল। অপয়া খাটটা—বড় মামীও ভোগ করতে পারেনি, অতসীও নয়। আর কিছু না হোক, বন্দনাকে তো শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পেয়েছিল—পালঙ্কটার তাও সইল না। অতসীর শয্যাসঙ্গিনী গৃহত্যাগ করে চলে গেল।

মশারী তুলে অতসী শুয়ে পড়ে।

আর একটা দিন কাটল। একটা উল্লেখযোগ্য দিন। ভালোয়-মন্দয়, কাঁদায় হাসায়। না, দিনটায় আনন্দের চেয়ে বেদনার ভারই বেশি।

মশারীর ভিতর হাওয়া আসছে না। হাতপাখা চালাতে হচ্ছে। দূরে কার বাড়িতে রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। কথাগুলো বোঝা যায় না—সুরটা চেনা-চেনা। ঠিক যেন অতীতের দিনগুলোর স্মৃতি—সব কথা মনে পড়ে না, সুরটা লেগে থাকে শ্রুতিতে।

আচ্ছা, কুনাল কি আশা করেছিল অতসী বন্দনার কথা জানতে চাইবে? মায়ের পেটের বোন প্রায় বছর-খানেক দেখাশোনা নেই, যোগাযোগ নেই—কুশল প্রশ্ন করাটা কি স্বাভাবিক ছিল না? কিন্তু ছোটখুকিও তো কোন খবর নেয় না, দেয় না। কেন? অতসীর বিষ-নিশ্বাসের কথাটা তো সে কোনদিনই বিশ্বাস করেনি, কুনালও নয়। তাহলে? ওরা কি আশঙ্কা করে অতসীর অভাবের সংসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে? তা হতে পারে না। অতসী যা রোজগার করে তাতে দুজনের দিব্যি চলে যায়। ওসব কিছু নয়। কারণটা অন্যত্র। ওরা জানে, ওদের জীবনের মাঝখানে অতসী এসে দাঁড়ালে ওদের দাম্পত্য জীবনটা জটিলতর হয়ে উঠবে। হয়তো বন্দনা কুনালের মনটা ভরিয়ে তুলতে পারেনি। কুনাল শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান—দেশী-বিদেশী সাহিত্য সে পড়ে, বিশ্ববিজ্ঞান-বিশ্বশান্তি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসে। অমন একজন মানুষকে কতটুকু তৃপ্তি দিতে পারে বন্দনার মত মেয়ে—যার জ্ঞানের দিগন্ত উল্টোরথ-প্রসাদ-আনন্দলোকের পাঠসীমা অতিক্রম করে না? হয়ত সেইজন্যেই কুনাল ভয় পায় অতসীকে, পাছে তার আসুর-ক্ষুধা তাকে অভিভূত করে ফেলে।

না, কুনালের জীবন-দর্শনের সঙ্গে অতসীর চিন্তা-ভাবনার ওতপ্রোতভাবে মিল ছিল না। মতবিরোধ লেগেই থাকত—নানান বিষয়ে। সিনেমা-সাহিত্য-রাজনীতি বিষয়ে তো বটেই—এমন কি ঘরোয়া ব্যাপারেও।

প্রথম কথা ঐ ঠিকুজী-কোষ্ঠী হস্তরেখা বচার ইত্যাদিতে কুনাল আদৌ বিশ্বাস করত না। বোধকরি ঈশ্বরেও নয়। এ নিয়ে সে বারে বারে তর্ক করেছে অতসীর সঙ্গে। কুনাল ডাক্তার, বিজ্ঞান-শিক্ষিত—অতসীকে যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞানের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল ওসব আগুন্ত বুজরুকি। বিশ্বাসপ্রবণ একজাতের মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার জন্য ওরা যুগে যুগে দুনিয়ায় পয়দা হয়। বিষকন্যা কী? কোন মানে হয়? না, সে যাকে ভালবাসবে, যার কণ্ঠে বরমাল্য দেবে, যার বাহুবন্ধনে ধরা দেবে,—ছয় মাসের মধ্যে তার মৃত্যু অবধারিত। কেন? না, ঠাকুরমশাই বলেছেন। কে ঐ ঠাকুরমশাই! বাঃ! তুমি নাম শোননি? ঐ যে গুরুগিরি করে যিনি গ্রাসাচ্ছাদন করেন; শুধু গুরুগিরিতে গ্রাসটা যথেষ্ট মনঃপুত হয় না বলে সুদে টাকা খাটান? অজ্ঞাত উপায়ে যাঁর কাছে থাকা সাত হাজার টাকার তমসুক কি-করে-জানি বিশ হাজার টাকায় পরিণত হয়! সেই দেবতুল্য অভ্রান্ত পণ্ডিতটি বলেছেন! হরিবল্!

অতসী তর্ক করত কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজিও তো একটা সায়েন্স?

নিশ্চয় নয়। অ্যাস্ট্রনমি একটা বিজ্ঞান, অ্যাস্ট্রলজি নয়। গণিত-জ্যোতিষ মানি, ফলিত-জ্যোতিষ মানি না।

অতসী কৌতুক করে বলত, কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে যে, জন্মমুহূর্তের গ্রহ-সংস্থাপনে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না? 'চেরো' না 'কিয়ারো' কী যেন ভদ্রলোকের নাম, তিনি অসংখ্য উদাহরণ···

—জানি, জানি। মজা হচ্ছে উদাহরণগুলি লেখা হয়েছে ঘটনা ঘটে যাবার পর। তাছাড়া তোমরা বিশ্বাসপ্রবণ বলে যেগুলো মিলে গেছে সেগুলোকেই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধর। যেগুলো মেলেনি তার কথা চেপে যাও। আরে বাবা, একটা কয়েন নিয়ে টস্ কর না—আমিও স্ট্যাটিস্টিক্যালি নির্ভুল উত্তর দিতে পারব শতকরা প্রায় পঞ্চাশটা ক্ষেত্রে।

—কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যিই ওরা মিরাকুলাস্ প্রেডিক্‌শান করে। আমার দাদামশাইয়ের কোষ্ঠীবিচার করে—

কুনাল তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়, সে হোয়াট? শুনেছি, নবাব অফ পাতৌদি একটা টেস্ট-সিরিজে পর পর পাঁচবার টসে জিতে যায়। তার মানে কি পাতৌদি জ্যোতিষার্ণব?

অতসী প্রতিবাদ করত, না, জ্যোতিষকে বুজরুকি বলতে পার না তুমি। অ্যাট বেস্ট বলতে পার যে, 'এটা বিজ্ঞানসম্মত কিনা আমি জানি না। আমি পরীক্ষা করে দেখিনি।'

—তা কেন? বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি যে, এটা স্বীকৃত শাস্ত্র হতে পারে না। তুমি লজিক্যালি আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও: এক নম্বর প্রশ্ন—জ্যোতিষশাস্ত্রমতে জন্মমুহূর্তে নবগ্রহের সংস্থান অনুসারে জাতকের জীবন পূর্ব-নির্ধারিত, এটা মানো?

—হ্যাঁ, মানি।

—দ্বিতীয় প্রশ্ন—মানুষ সেই পূর্বনির্ধারিত ছকে আবদ্ধ, স্বইচ্ছায় বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারে না?

—তা কেন? শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে, যাগ-যজ্ঞ করে গ্রহের প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, রত্নধারণ করেও তা করা যায়।

—আচ্ছা বেশ বাবা বেশ—ধর আমি। আমি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-হাঁচি-টিকটিকি-মাদুলী-আংটি কিছু বিশ্বাস করি না—শুধুমাত্র বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। এ ক্ষেত্রে আমি কি একটা জাতকের কোষ্ঠীর ফলাফল পালটে দিতে পারব? —কোন মন্ত্রতন্ত্রের ধার না ধেরে? স্রেফ বিজ্ঞানের সাহায্যে?

অতসী মাথা নেড়ে বলেছিল, না, পারবে না। অবিশ্বাসীরা পারে না।

কুনাল বলে, নেক্সট! লেটস্ কাম টু ডেফিনিশন! বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায়, তর্কশাস্ত্রে, সবার আগে সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হয়। এবার বল, 'জন্মমুহূর্ত' বলতে কোন মুহূর্ত?

—যখন বাচ্চাটা প্রথম জন্মালো!

—দাঁড়াও, দাঁড়াও—অত সহজ নয়, তুমি গাইনকলজি-পড়া লোকের সঙ্গে কথা বলছ! জন্মমুহূর্ত কোনটা? যখন ব্যথা উঠ্‌ল, না ভ্রূণটা বার হতে শুরু হল, না সবটা বেরিয়ে এল, অথবা নাড়ি কাটা হল? এর মধ্যে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান হতে পারে—শনি-মঙ্গল এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সংক্রামিত হয়ে যেতে পারে।

কোণঠাসা হয়ে অতসী বলে, তোমার রেজিস্টারে কোন সময়টা লেখ?

—সেটা প্রশ্ন নয়। আমাদের হিসাবে দু-পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না!

—কেন হবে না? এক রাজার দুই রানী—দুজনেই একই সময়ে সন্তান প্রসব করলেন। কে সিংহাসন পাবে তা তো নির্ভর করবে ঐ সময়টার উপরেই! সুতরাং 'হিষ্ট্রি অব্ জুরিস্‌প্রুডেন্সে' নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের জবাব আছে, তুমি জান না!

কুনাল বলেছিল, তুমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ অতসী। আমার বক্তব্য—ফলিত-জ্যোতিষকে বিজ্ঞান নস্যাৎ করতে পারে। পারে না?

—কেমন করে?

—ধর একটা মেয়ে প্রসব-যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। আমি দেখলাম তখন সকাল নটা। তোমার ঠাকুরমশাই বললেন—বেলা দশটা পর্যন্ত মহেন্দ্রক্ষণ, দশটার পর জন্মালে জাতক হবে বিষকন্যা। এ ক্ষেত্রে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি সিজারিয়ান সেক্‌শন করে জাতককে ফ্রম বিষকন্যা টু রাজরানী করে দিতে পারি কি না?

—না, পার না! জাতকের ভাগ্যে যদি পূর্ব জন্মের সংস্কারবশে বিষকন্যা হয়ে জন্মানোই ভবিতব্য হয়, তাহলে তোমার অপারেশান আনসাক্‌সেশফুল হবে! বাচ্চাটা মারা যাবে!

—তাতেও তুমি তর্কে জিততে পারলে না। ভবিতব্য অনুসারে জাতকের হওয়ার কথা ছিল 'বিষকন্যা', সে হল 'স্টিল-বর্ন'—মৃত শিশু। নঞর্থকপথে সে ক্ষেত্রেও সার্জেন ফলিত-জ্যোতিষকে ব্যর্থ করল। করল না?

অতসী হালে পানি পায় না। এক্ষেত্রে তার যা ব্রহ্মাস্ত্র তাই সে প্রয়োগ করল —যত যাই বল! ভবিতব্যকে কেউ খণ্ডাতে পারে না!

কুনাল মাথা নেড়ে বলত, য়ু আর এ ফেটালিস্ট! তোমার কুসংস্কারের দুর্গ আমার বৈজ্ঞানিক গোলায় গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে না!

শুধু ঐ এক বিষয়েই নয়, জীবনদর্শনেও তাদের মত-পার্থক্যটা অনস্বীকার্য।

যেমন ঐ বড়মামা!

কুনালের বক্তব্য—হ্যাঁ, ঐ ভদ্রলোকের প্রতি অতসীর একটা কর্তব্য আছে। কিন্তু এ দুনিয়ার যাবতীয় জিনিসের মতই সেই কর্তব্যবোধটা সসীম। সেটা এতখানি বাড়তে দেওয়া উচিত নয় যাতে অন্যের জীবন বিষময় হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, লোকটার একখানা হাত নেই, সংসারে আর কেউ নেই—জীবন-সংগ্রামে সে পরাজিত সৈনিক, সে অনুকম্পার পাত্র—ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে আর পাঁচজনের সংসার ছারখার করে দেবার ছাড়পত্র সে পায়নি। অতসী-কুনালের সংসারে ঐ মানুষটার ঠাঁই হতে পারে না। লোকটা পাঁড় মাতাল, বেহুড়ে, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। এমন মানুষকে কেন সখ করে নিয়ে যাবে কুনাল তার নতুন-পাতা সংসারে? বেশ তো অতসী যদি চায়, সে মাস-মাস কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। লোকটা কাশীতে গিয়ে থাকুক না—সব বন্দোবস্ত কুনাল করে দেবে। আর কী চাই?

আর কি চায়, অতসী বলে'নি। তার যুক্তিগুলো সবই এলোমেলো। বলত, মাসে মাসে নগদ টাকা পাঠালে বড়মামা প্রথম দিনেই ফুঁকে দেবে।

কুনাল রাগ করে বলত, ফুঁকে দিলে বাকি মাস না খেয়ে থাকতে হবে; পরের মাসে সে নিজেই সংযত হবে।

—হবে না। তুমি বড়মামাকে চেন না!

এর কী জবাব! তবু জবাব দিয়েছিল কুনাল। বলেছিল, বেশ তো! সে-ক্ষেত্রে আমি যদি এমন ব্যবস্থা করে দিই যাতে রোজ সকাল বিকাল তাঁকে কেউ রান্নাকরা ভাত টিফিন-কেরিয়ারে করে পৌঁছে দেয়?

—কে এমন লোক বসে আছে তোমার কাশীতে?

—সেটা আমার চিন্তা অতসী। টাকা খরচ করলে সব রকম ব্যবস্থাই লভব!

অতসী মাথা নেড়ে বলত, তাতে বড়মামা রাজীই হবে না!

বড়মামা-বড়মামা-বড়মামা! এ জটিল নাগপাশ থেকে বের হওয়ার উপায় নেই। বলে বু'ঝয়ে কিছুতেই অতসীকে স্বমতে আনতে পারেনি। দীর্ঘ তিন-

তিনটি বছর অপেক্ষা করেছে সে। ইতিমধ্যে পাস করে বেরিয়েছে, বোনের বিয়ে দিয়ে নিঝঞ্ঝাট হয়েছে। বাবা গত হয়েছেন, যদিও বিরাট ঋণের বোঝা তার মাথায়। তবু ভাল চাকরিও পেয়েছে একটা—ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরির সিনিয়ার প্যাথোলজিস্ট, প্রাইভেট প্র্যাকটিসও ধীরে ধীরে জমছে। এবার সংসারী হওয়া দরকার। আর কতদিন অপেক্ষা করবে?

অতসীর দু-নম্বর যুক্তি ছিল: ছোটখুকি।

এখানেও কুনাল তার সাথে একমত হতে পারেনি। বলত, দেখ অতসী, তুমি নিজের ইচ্ছামত দুনিয়াকে চালাতে পারবে না—কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে তাল দিয়ে চলতে হবে। বন্দনা তোমার মতো নয়। তুমি আইডিয়ালিস্টিক, বন্দনা প্রাগ্‌ম্যাটিক। সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়, সে কচি খুকি নয়। তাকে তুমি নিজের ইচ্ছেমত গড়তে পারবে না। সে—সে। কিন্তু যত যাই হোক সে তোমার ছোটবোন। প্রচলিত আইন অনুসারে স্বাভাবিকভাবে তোমারই আগে সংসার পাতার কথা। আমি তো বন্দনার দায়িত্ব অস্বীকার করছি না। সুপাত্রে তাকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টা আমরা নিজেরাই করব—বোধহয় তার দরকারই হবে না; সে নিজেই তার উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বেছে নেবে। কিন্তু সে জন্য তুমি অবিবাহিত থাকবে কেন?

অতসী বলত, তুমি বুঝতে পারছ না। ও একেবারে অন্যরকম। ওর একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

কুনাল হেসে ফেলত। বলত, দেখ অতসী, তোমার চরিত্রের আসল গলদ কোথায় জান? তুমি মূলত দুঃখবাদী। দুঃখ পেলেই তুমি আনন্দ পাও। প্রয়োজন থাক না থাক, একটা মহান ত্যাগ তোমাকে করতেই হবে, অপরের জন্য তোমাকে মাথা পেতে বঞ্চনা সহ্য করতে হবে। তুমি আত্মপীড়নেই আনন্দ পাও।

অতসী প্রতিবাদ করত। এ কোন কাজের কথা? কেউ কি ইচ্ছে করে দুঃখ পেতে চায়? অথচ কুনালের যুক্তি ছিল সেই রকম। বলত, তুমি খুশি হয়েছ শুনে যে, কোষ্ঠীর বিচার অনুযায়ী তুমি নাকি বিষকন্যা। অর্থাৎ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে তোমার অধিকার নেই!

আচ্ছা, কোন মানে হয় এসব অবান্তর কথার? একটা সহজ স্বাভাবিক মেয়ে চাইবে না—স্বামী-সংসার-সন্তান? সে খুশি হবে সেই স্বাভাবিক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলে? কুনাল বলে, অতসী নাকি নিজেও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না ঐ ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথাটা—অথচ যেন বিশ্বাস করে, এমন ভাব দেখায়। তাহলেই যে সে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারবে।- যতসব পাগলের কথা।

হ্যাঁ, স্বীকার করে অতসী—কুনালের সঙ্গে জীবনদর্শন বিষয়ে তার কতকগুলো মৌল পার্থক্য ছিল। ওসব দুঃখবাদ-টাদ কিছু নয়, কিন্তু পরের জন্য কষ্ট- স্বীকার করতে সে পিছপাও নয়। সত্য- ধর্ম, আদর্শ—এসব বিষয়ে কুনালের সঙ্গে মাঝে মাঝে ওর ধুম তর্ক বেধে যেত। বন্দনা উপস্থিত থাকলে পালিয়ে বাঁচত—এসব তাত্ত্বিক আলোচনার ধারে কাছে সে থাকে না। কুনাল বলত, 'ভালো' আর 'খারাপ' শব্দ দুটো আপেক্ষিক। সমাজে ঐ শব্দ দুটির সংজ্ঞা যারা নিরূপণ করেছেন তাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাই এদেশে তেতাল্লিশ-সালের মন্বন্তরে যখন লাখে লাখে মানুষ মারা গেল—জোতদারের ধানের গোলা লুট করল না, তখন ওঁরা বললেন—দেখেছ! ভারতবর্ষের মানুষ কত ধার্মিক! প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় তোমার যতই ক্ষতি হোক—সেটা যদি তুমি মেনে চল, তাহলেই তুমি ধার্মিক। 'পিতামাতাকে ভক্তি করিবে'—হোন পিতা মদ্যপ এবং মাতা স্বার্থপর, 'মাষ্টারমশাইদের শ্রদ্ধা করিবে', যদিও তিনি টাকা খেয়ে তোমার সহপাঠীকে কোচ্চেন বলে দেন, রাজনৈতিক দাদাদের—

বাধা দিয়ে অতসী বলত, তুমি ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছ কুনাল। গায়ে-ব্যথা হবে!

—ছায়া? তোমার বড়মামা কি কায়াময় নন?

—বড়মামার কথা ছেড়ে দাও। উনি একটা ব্যতিক্রম।

—বেশ ছাড়লাম। ধর, তোমাদের ঐ ঠাকুর-মশায়ের কথা সেদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, বাবা সাত হাজার টাকা কর্জ করেছিলেন, অথচ আমাকে শোধ করতে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা—মনে আছে? তুমি শুনে বলেছিলে—কী করবে বল? মেনে নাও।

—অন্যায় বলেছিলাম? উপায় কি? তুমি বলছ—দলিলটা তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ। তোমার বাবার হস্তাক্ষর সন্দেহাতীত, কোথাও কোন কাটাকুটি নেই। প্রতিটি পাতাতেই সকলের সই আছে। বিশ-হাজার টাকার অঙ্কটা সংখ্যায় এবং শব্দে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে—এক্ষেত্রে কী করতে পার তুমি? মেনে নেওয়া ছাড়া?

—মেনে তো নিয়েছি, নিতে বাধ্য হয়েছি—কিন্তু ধর যদি সুযোগ বুঝে আমি ঐ জোচ্চোরটাকে খুন করে দলিলখানা ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলি, তুমি আমাকে সমর্থন করতে পারবে?

—এসব হাইপথেটিক্যাল কথার কী জবাব দেব, কুনাল?

—আমরা অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান করছি অতসী। হাইপথেটিক্যাল কেস-

এ হাইপথেটিক্যাল প্রশ্নই তো উঠবে। বল, আদর্শগতভাবে তুমি আমাকে সে-ক্ষেত্রে সমর্থন করতে পারবে?

—না। পারব না। প্রথম কথা—দলিলে যে কারচুপি আছে এটা তুমি প্রমাণ করতে পারনি।

—তা পারলে তো মামলাই লড়তাম। কিন্তু বাবার ডায়েরীতে লেখা আছে সাত হাজার টাকা, আমার বোনের বিয়ের হিসাবের খাতায় জমার অঙ্কে লেখা আছে 'করালীর কাছে কর্জ সাত হাজার টাকা'। বাবা মৃত্যুশয্যায় আমাকে বলে গেলেন সাত হাজার টাকা—এগুলো তো মিথ্যা নয়?

—তা হলেও তুমি ঠাকুরমশাইকে খুন করতে পার না। আইন নিজের হাতে নিতে পার না। নীতিগতভাবে পার না। এভাবে সবাই যদি আইন নিজের হাতে নেয়, তাহলে সমাজ চলতে পারে না। টাকার জন্য তুমি মানুষ খুন করতে পার না।

—অলরাইট, অলরাইট। এবার আর একটা 'হাইপথেটিক্যাল কেস'-এর জবাব দাও। ধর আমি ঠাকুর-মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখলাম, তাঁর খোলা ড্রয়ারে অনেক টাকা আছে। আমি নিঃশব্দে তা থেকে বিশ হাজার মাইনাস সাত, তের হাজার টাকা তুলে নিয়ে এলাম। ওয়েল —তুমি আমার কাজটাকে সাপোর্ট করবে?

অতসী বলেছিল, না, করব না। সেটা তো চুরি!

—চুরি নয়। জোচ্চুরির অ্যান্টিডোট।

—না, কুনাল। এভাবে তুমি আইনকে ফাঁকি দিতে পার না।

কুনাল হতাশ হয়ে বলেছিল: যু আর ইন্‌করিজিব্‌ল! তোমাকে শোধরানো অসম্ভব! অতসী হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, সে কথা সত্যি কুনাল। তোমার সঙ্গে আমার কোনদিনই মতের মিল হবে না। আমরা ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা।

'কুনাল হতাশ হয়নি। বলেছিল, বিজ্ঞান কিন্তু বলে—আনলাইক পোল্‌স অ্যাট্রাক্ট'।

—জীবন তো শুধু বিজ্ঞানের নির্দেশেই চলে না মিস্টার হোরেশিও। এখানে মতের মিলটাই বড় কথা। তুমি বরং ছোটখুকিকে বিয়ে কর! ওর সঙ্গে তোমার বেশ মতের মিল হবে—

স্পষ্ট মনে আছে অতসীর। ভীষণভাবে চমকে উঠেছিল কুনাল। কোন জবাব দেয়নি। নীরবে উঠে চলে গিয়েছিল।

কেন? তার আগে থেকেই কি কুনাল ঝুঁকেছিল বন্দনার দিকে? অতসীর

চোখের আড়ালে? বন্দনা তখন যৌবনের মধ্যগগনে। বাইশবছর বয়স তার। অতসী কালো, বন্দনা ফর্সা, অতসী রোগা—একহারা, বন্দনার সর্বাবয়বে যৌবন উপচে পড়ছে। তার চেয়েও বড় কথা, অতসী রক্ষণশীলা—কুনালকে এ পর্যন্ত শুধু হাত দুটিই ধরতে দিয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। ওর ধারণা ছিল, এসব বিষয়ে কুনালও বেশ পিউরিটান, প্রাক-বিবাহ যুগে দৈহিক সংস্পর্শে তার আস্থা নেই, যেমন নেই অতসীর। হয়তো কথাটা ঠিক নয়, হয়তো ওর দৃষ্টির আড়ালে ওরা দুজন তার আগেই—

…নাঃ! ঘুম কি আজ আসবে না? অতসী উঠল। সুইচ জেলে ঘড়িটা দেখল। রাত বারোটা। কলকাতা শহরও নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। পাশের বাড়ির রেডিওটা অনেকক্ষণ থেমেছে। মনে হচ্ছে ঘণ্টাখানেক আগে একটা 'কুলপি—মালাই—ওয়ালা' এই মধ্যরাত্রে হেঁকে গেছে। তারপর একটা রিকশার শব্দ শুনেছে। এছাড়া চরাচর নিস্তব্ধ। পাশের ঘর থেকে বড়মামার নাসিকা-গর্জন শুধু শোনা যায়।

অতসী মশারী তুলে বাইরে এল। বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এল। ড্রেসিং টেবিলটার কাছে এগিয়ে এসে গোলাপফুলটাকে তুলে দেখল। তার পচন ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। আবার এসে শুয়ে পড়ল।

…না! ছোটখুকিকে সে দোষ দেয় না। সে দিদির মন জানবার চেষ্টা করেছিল—দোষ অতসীরই।

ততদিন অতসী চাকরিতে ঢুকেছে। সাত সকালে দুটি নাকেমুখে গুঁজে সে অফিসপানে ছোটে, ফিরতে যার নাম সন্ধ্যে। বড়মামা অধিকাংশ দিনই সন্ধ্যা-বেলা মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল ছোটখুকিকে নিয়ে। সারাদিনমান সে যে কী করে, কী ভাবে, কোথায় কোথায় ঘোরে কিছুই বোঝা যায় না। স্কুল ফাইনাল দিয়েছিল, পাস করতে পারেনি। দ্বিতীয়বার কিছুতেই পরীক্ষা দিল না। সেলাই-ফোঁড়াই করবে না। ঘরের কাজ যেটুকু না করলে নয়, শুধু সেইটুকু। এদিকে রূপচর্চায় যথেষ্ট উৎসাহী। ওরই ফরমাস মত নানান জাতের প্রসাধন দ্রব্য কিনে আনতে হত অতসীকে। মাঝে মাঝে বন্দনাই বরং ধরে বসত তাকে—কী কাণ্ডের বাসা করে রেখেছিস চুলটা? আয়, আঁচড়ে দিই।

অতসী ওকে কত করে বোঝাবার চেষ্টা করত। বলে বুঝিয়ে, কিছুতেই ওকে বাগে আনতে পারেনি। এতবড় মেয়েকে তো আর মারধোর করা যায় না।

অতসী অফিসে বেরিয়ে গেলেই ছুটি নাকেমুখে গুঁজে বন্দনাও বেরিয়ে যেত। ফিরে আসত সন্ধ্যা নাগাদ। প্রায় প্রতিদিনই দুপুরে অথবা ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখত। কার সঙ্গে? পয়সা পেত কোথায়? অতসী জানতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করেও জবাব পায়নি। বেশি কিছু বললেই উল্টে জবাব দিত, আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না রে, তুই শুধু নিজের আখেরটা ভাখ।

অতসী গম্ভীর হয়ে যেত। বলত, তুই আর কচি খুকিটি নস্। সব কিছু বোঝবার বয়স হয়েছে তোর। বুঝে দেখ, আমি বি. এ. পাস করেছি, স্টেনোগ্রাফি পাস করেছি। চাকরি করছি। কিন্তু তুই? তুই কী করবি?

বন্দনা কথা ঘোরাবার জন্য বলত, কুনালদা আর আজকাল আসে না কেন রে? অতসী ঔদাসীন্য দেখিয়ে বলত, তার আমি কি জানি? পসার জমছে বোধহয়। হঠাৎ দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এ্যাই, একটা কথা সত্যি করে বলবি? কুনালদার সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়েছে, না রে?

অতসী স্বীকার করেনি। ভুল করেছিল কি? স্বীকার করলে কি ঘটনা অন্য খাতে বইত? না, তা তো নয়। কুনাল ভুল বলত, অতসী অন্তর থেকে বিশ্বাস করত যে, সে বিষকন্যা, তার নিঃশ্বাসে তার স্বামীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। কোনদিনই সে কুনালকে গ্রহণ করতে পারত না। সুতরাং সে মিথ্যা কথা বলেনি কিছু। বন্দনাকে সেদিন সবকথা খুলে বললে ঘটনা হয়তো অন্য খাতে বইত—কিন্তু তাতে আরও খারাপ হত। সব শুনে বন্দনাও হয়তো পিছিয়ে আসত। আজও আইবুড়ো থুবড়ি হয়ে পড়ে থাকত। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই। অতসী জবাবে বলেছিল, দূর পাগল! তুই কি ভেবেছিস কুনাল আমাকে বিয়ে করত? আমার মত কালো—কুচ্ছিৎ মেয়েকে?

হঠাৎ সোজা হয়ে বসেছিল বন্দনা। বলেছিল, তুই কালো-কুচ্ছিৎ মোটেই ন'স্। সে কথা তো জানতে চাইছি না আমি। আমি জানতে চেয়েছিলুম—তোদের দুজনের কি ঝগড়া চলছে?

অতসী তার জবাবে বলেছিল, ঝগড়া-ঝাঁটি নয়রে ছোটখুকি, আমি ওকে মুক্তি দিয়েছি। আমাদের বিয়ে হতে পারে না। হবে না।

বন্দনা একটু অপেক্ষা করে বলেছিল, তাহলে ওর সঙ্গে তোর বন্ধুত্বের-সম্পর্কটা বজায় থাকল না কেন? কুনালদা বিয়ে করবে নিশ্চয়ই। তার বউয়ের সঙ্গেও তোর বন্ধুত্ব হতে পারে।

—পারেই তো। সে যদি সম্পর্কটা বজায় রাখতে চায়।

সেদিন ঐ পর্যন্তই কথাবার্তা হয়েছিল।

এখন, অতীতের কথা ভাবতে বসে অতসীর মনে হয়—অতসীর সঙ্গে কুনালের বিবাহ না হওয়াটা তার জীবনে ট্র্যাজেডি নয়, এমন কি বন্দনার সঙ্গে তার বিবাহটাও নয়; কুনাল সত্যই সৎপাত্র। এমন পাত্রের হাতে ছোটবোনটাকে তুলে দেওয়ার মধ্যে পরম তৃপ্তি থাকার কথা। ভাগ্যবিধাতা যখন জন্মমুহূর্তেই তার কপালে লিখে দিয়েছেন চরম বঞ্চনার ইতিহাস, তখন কুনালের হাতে বন্দনাকে তুলে দেওয়ার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারত?

ট্র্যাজেডি সেটাই। ছোটখুকি ওকে এই মহৎ দানের সুযোগ দিল না। দিদির হাত থেকে নিতে পারল না যা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এবং তার দিদির জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ! সে প্রমাণ করতে চাইল তার জীবনের সাফল্য: স্বোপার্জিত!

নিতান্ত ঘটনাচক্র বলতে হবে।

পর পর কদিন ধরেই সংসারে অশান্তি চলছিল। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে অতসী যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত ওদের দুজনের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে। বড়মামা আর বন্দনা। দুজনেই আক্রমণ করত অতসীকে। একই অভিযোগ। বন্দনা বলত, তুইই তো সর্বনাশের মূল! বড়মামার হাতে কাঁচা টাকা কেন দিস্? তাতেই তো ও মাতাল হয়। রেস খেলতে যায়।

বড়মামাও বলত ওই এক কথা: তুইই তো সর্বনাশের মূল; কেন ছোটখুকিকে শাসন করিস না? দিনরাত বেলাল্লাপনা করে বেড়ায়। এতবড় বংশের নাম ডোবাবে।

তিতিবিরক্ত হয়ে অতসী সেদিন অফিস যাবার আগে হুকুমজারি করে গেল, শোন ছোটখুকি, আমার সংসারে এসব অনাচার চলবে না। আমি সন্ধ্যার সময় ফিরে আসব। তার আগে তুই বাড়ি ছেড়ে বের হবে না, বুঝলি?

বন্দনা জবাব দেয়নি। বড়মামা ওপাশ থেকে ফোড়ন কাটে, ভারি বাধ্য বোন কিনা তোর! তোর হুকুমকে ও থোড়াই কেয়ার করে! তুইও বেরুবি, ও-ও বেরুবে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে অতসী বলেছিল, তুমি কেন কথা বলতে আসছ বড়মামা? আমি বলে গেলাম, ও শুনে গেল। যা ফয়শালা হয় আমরা করব। তুমি এসবে নাক গলিও না!

—না, না আমি কেন নাক গলাব? আমাকে দু-বেলা দুমুঠো খেতে দিচ্ছিস—

বাকিটা অতসী শোনেনি। সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে তার মাথার ঠিক ছিল না। যথারীতি বন্দনা অনুপস্থিত, আর বড়মামা পাঁড় মাতাল হয়ে পড়ে আছে। ঘরে, বিছানায় বমি করেছে। ছটা-সাতটা-আটটা শ্রীমতীর দেখা নেই। ওদিকে বারান্দার ওপ্রান্তে বসে মাতালটা ক্রমাগত খিস্তিখেউর করে চলেছে।

সে রাত্রে—বোধকরি জীবনে সেই প্রথম ও শেষ—অতসী সংযম হারিয়েছিল। হারাতো না। তা সত্ত্বেও সে আত্মবিস্মৃত হত না। হল; বন্দনার ঐ অশ্লীল কথাটায়!

বন্দনা যখন ফিরে এল তখন রাত দশটা। দিব্যি সাজগোজ করে কোথায় গিয়েছিল সে। দোর খুলে দিতে মাথা খাড়া করেই ঘরে ঢুকল মেয়েটা। সদর দরজার খিল দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল—বন্দনা ধীরে সুস্থে ওদের ঘরের দিকে যাচ্ছে—বলাই গাঙ্গুলীর অনর্গল গালাগালে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। অতসী চিৎকার করে বললে, দাঁড়া! কথার জবাব দে।

বন্দনা ঘুরে দাঁড়াল। বললে, কী কথা?

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—সিনেমায়। কেন?

—'সিনেমায়। কেন!'—তোর লজ্জা হয় না? কী বলে গিয়েছিলাম তোকে?

বন্দনা ততক্ষণে ড্রেসিং টেবিলের টুলটায় বসে চুল খুলছে। সেখান থেকেই বললে, কী নাটক শুরু করলি দিদি? আমি কি কচি খুকি—যে; আমাকে ঘরে তালাবন্ধ করে যাবি?

অতসী ছুটে এসে বললে, কার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলি? বল?

বন্দনা শান্ত স্বরে বলল, বলব। এখন নয়। তুই রেগে আছিস। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে।

—বন্ধু? তোর অনেক বন্ধু হয়েছে, না রে?

বন্দনা জবাব দেয়নি, নিশ্চুপ চুলের জট ছাড়াতে থাকে।

অতসী ছুটে এসে ওর চুটি কাঁধে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে, কই বললি না? কতজন বন্ধু আছে তোর? কটা ছেলের মাথা খাচ্ছিস?

বন্দনা উঠে দাঁড়ায়। জোর করে কাঁধ থেকে দিদির হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, দিদিগিরি করিস না বলছি।

—কী বললি? আমি করব না? তুই আমার উপর দিদিগিরি করবি? হতভাগী! তোর লজ্জা করে না? ধুমসি মাগি! কেলেঙ্কারি হলে ঠেকাবে কে?

এর জবাবে ছোটখুকি যে কথাটা বলেছিল তাতেই অতসী সংযম হারায়। বলেছিল, কেলেঙ্কারি হবে না। লাল ত্রিকোণের বিজ্ঞাপন দেখিসনি?

অতসী আর স্থির থাকতে পারেনি। প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল বন্দনার গালে, লক্ষ্মীছাড়ি! তুই এতবড় কথা বলিস!

পাঁচ-আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছিল বন্দনার গালে। দৈহিক ক্ষমতায় তারই বেশি। সে কিন্তু প্রতি-আক্রমণ করেনি। উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বলল, তুই আমাকে মারলি?

—মারের এখন হয়েছেটা কি? মেরে তোর ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেব। তুই যার খাস যার পরিস্ তারই মুখে মুখে চোপা?

বন্দনা শুধু অস্ফুটে বলেছিল, যার খাই, যার পরি…?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেরিয়ে যা! এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা। দেখি, কোন বন্ধু তোকে খেতে দেয়, পরতে দেয়! যা—তোর মুখদর্শন করব না আমি। বেরিয়ে যা, বলছি!

বন্দনা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর যেন সিদ্ধান্তে এল।

বলল, বেশ। তাই যাচ্ছি! আর কোনদিন তোর ভাত খেতে আসব না!

—যা যা! দেখি তোর তেজ কত!

বন্দনা এলো খোঁপাটা জড়িয়ে নিল। তুলে নিল ভ্যানিটি ব্যাগটা। আর কী দুঃসাহস! সত্যিই বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে।

অতসী ছুটে এল সদর-দরজার কাছে। বললে, কোথায় যাচ্ছিস তেজ দেখিয়ে? রাত দশটা বেজে গেছে সেটা খেয়াল আছে?—বন্দনা! শুনে যা!

বন্দনা শোনেনি। হনহনিয়ে চলে গিয়েছিল।

অতসী কী করবে ভেবে পায়নি!

বড়মামা বলেছিল, ঠিক আছে, আমি জেগে বসে আছি। দরজা খোলাই থাক। রাগ পড়লে, মাথা ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসবে আবার। যাবে কোথায়?

আসেনি! সমস্ত রাত ঘর-বার করেছে অতসী।

পরদিন সকালে সে কী করবে, কোথায় যাবে স্থির করতে পারেনি।

তৃতীয় দিনে খবর পাওয়া গেল। ডাকপিয়ন দিয়ে গেল চিঠি। বলাই গাঙ্গুলীকে লিখছে ডক্টর কুনাল বসু—'আপনার ভাগ্নি শ্রীমতী বন্দনা রায়কে আমি মাসখানেক আগে রেজিস্ট্রীমতে বিবাহ করেছি।'

॥ ৭ ॥

যাচ্ছে নিজের বোনের বাড়ি, অথচ ভাবখানা যেন সিধেল চোর।

বাস থেকে নেমে একবার আড়চোখে দেখে নিল। মেজানাইন ঘরের জানলাটা খোলা, পর্দাটা টানা আছে। সম্ভবত বন্দনা ঘরেই রয়েছে, কারণ পর্দা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে সিলিং ফ্যানটা ঘুরছে। নিচে ডিস্‌পেনসারিতে ডাক্তার-বাবুও আসীন। চেয়ার-বেঞ্চিতে বেশ কয়েকজন রুগী অপেক্ষা করছে। তাহলে কুনালের পসারটা ভালই জমেছে। হাতঘড়িটা একবার দেখে নিল অতসী। সওয়া পাঁচটা। আজ রবিবার। বাসযাত্রীদের ভিড়ে ইতর বিশেষ হয়নি ততটা। প্রশ্ন হল, রাস্তা পার হয়ে ডিস্‌পেনসারিতে ঢুকে পড়ার আগেই যদি বন্দনা জানলায় এসে দাঁড়ায়? যদি দেখতে পায় দিদিকে? কী ভাববে মেয়েটা? দিদি এখনও ঘুর-ঘুর করছে কুনালদার পিছনে? ছোটবোনের স্বামীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম করছে? কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই। ফিরে যাবে বলে এতটা পথ আসেনি। হয়তো কুনাল ইতিমধ্যেই ব্লাড-স্লাইডটা পরীক্ষা করেছে, হয়তো সিদ্ধান্তে এসেছে: সেই হতভাগা ছেলেটার ফাঁসীর হুকুম হল কি না।

রাস্তা পার হয়ে দ্রুতপদে অতসী এগিয়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়ল ডাক্তারখানায়।

কুনাল একজন বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ লক্ষ্য হল তার। আশ্চর্য মানুষ। একচুল অবাক হল না। সে কি আশা করেছিল অতসী আসবে? আশা না আশঙ্কা? অথবা আশ্চর্য সে হয়েছে, কিন্তু অবাক হওয়ার অভিব্যক্তিটা সে গোপন করতে পেরেছে!

অতসী বেঞ্চের একপ্রান্তে বসে পড়ে।

ডাক্তারবাবু পর্যায়ক্রমে একের পর একজনকে নিয়ে পিছনের 'এগজামিনেশন রুম'-এ ঢুকছেন। মিনিট পাঁচ-সাত পরে বেরিয়ে আসছেন। কোন কোন দর্শনার্থীকে ভিতরে নিয়ে যাবার প্রশ্ন উঠছে না। তারা রুগী নয়, রোগগ্রস্তের আত্মীয়। কথাবার্তা বলছে, উপসর্গের কথা শুনছে, কখনও বা প্রেসক্রিপশান লিখে দিচ্ছে, কখনও নির্দেশ দিচ্ছে পথ্যের, শুশ্রূষার। ইতিমধ্যে একটি বিধবা, বোধহয় বাড়ির ঝি, একটা ফ্লাস্ক রেখে গেল টেবিলে। কুনাল উঠে গিয়ে বেসিনে হাতটা ধুয়ে এল। ফ্লাস্ক খুলে তার ঢাকনিতে গরম কিছু পানীয় ঢেলে

তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকে। চা না কফি? কে বানিয়েছে? ঐ বিধবা বুড়ি ঝি, না বন্দনা নিজে? কুনাল বরাবর কফির পক্ষপাতী। জানা আছে অতসীর। সে নিজে চায়ের ভক্ত। কোন দোকানে ঢুকলে দু-জাতের পানীয় অর্ডার দিতে হত। এর চা তো ওর কফি। অতসী বলত, সত্যিই তোমার সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই। কুনাল জবাবে বলত, অন্তরের মিল ছাড়া। ক্ষেত্রবিশেষে, যেখানে কফি পাওয়া যেত না সেখানে অবশ্য দুজনেই চায়ের অর্ডার দিত। আজ ওটা যাই হোক—কুনাল তাকে ভাগ নিতে ডাকল না। আর পাঁচজন রুগীর সঙ্গে একই সারিতে বসে সে কুনালের চা অথবা কফি পান দেখতে থাকে।

কোনরকম পক্ষপাতিত্ব দেখালো না কুনাল। অতসী মনে মনে মহড়া দিয়ে চলেছে—সে কী-জাতের স্ট্যাণ্ড নেবে। সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে রুগীর আত্মীয় সেজে থাকা। সেই সুযোগই তাকে দিয়েছে কুনাল। স্ত্রীর বড়বোন হিসাবে মেনে নিলে অনেক আগেই তার বলার কথা, আসুন দিদি, যান উপরে গিয়ে বসুন। 'ও' বাড়িতেই আছে!

তা যখন বলেনি, তখন অতসী গম্ভীরভাবে বলবে, কাল যে রুগীর ব্লাড-স্যাম্পেলটা নিয়ে এলেন তার রিপোর্ট তৈরী হয়েছে?

কুনাল হয়তো চাল মেরে প্রতিপ্রশ্ন করবে, কোন কেসটা বলুন তো?

অথবা বলবে, সে রিপোর্ট তো ল্যাবরেটরিতে আছে।

হঠাৎ বাঁ পাশের ভদ্রমহিলা ওর হাতে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, আপনাকেই ডাকছেন উনি—অতসী সাম্বিৎ ফিরে পায়। এতক্ষণে তার চান্স এসেছে। পাখি-পড়ার মত বলতে যায়, কাল যে ব্লাড-স্যাম্পেলের···

তার আগেই ডাক্তারবাবু বলেন, হ্যাঁ আপনাকেই। আসুন, আপনার পেটটা টিপে দেখি—

অতসী জবাব দেবার আগেই ডাক্তারবাবু ঢুকে গেলেন 'এগজামিনেশন রুমে।'

অতসী দাঁড়িয়ে পড়ে। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। তার বাঁ-পাশের মহিলাটি আবার তাগাদা দেন, কী হল? যান? উনি আপনাকে এক্‌জামিন করবেন।

অতসী দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে পর্দা-ঠেলা ঘরে ঢুকে পড়ে।

কুনাল বাতিটা আগেই জ্বেলে দিয়েছে। জোরালো বাতি। নির্বিকারভাবে বলে, নিন, শুয়ে পড়ুন। সায়ার দড়িটা আলগা করে দিন।

অতসীর হাতটা নিশপিশ করছে। টেনে একটা চড় মারবার জন্য।

কুনাল যেন চড় খাবার জন্যই মুখটা বাড়িয়ে দেয়। অস্ফুটে বলে, শুয়েই পড়।

সায়ার দড়ি খুলতে হবে না। তবে ঐ অবস্থাতেই কথা বলা ভালো। তাহলে চুপি চুপি কথা বলায় কারও সন্দেহ হবে না। গাইনকলজিক্যাল কেস্ তো!

অতসী সরু বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় শুয়ে পড়ে। আপত্তি করে না। বলে, আমি এসেছিলাম···

—জানি! রঞ্জন চক্রবর্তীর জন্তে। কিন্তু একটা কথা বলতো অতসী? তুমি কি ছেলেটাকে ভালবাস?

তড়াক করে উঠে বসে, তার মানে? এসব কথা আসছে কেন?

—আস্তে! আস্তে! বাইরের ওঁরা ভাবতে পারেন, আমি তোমার শ্লীলতাহানি করছি, শোন! রঞ্জন চক্রবর্তী লুকাবার কোনও চেষ্টা করেনি—বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিল তার মনোভাবটা। আমি জানতে চাইছি, কনভার্স থিয়োরেমটার কথা। অর্থাৎ তুমি কি···

—থাক! জানতে চাইছ কোন অধিকারে? এসব কথা উঠছেই বা কেন? অতসীর কণ্ঠস্বর যথেষ্ট সতর্ক নয়।

কুনাল পর্দাটা খুলে দিল। বলল, উঠে বসুন। আমার দেখা হয়ে গেছে। বাইরে আসুন এবার।

উপায় নেই। এখন বাইরের ভিজিটাররা ওদের দেখতে পাচ্ছে। অতসী চটিটা পায়ে দেয়। বেরিয়ে আসে এঘরে। কুনাল ততক্ষণ একটা কাগজে কী-যেন খস্‌খস্ করে লিখছিল। অতসী এসে দাঁড়াতেই বললে, এই ওষুধটা দিনে তিন-বার খাবেন। খাওয়ার পর। কাল অন্যান্য কথা হবে।

হাত বাড়িয়ে কাগজখানা ধরিয়ে দেয়। তাতে সাদা বাঙলায় লেখা ছিল, 'অনেক কথা আছে। কাল সকাল দশটায় আমার ল্যাবরেটরিতে দেখা কর। ঠিকানা এই প্যাডের কাগজের মাথায় লেখা আছে।'

অতসী তবু থামে না। বলে, ব্লাড-রিপোর্টটা কি— ?

—না, কাল সকালে পাবেন। সকাল দশটায়।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শেষ যে দর্শনার্থীটি কুনালের ডিস্‌পেন্সারিতে পদধূলি দিতে এলেন তাঁরও তনিমা সিঁদেল চোরের। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলেন পরিবেশটা। নাঃ! ঘরটা ফাঁকা। কুনাল উঠবার উপক্রম করছে। ছাতাটা কোনায় দাঁড় করিয়ে বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন; কুনালের মুখোমুখি চেয়ারটায় বসে বললেন, অনেকক্ষণ এসেছি। বাইরে পায়চারি করছিলাম। এতক্ষণে ঘরটা ফাঁকা পাওয়া গেছে। তা ভালো, পসার বেশ জমে উঠেছে বাবাজীর। রামতারণ বেঁচে থাকলে দেখে আনন্দ পেত।

কুনাল তার স্বর্গত পিতৃদেবের উল্লেখে খুশি হল, না খচে গেল, বোঝা গেল না। সে একটা পত্রিকার উপর নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বসেছিল। মুখ না তুলেই বললে, আপনাকে তো বলেছিলাম কাল সকাল দশটায় আমার ল্যাবরেটারিতে আসতে। এখানে এসেছেন কেন? এখানে তো রিপোর্ট নেই।

—জানি বাবাজী, জানি। লিখিত রিপোর্ট তো এখানেই হাতে হাতে নিতে আসিনি। খবরটা শুধু জানতে এসেছি। ফলাফলটা জানা গেছে?

এবারও মুখ তুলল না কুনাল। বললে, গেছে।

—গেছে? কী খবর?

—খারাপ। খুব খারাপ।

—খারাপ? ঐ সেই লিউকোমিয়া নয়?

এতক্ষণে কাগজ থেকে মুখ তুলে পিতৃবন্ধুর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো কুনাল। কী আশ্চর্য ঐ মানুষটা! স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। ঐ ফোঁটাকাটা কুশীদ-জীবীটার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে তার পরিকল্পনাটা। তাই একটা চব্বিশ বছরের তরুণের মৃত্যুদণ্ড মকুব হওয়া ঐ পাষণ্ডটার কাছে দুঃসংবাদ। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান সে। লজ্জা পেতে দিল না করালীকিঙ্করকে, তাঁর মুখ ফসকে বলে-ফেলা কথাটার জন্য। বরং তার লজ্জানিবারণের সুযোগ দিয়ে বললে, আপনি আমার কথাটা শুনতে পাননি—বলেছি, 'খবর খারাপ'; অর্থাৎ পজেটিভ রিপোর্ট হয়েছে। এ্যাকুট কেস অব লিউকেমিয়া।

করালীকিঙ্করও অত্যন্ত ধূর্ত। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলেন, বল কী! সর্বনাশ! এরপর মিনিট খানেক কুনালকে অপেক্ষা করতে হল। করালীকিঙ্কর ততক্ষণে যোগেশ দত্ত। কথা ফুটছে না মুখে—মূকাভিনয়ে মানসিক যন্ত্রণা, হতাশা, বেদনার একটা মর্মান্তিক অভিনয় করতে থাকেন। আহা! এই বয়সে অমন একটা 'শিবের অসাধ্য ব্যামো' হল। কতটুকুই বা দেখেছে দুনিয়ার! কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত সুকুমার চিন্তা! নিমেষে সব ব্যর্থ হয়ে গেল! তবে এই তো দুনিয়ার নিয়ম। ঘড়া ঘড়া চোখের জল ঢাললে তো কারও কোনও লাভ নেই। তবু দুনিয়াদারি করে যেতে হবে। রজত-রঞ্জনের স্বর্গগতা গর্ভধারিণী ওঁর মন্ত্র-শিষ্যা। উনি ওদের পরিবারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সকলের মুখ চেয়ে করণীয় যা কিছু তা তো ওঁকেই করতে হবে! এই রকম কতকগুলি অনুভূতির ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল ওঁর অভিনয়ে। একবার চোখ বুজলেন, হাত দুটি উল্টে দিলেন, কোঁচার খুঁটে চশমার কাচটা মুছতে গিয়ে চোখটাও মুছে নিলেন, নড়ে চড়ে

বসলেন, গলাটা সাফা করে বললেন, ভবিতব্য। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। তুমি আমি কী করব বাবাজী?

—তা তো বটেই।—কুনাল নির্বিকার।

—তা অসুখটা কী জাতের? চিকিচ্ছে করালে সারবার সম্ভাবনা নেই?

—ঐ সেদিন আপনি যাকে বলেছিলেন—'শিবের অসাধ্য ব্যামো'।

—আহা হা! কদিন টিকবে বলে মনে হয়?

—ভালো মতন চিকিৎসা করলে মাস ছয়েক। না হলে, মাস-দেড়েকের মধ্যেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়বে। আমার অনুমান আট থেকে দশ সপ্তাহ যুঝতে পারবে।

বেশ কিছুক্ষণ মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর বলেন, খবরটা ওদের না জানানোই মঙ্গল, কী বল?

কুনাল বলল, দেখুন, এসব পরামর্শ আমার সঙ্গে করার কোন মানে হয় না। সংবাদটা অত্যন্ত বেদনাবহ। তবে আমি তো জাতে ডাক্তার, অতটা দাগ কাটে না মনে। ওঁরা আমার কেউ নন—আপনার স্নেহভাজন। আপনিই ভালো বুঝবেন।

একটু ইতস্তত করে বৃদ্ধ বললেন, ওর সেই ব্লাড-স্লাইডটা কোথায়? ল্যাবরেটারিতে?

—না। এখানেই—

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের একটি ড্রয়ার খুলে খানকতক মুখবন্ধ খাম বার করল কুনাল। বেছে বেছে একখানা বার করল। রাখল টেবিলের উপর। খামের উপর লেখা আছে 'পি-এল: ৪০৩—শ্রীরঞ্জন চক্রবর্তী'। কুনাল সেই খামের গর্ভ থেকে বার করল একটা রিপোর্ট আর একটা ব্লাড-স্লাইড। প্রথমোক্তটা খুঁটিয়ে দেখল আবার—কী যেন বিড়বিড় করে হিসাব করল মনে মনে। ব্লাড-স্লাইডটা আলোর সামনে ধরে একবার দেখল। তারপর সবশুদ্ধ খামে ভরে বললে, হ্যাঁ, ঐ দশ সপ্তাহই। বড়জোর এগারো।

খামটা ড্রয়ারে রাখবার উপক্রম করতে বৃদ্ধ বললেন, দেখি ওটা?

—আপনি দেখে কি করবেন? কী বুঝবেন?

—দাওই না একবার, দেখি—

কুনাল খামটা বাড়িয়ে ধরে ওঁর দিকে।

বৃদ্ধ খামটা নিলেন। খুলে দেখলেন না। সযত্নে রেখে দিলেন বুক পকেটে।

কুনাল বিস্মিত হয়ে বলে, ওটা কি হল?

—বলছি বাবাজী। দাঁড়াও দোরটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

সত্যই উঠে গেলেন তিনি। ডিস্‌পেন্‌সারির দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে ফিরে এসে বসলেন নিজের চেয়ারে। বললেন, দেখ বাবাজী—প্রথম দিন থেকেই তুমি সন্দেহ করেছ ভিতরে একটা ব্যাপার আছে। সেদিনই বলেছিলে, '—আপনার মতলবটা কী বলুন তো?' আমি তখন বলিনি। শুধু বলেছিলাম, সময় হলে জানাব। এখন সময় হয়েছে। সব কথা তোমাকে খুলে বলছি। তুমি যদি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হও তাহলে, ঐ যে সেদিন যা বলেছিলাম—

বাধা দিয়ে কুনাল বলে, মনে আছে আমার। বন্ধকী তমস্থকটা ছিঁড়ে ফেলবেন এবং বাড়ির দলিলটা ফেরত দেবেন। কিন্তু একটা কথা ঠাকুরমশাই—আমি কোন তঞ্চকতার মধ্যে যেতে পারব না—তা আগেই বলে রাখছি। আপনার প্রস্তাবের মধ্যে যদি কোন 'শেডি বিজনেস্' থাকে, তবে তা আমাকে বলারই দরকার নেই। আমি সেটা না শুনেই প্রত্যাখ্যান করছি। আপনি অন্য কোনও ডাক্তারের সাহায্য নিন—

বৃদ্ধ যেন মর্মাহত হলেন। রীতিমত ক্ষোভম্লানকণ্ঠে বললেন, কুনাল। তুমি কি আমার অচেনা? জন্মো থেকে যে তোমাকে জানি আমি। তুমি রামতারণ বোসের ব্যাটা, জানতে বাকী আছে আমার? তঞ্চকতার মধ্যে আমি নিজেও নেই—তোমাকেও ডাকছি না।

—বেশ তাহলে বলুন?

করালীকিঙ্করের প্রস্তাবটা প্রাঞ্জল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়—

রজত-রঞ্জনের 'গব্বোধারিণী' ওঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি স্বর্গে গেছেন; কিন্তু ইহলোকেই থাকুন বা পরলোকেই থাকুন, শিষ্যার প্রতি করালীর কর্তব্য আছে—শিষ্যার সন্তান-সন্ততির মঙ্গল-কামনা যদি তিনি না করেন তবে তিনি কেমনতর কুলগুরু?

রঞ্জনের যে অসুখ হয়েছে তা চিকিৎসার অতীত। আড়াই-তিন মাসের মধ্যে তার অবধারিত মৃত্যু। এ রোগের চিকিৎসা নেই। ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কী আছে? কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই: রোগীকে কি জানানো উচিত যে, সে ফাঁসীর আসামী? তিন মাস পরে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে হবে তাকে? কুনাল কী বলে? তার কী অভিমত এ বিষয়ে।

কুনাল বলল, এ নিয়ে মেডিকেল জার্নালে অনেক আলোচনা হয়েছে। এক একজন বিশেষজ্ঞ এক-এক রকম মত প্রকাশ করেছেন। কুনাল সে সব প্রবন্ধ

পড়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে তার আসন্ন আসন্ন-মৃত্যুর কথাটা না জানানোই ভালো। তাতে মৃত্যুপথযাত্রী যে-কদিন বাঁচে আনন্দে বাঁচে, দুর্মনস্যতায় ভুগে ভুগে বাঁচে না, আতঙ্কতাড়িত ফাঁসীর আসামীর মত ছটফট করে বাঁচে না।

—সুতরাং তার কাছ থেকে খবরটা গোপন রাখাই মঙ্গল। কী বল বাবাজী?

—আমার তাই মনে হয়।

—সেক্ষেত্রে তার পরিবারস্থ সকলের কাছ থেকেই খবরটা গোপন রাখতে হবে।

—তা কেমন করে সম্ভব? আমাকে রিপোর্টটা দিতে হবে তো?

—না। দিতে হবে না। তোমাকে ডেকে নিয়ে গেছিলাম আমি। 'ফিস'-এর টাকা দিয়েছি আমি। তোমার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। বল, বিবেকে বাধছে?

একটু ভেবে নিয়ে কুনাল বলল, না। আমি রাজী।

—দ্বিতীয় কথা। আমাদের কর্তব্য এই তিন মাস রঞ্জনের জীবনটা যতখানি সম্ভব আনন্দঘন করে তোলা? তাই নয়?

—সে তো নিশ্চয়ই।

—তাই আমি স্থির করেছি, তাকে আমার একটি কারবারে স্থায়ী চাকরি দেব। বেশ মোটা মাইনের। ধর পাঁচ শ'? দু-তিন মাস! যাতে ছেলেটা ফুর্তি-ফার্তা করতে পারে। কাজটা তুমি অনুমোদন করছ? বিবেকে বাধছে না তো?

—কী আশ্চর্য! আপনি তাকে চাকরি দেবেন এতে আমার বিবেকে বাধবে কেন?

—বলছি বাবাজী, বলছি। আমার সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা আগে পেশ করি। তাহলে কী দাঁড়াল? তোমার হিসাবমত তিন মাস, না হয় চার মাসই হল—আমাকে মা'হনা বাবদ দিতে হল হাজার দুই টাকা। তোমাকে সহকারী হিসাবে পেতে তের মাস চারশ টাকা হিসাবে—সুদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—দাঁড়াল পাঁচ হাজার দু শ'। একুনে সাত হাজার দু শ'। চিকিচ্ছে বাবদ, টুকিটাকি বাবদ ধর আরও হাজার-দেড় হাজার। তার মানে, নয়-সাড়ে নয়, মোটমাট দশ হাজার টাকা আমার গ্যাঁটগচ্চা যাচ্ছে। ঠিক কি না?

কুনাল বললে, আপনি কী করতে চাইছেন, বলুন তো?

—সেটায় ক্রমশ আসছি বাবাজী। আগে বল, ঐ দশ হাজার টাকার হিসাবে কোনও গল্‌তি আছে?

—না নেই। তাতে কী হল?

—তার মানে—রঞ্জনকে তিন মাসের জন্য শাস্তি দিতে হলে এবং তোমাকে পিতৃঋণ পরিশোধের দগ্ধানি থেকে মুক্তি দিতে হলে আমাকে দশ হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এ টাকাটা ন্যায্যত আমার প্রাপ্য?

কুনাল বিরক্ত হয়ে বললে, এক কথা কতবার বলব আপনাকে?

—না, না এবার কাজের কথায় আসি। শোন—

অকপটে উনি মেলে ধরলেন ওঁর পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপটা। চক্রধরপুরের কাছাকাছি ওঁর একটা কাঠ-চেরাইয়ের কারখানা আছে। বনবিভাগ থেকে শাল-পিয়াশাল, গামার প্রভৃতির জঙ্গল ইজারা নেওয়া আছে। ট্রাকে করে ঐ কাঠ চেরাই-কলে আসে—সাইজ মত তৈরী হয় এবং বিভিন্ন স্থানে চালান যায়। চেরাই-কলে দশ-বিশ জন মানুষ খাটে। তারা মাহিনা করা; কিছু লোকে খাটে ফুরনে। এজন্য একজন ম্যানেজার রাখতে হয় তাঁকে। বর্তমানে পদটি খালি। ইতিপূর্বে যিনি ম্যানেজার ছিলেন তাঁকে উনি মাসে সাড়ে তিনশ করে মাইনে দিতেন। চেরাই-কলের সংলগ্ন দু-কামরার একটা ফ্ল্যাটও আছে। বিনা ভাড়ায় তাতে থাকা যাবে। ঐ ম্যানেজার-কাম-কেশিয়ার পদে তিনি রঞ্জন চক্রবর্তীকে অবিলম্বে বহাল করতে ইচ্ছুক। রঞ্জন মোটামুটি সুস্থ হলেই। তবে কেশিয়ার হিসাবে তাকে দু-পাঁচ হাজার টাকার লেনদেন করতে হবে—শ্রমিকদের মাহিনা বাবদ, ট্রাকের ভাড়া ইত্যাদি বাবদ। খরিদ্দারেরা অবশ্য সবাই চেক-এ পেমেণ্ট করেন। তাই ক্যাশিয়ারের সিকিউরিটি হিসাবে চাকরিতে যোগদানের আগে রঞ্জন চক্রবর্তী একটা পনের হাজার টাকার ইনসিওরেন্স করবে—তার নমিনি হবেন নিয়োগকর্তা করালীকিঙ্কর।

কুনাল চমকে উঠে বলে, বলেন কি? তা কেমন করে সম্ভব? এ তো এস. আই. সি.-কে ঠকানো! যে ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করবে সে কেস-হিস্ট্রি শুনে ব্লাড-রিপোর্ট পরীক্ষা করাতে চাইবে না?

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে করালীকিঙ্কর বলেন, না, চাইবে না। কারণ তাকে অগ্রিম পাঁচ হাজার দু শ টাকা ফি দেওয়া হয়েছে।

কুনাল স্তব্ধ বিস্ময়ে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে থাকল।

করালী বললেন, এতে তোমার কোন রিস্ক নেই বাবাজী। এখন রোগের

প্রথমাবস্থা। তুমি ওকে অ্যানিমিক বলে সন্দেহ করছ। ব্লাড-রিপোর্ট পরীক্ষা আদৌ করানো হয়নি। কেমন?

কুনালের নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিলেন করালীকিঙ্কর। তারপর বললেন, আর একটা কথা বাবাজী। আমাকে বুঝিয়ে বলত—মাস দু-তিন আগে ওর রক্ত-পরীক্ষা করালে এ রোগ ধরা পড়ত?

—বলা যায় না। মাস ছয়েক আগে করালে নিশ্চয়ই পড়ত না।

—তাহলে একটি কাজ তোমাকে করতে হবে। তুমি তো সিনিয়ার প্যাথলজিস্ট। সব কলকাঠিই তোমার হাতে। মাস ছয়েক আগের তারিখে একটা রিপোর্ট তোমাকে দিতে হবে, যাতে হোয়াইট ব্লাড করপাস্‌ল্‌স্‌-এর পার্সেন্টেজ বিপদসীমার নীচে।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় কুনাল। বললে, লিউকেমিয়া রোগটার সম্বন্ধে এত-কথা আপনি জানলেন কেমন করে?

—সামান্য পড়াশুনা করতে হয়েছে, বাবাজী। সব দিকে আটঘাঁট বেঁধে না রাখলে 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' হয়ে যেতে পারে তো?

—বুঝলাম, কিন্তু ছয়মাস আগের ঐ ফল্‌স্‌ রিপোর্টটা কেন দরকার হচ্ছে?

—তোমার নিরাপত্তার জন্য, বাবাজী! তুমি রামতারণের ছেলে। তোমার দিকটাও তো আমাকে দেখতে হবে। না কি বল? এ নিয়ে ভবিষ্যতে যদি কোনও এনকোয়ারী হয়, তাহলে তুমি একটা স্ট্যাণ্ড নিতে পারবে: ছয় মাস আগেই তুমি ওর ব্লাড-কাউণ্ট পরীক্ষা করেছ! তাই এ জাতীয় সন্দেহ তোমার মনে জাগেনি। ও অ্যানিমিক, ব্লাড-ক্যানসারের রুগী নয়!

কুনাল একটু ভেবে নিয়ে বললে, এটা আপনি ঠিকই বলেছেন ঠাকুরমশাই।

—তাহলে বেলা বারোটা নাগাদ তোমার ল্যাবরেটারিতে যাব। তুমি একটা ব্যাক-ডেটেড নেগেটিভ রিপোর্ট লিখে রেখ।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ান। কুনাল বলে, বসুন। একটা কাজ বাকি আছে করালী-কাকা। আপনার বুক পকেটে রাখা ঐ খামটা আমাকে ফেরত দিতে হবে।

—কেন? এটা আর তোমার কোন কাজে লাগবে? আজকের ডেট-এর পজেটিভ রিপোর্ট তো তোমাকে আদৌ লিখতে হবে না।

কুনাল হাসল। বলল, তা হোক। আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার বাবার বন্ধু। তার চেয়ে আরও নিকটতর সম্পর্ক স্থাপিত হল আপনার সঙ্গে—'পার্টনার ইন ক্রাইম!'—তবুও ওই খামটা কি আপনার কাছে রাখতে পারি? আজকের তারিখে 'Px—403. Mr. R. Chakrabarty'-র নাম লেখা ব্লাড-

রিপোর্টটা? রঞ্জনের পনের-বিশ হাজার টাকার পলিসিটাতে ডাক্তার হিসাবে তো আমিই সই করব?

—তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ বাবাজী?

কুনাল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। বলে, করছি! পার্টনার-ইন-ক্রাইম-দের ধর্মই এটা। দুজনেই চিন্তা করে—সহযোগী ডব্‌ল্‌-ক্রশ করার সুযোগ পাচ্ছে কি না!

করালী খামটা পকেট থেকে বার করে নাড়াচাড়া করেন। বললেন, তুমি এতবড় কথাটা বললে বাবাজী! তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?

—কেন? আপনি করেন না? আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন না?

—আমি! কেমন করে?

—আমি কি ঘাসের বিচি খাই? আমি কি বুঝি না, কেন ঐ রিপোর্টখানা নিয়ে যেতে চাইছেন আপনি?

—কেন? তুমিই বল?

—দুটি কারণে। প্রথম কথা, আমার মৃত্যুবাণ আপনার কাছে গচ্ছিত থাকল। খামের উপর ঐ 'Px-403. Mr. R. Chakrabarty' কথাগুলো যে আমার স্বহস্ত-লিখিত তা হস্তরেখা-বিশারদ প্রমাণ করবে। ভিতরের রিপোর্টেও লেখা আছে ঐ নাম, দেওয়া আছে আজকের তারিখ। এ থেকে আমি শুধু ডিগ্রিই খোয়াব না; জেলেও যেতে পারি। তাই না?

কুনাল হাসল। বৃদ্ধ নির্বিকার ভাবে শুধু বললেন, দ্বিতীয় কারণ?

—দ্বিতীয় কারণ, আপনিও আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন না। আমি ডব্‌ল্‌-ক্রশ করছি কি না জানতে ঐ রিপোর্টটা নিয়ে যাচ্ছেন। অন্য কোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে আপনি যাচাই করে জেনে নিতে চান ঐ রক্তে কত পার্সেন্ট শ্বেত রক্ত-কণিকা আছে। ঐ রোগী কত দিন বাঁচবে। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, করালীকাকা। ক্রাইম-এর ধর্মই এই! প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলতে হয়! পার্টনার ইন-ক্রাইমকে সন্দেহ করতে হয়!

করালী হাসলেন। বললেন, তুমি জীবনে উন্নতি করবে বাবাজী।

কুনাল নীরবে প্রতীক্ষা করে। করালী খাম থেকে ব্লাড-স্লাইড ও রিপোর্টটা বার করলেন। রিপোর্টের মাথায় ঐ যেখানে লেখা আছে 'Px-403 Mr. R. Chakrabarty' সেই অংশটা ছিঁড়ে নিয়ে ফের ঐ খামে ভরলেন। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটি কাঠি জ্বাললেন। নিপুণ হাতে—যেন এভাবে কাগজ পুড়িয়ে ফেলাই তাঁর পেশা—নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেললেন খামটা।

একটি সাদা কাগজে এবার ঐ স্লাইড ও নাম-তারিখহীন রিপোর্টখানা জড়িয়ে নিয়ে পুনরায় বুক পকেটে ভরলেন। একগাল হেসে বললেন: কুইট্‌স্। কেউ কারও মৃত্যুবাণ নিজের জিম্মায় রাখল না। কাল বারোটায় সময় দেখা হবে। ব্যাক্‌ডেটের রিপোর্টটা যেন তৈরী থাকে। আমি তোমাকে কালই নিয়ে যাব বাণ্ডইআটি। ইনসিওরেন্স ফর্ম আমি সঙ্গে নিয়েই আসব। বিকেলটা ফ্রি রেখ। চলি।

উঠে দাঁড়ালেন করালী। কুনালও। বলল, একটু ভুল হল করালীকাকা। কালকে শুধু ইন্সিওরেন্স ফর্ম আর মেডিকেল ফর্ম আনলেই তো চলবে না, ঐ সঙ্গে—

বাধা দিয়ে করালী বললেন, মনে আছে বাবাজী!

॥ ৮ ॥

ওরিয়েন্টাল ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারিতে অতসীই বোধহয় আজ প্রথম ভিজিটার। কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। মাঝে একটা 'হল-কামরা'। সারি সারি বেঞ্চি, দেওয়াল ঘেঁষে। মাঝখানে একটা গোল টেবিল। তার চারদিকে চেয়ার। টেবিলে নানান জাতের পত্রিকা—বেশ কিছু মেডিক্যাল জার্নাল এবং রোটারিয়ান অথবা লায়ন্স ক্লাবের পত্রিকা। দু-চারটি ইলাস্‌ট্রেটেড উইকলিও আছে। হল-ঘরের তিনদিকে ভাক্তারদের চেম্বার। এক-দিকে একটি কাউন্টারে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। অতসী তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, ডক্টর কুনাল বসু এসেছেন।

—হ্যাঁ, একটু আগেই এসেছেন। আপনি এই ভিজিটার্স স্লিপে নাম-ঠিকানা লিখে দিন, আর একটু অপেক্ষা করুন।

বৃদ্ধের নির্দেশে স্লিপটা নিয়ে একজন ছোকরা সামনের ঘরখানায় ঢুকে গেল।

অতসীর লক্ষ্য হল তাতে কুনালের নেমপ্লেট বসানো আছে।

একটু পরেই ছেলেটি এসে বললে, আপনাকে ডাকছেন।

অতসী সুটকেস-ভোর ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। হয়তো হাত তুলে নমস্কার করাটাই প্রথা, অতসী তা করল না। বসল সামনের চেয়ারটায়।

কুনাল হাতঘড়ির দিকে একনজর দেখে নিয়ে বললে, ওভার-পাঙ্কুয়াল।

অতসী জবাব দিল না।

কুনাল বলল, খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছ নিশ্চয়। এখান থেকে অফিস করবে?

অতসী বললে, খেয়েই বেরিয়েছি। তবে অফিস করব কিনা এখনই বলতে পারছি না। সেটা নির্ভর করছে তুমি কী বলবে তার উপর।

কুনাল একটু নড়ে চড়ে বসল। তারপর বলল, তার মানে তুমি বাগুইআটিও যেতে পার?

শরবিদ্ধ পাখির মতো অতসী বললে, আসল কথাটা বলে দিলেই ভাল হয় না কি?

কুনাল মনস্থির করেই রেখেছিল। তৎক্ষণাৎ বললে, ব্লাড-রিপোর্টের রেজাল্টটা তো? সেটা এখনো হাতে পাইনি। রমেন, মানে আমার অ্যাসিস্টেন্টের কাছে আছে। এখনই এসে পড়বে। সে এলেই সেটা দেখে—

—তার মানে? তুমি নিজে পরীক্ষা করনি?

—আমিই করেছি। কিন্তু রিপোর্টটা আমার কাছে নেই।

—তুমি বলতে চাও যে, রেজাল্টটা পজেটিভ না নেগেটিভ তা তোমার মনে নেই।

কুনাল একটু অপ্রস্তুত হল। ইতস্তত করে বললে, দিনে আমি দশ-বিশটা কেস দেখি অতসী। সব কি আর মনে থাকে?

অতসী অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর তার চোখ দুটি জলে ভরে এল। বলল, তুমি মিছে কথা বলছ কুনাল এ হতে পারে না। তুমি জান, নিশ্চয়ই জান, আমার কাছে ভাঙছ না। তার মানে ওর লিউকেমিয়াই হয়েছে।

—আরে না না।—কুনাল আরও কুণ্ঠিত—বিশ্বাস কর আমার মনে নেই। কাল আমি সাতটা ব্লাড-রিপোর্ট দেখেছি। ব্লাড কাউন্ট করেছি। ঠিক কোনটার কী রিপোর্ট...কিন্তু রমেন এখনই এসে পড়বে। তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

—ঈশ্বরের দিব্যি করে বলতে পার যে, তোমার মনে নেই?

যে ঈশ্বর আছেন কি নেই এ বিষয়েই কুনাল স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি তাঁর নাম নিয়ে সে অনায়াসে বলতে পারল: ঈশ্বরের দিব্যি!

এতক্ষণে একটু শান্ত হল অতসী। বললে, আশ্চর্য মানুষ বাপু তোমরা!

—কী করব বল? প্রত্যহ দশটা করে হলে গড়ে মাসে তিনশ লোকের ফতোয়া জারি করতে হয়। কেউ ছাড় পায়, কেউ সশ্রম কারাদণ্ড ভোগে, কেউ বা ফাঁসির দড়িতে ঝোলে। আমাদের মনে ঘাটা পড়ে গেছে। রুগীরা আমাদের কাছে পুরুষ নয়, নারী নয়—একটা নম্বর! রঞ্জন চক্রবর্তী বলে আমি কাউকে চিনি না চিনি—পি, এস-403 কে।

অতসী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, এ হতে পারে না কুনাল। তুমি

ওর সিরিয়াল নম্বরটা পর্যন্ত মুখস্থ রেখেছ অথচ সেটা পজেটিভ না নেগেটিভ, তোমার মনে নেই ?

কুনাল বুঝতে পারে—অসতর্ক মুহূর্তে সে প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, না না, ওটা একটা কথার কথা। রঞ্জন চক্রবর্তীর নম্বর পি, কিউ 304ও হতে পারে। আমি উদাহরণ হিসাবে যাহোক একটা নম্বর বললাম।

অতসী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে কুনাল বললে, অপেক্ষাই যখন করতে হবে তখন একটু 'কফি স্ট্রোক চা' পান করা যাক!

—'কফি স্ট্রোক চা' মানে ?

—অর্থাৎ আমার কফি, তোমার চা!

এতক্ষণে প্রথম হাসল অতসী। বললে, ভোলনি দেখছি!

কুনাল বেল বাজিয়ে ছোকরা-পিয়নটাকে ডাকল, এক কাপ চা আনতে বলল। অর্ডার নিয়ে ছেলেটি চলে যেতেই অতসী বললে, তোমার কফির কথা বললে না ?

—আমি বাড়ি থেকেই নিয়ে আসি। ফ্লাস্কে আছে।

কফিটা কে বানিয়ে দিয়েছে এ কথা জানতে চাইল না অতসী। বরং বললে, ঠাকুরমশায়ের সেই ইন্সটলমেণ্ট শেষ হয়েছে ?

কুনাল বললে, এতদিনে মিটল। এ মাসেই শেষ হচ্ছে।

—যাক, বাঁচলে তাহলে এতদিনে। এবার কি রানাঘাটে চলে যাবে ?

—সেটাই তো পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু বন্দনার তাতে আপত্তি।

এই প্রথম একটি মেয়ের নাম উচ্চারিত হল, যে মেয়েটি একজনের সহোদরা অপরজনের সহধর্মিণী। অতসী বুঝে উঠতে পারে না, পরবর্তী প্রশ্ন করাটা শোভন হবে কিনা। অর্থাৎ কী কারণে ছোটখুকি এতবড় সুযোগটা নিতে চাইছে না। রানাঘাটে কুনালের বাবা পশারওয়ালা ডাক্তার ছিলেন। তাঁর অতবড় পশারটা কুনাল সহজেই হাত করতে পারবে—অনেকেই তাকে চেনেন, ডাক্তার রামতারণ বোসের ছেলে বলে। তাছাড়া বাড়িটাও বড়। হাত পা মেলে থাকতে পারবে। এখানে ঐ এক কামরার দমবন্ধকরা পরিবেশে—

কুনাল নিজে থেকেই বললে, ও কলকাতা ছাড়তে চায় না। কী যে কলকাতার আকর্ষণ, তা ওই জানে।

অনেকক্ষণ থেকেই ইতস্তত করছিল অতসী। শেষমেষ বলেই ফেলল কথাটা, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখাটার মূলে কে ? তুমি, না···

'ছোটখুকি' বলবে না 'বন্দনা', বুঝে উঠতে না পারায় বাক্যটা শেষ করে না। তাতে অবশ্য বুঝতে অসুবিধা হল না কুনালের। সপ্রতিভের মত বললে, যৌথ ইচ্ছাও তো হতে পারে।

অতসী শুধু সংক্ষেপে বলল, ও!

এ নিয়ে শব্দব্যবচ্ছেদে সে রাজী নয়। তা তো হতেই পারে। দুজনের একই রকম ইচ্ছা হওয়াটা অস্বাভাবিক হবে কেন? কুনালের সঙ্গে অতসীর ক্রমাগত মতের অমিল হত। বন্দনার সঙ্গে হয়তো তা হয় না। এটা তো আনন্দের কথা। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হলে তার তো খুশিই হওয়া উচিত।

কুনাল বলতে থাকে, প্রথম দিকে ওরই আপত্তি ছিল। এখন আমার মনে হয় ওর যুক্তিটাই ঠিক।

এবার অতসী কোন কৌতূহল দেখালো না। কুনালই পুনরায় বলে, বন্দনা জানে যে, আমাকে পেলেও আমার গোটা মনটার উপর তার অধিকার বর্তায়নি। সেটা সম্ভবও নয়। ওর সে ক্ষমতাই নেই। আমার যেসব জিনিস ভাল লাগে, যেসব বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে, আলোচনা করতে ইচ্ছা করে ও তার ধারও ধারে না। খবরের কাগজ ও পড়ে না, কোন সাহিত্য পত্রিকাও নয়। অথচ আমিও ওর হাত ধরে ওর 'আনন্দলোকে'র খাশ-বাৎ-এ আনন্দ পাই না। ফলে, সে তোমার বিষয়ে স্বতই আতঙ্কিত।

অতসী বলল, এ খাশবাৎ-এ আমিও কিন্তু আনন্দ পা'চ্ছ না কুনাল।

কুনাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ছোকরা-পিয়ন এক কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করল। কুনাল উঠে দাঁড়ায় কাপটা নিয়ে অহেতুক অতসীর পিছন দিয়ে একচক্কর ঘুরে এসে কাপটা রাখল টেবিলের উপর।

ব্যাপারটা কিন্তু নজর এড়ায়নি অতসীর। বললে, তুমি চায়ের কাপে কী-একটা মিশিয়ে দিলে কুনাল! কী ওটা?

কুনাল হেসে ফেলে। বলে, তোমার মাথার পিছন দিকেও যে দুটো চোখ আছে তা তো জানা ছিল না। ও কিছু নয়, পটাশিয়াম সায়ানাইড। খেয়ে ফেল।

অতসী একটুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর নির্বিকারভাবে কাপটা টেনে নিল। ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে নিয়ে কুনালও চুমুক দেয়।

পানীয় কাপ দুটি শেষ হলে কুনাল উঠল। বলল, বস, দেখে আসি রমেন এসেছে কিনা। ও, ভাল কথা, কালকে তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি তার জবাব দাওনি।

অতসী বললে, সেটা শুনে আমিও একটা প্রতিপ্রশ্ন করেছিলাম—জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কোন অধিকারে এ প্রশ্নটা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ?

—কাল তার জবাব দিইনি। আজ দিচ্ছি। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বলে। যে অধিকারে আমি তোমার চায়ের কাপে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছি বলার পরেও তুমি নির্বিকার চিত্তে ওটা খেয়ে ফেললে, সেই অধিকারে।

অতসী বললে, তুমি হাতে তুলে দিলে বিষ হয়তো খেতে পারি, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা দিয়ে তোমার সুখী জীবন বিষিয়ে দিতে পারি না।

অভিমান। এ অভিমান করবার হক আছে অতসীর। আছে কি? সেই তো ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করে গেছে কুনালকে। এখন এসব সেন্টিমেন্টাল হা-হুতাশের যৌক্তিকতা কোথায়? 'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান', এখন এ উক্তি মেলোড্রমাটিক।

কুনাল সুইং ডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে বসল তার চেয়ারে। তার হাতে একখানা কাগজ। আর যেন চোখে চোখে তাকাতে পারছে না। অতসী ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। কুনাল দেখতে পেল—টেবিলের প্রান্তটা সে শক্ত করে ধরে আছে। অতসী উত্তেজিত। অত্যন্ত উত্তেজিত। বললে, রিপোর্টটা পেয়েছ?

কুনাল অস্ফুটে বললে, ইয়েস! আয়াম সরি!

রিল্যাক্স। অতসী ধীরে ধীরে চেয়ারে পিঠ হেলান দিয়ে বসল। নির্বাক দৃষ্টিতে ঘূর্ণ্যমান সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। কুনাল তাকে লক্ষ্য করছে। সে জানে অতসী অজ্ঞান হয়ে যাবে না, নার্ভাস ব্রেকডাউন তার হবে না। ট্যাবলেটটা এতক্ষণে ওর সারা স্নায়ুতন্ত্রীতে কাজ করছে। কুনালই পুনরায় বললে, একটু আগে বলছিলাম—আমার মনে ঘাঁটা পড়ে গেছে। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে আমার কাছে পার্থক্য কতকগুলো মেটাবলিক সিমটম্‌স্। ভুল বলেছিলাম অতসী। ঐ ছেলেটার জন্য এখন আমার···

কথাটা ওর শেষ হল না। অতসীর দু'গাল বেয়ে নেমে এল ওর অসমাপ্ত পাদপূরণ।

কুনাল বললে, একটু বিশ্রাম কর এখানেই। অফিস আর যেও না। আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব এখন।

অতসী ধীরে ধীরে বলল, শুনেছি ব্লাড-ক্যান্সারের চিকিৎসা নেই এদেশে। সত্যি?

—সত্যি!

—কতদিন ও বাঁচবে বলে আশা কর ?

—বলা শক্ত। যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় ততই তো ভাল। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। চার মাসের বেশি নয়, আগেও হতে পারে।

অতসী শ্রুতিধরের মত বলল: চার মাসের বেশি নয়, আগেও হতে পারে!

আরও কিছুক্ষণ নির্বাক অপেক্ষা করার পর কুনাল বলে, অতসী, আমি তখন তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। তুমি ঠিকই ধরেছিলে। কেসটার কথা আমার অজানা ছিল না। কাল থেকেই আমি জানি, রঞ্জন চক্রবর্তী মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়েছে।

যা আশা করেছিল তা হল না। অতসী জানতে চাইল না, এমন অহেতুক মিথ্যাচরণ কেন করল সে। কুনাল চাইছিল, কথাবার্তা বলে অতসীর স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে, তার মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে। তা হল না। অতসী নিশ্চুপ তাকিয়ে রইল তার দিকে। কৌতূহলী হল না আদৌ। তখন কুনাল নিজে থেকেই আবার বললে, তোমাকে আমি অহেতুক ঐ প্রশ্নটা করেছিলাম, যার জবাব তুমি দিলে না। আমি জানতাম, তুমি প্রচণ্ড একটা আঘাত পাবে। তাই ডাক্তার হিসাবে একটু সাবধান হতে চেয়েছিলাম। ঐ ট্যাবলেটটা আগে খাইয়ে দিয়ে খবরটা দিয়েছি। ঈশ্বরের নামে মিথ্যা শপথ করেছি সেজন্যই।

তবু কোন ভাবান্তর হল না অতসীর। এসব কথার কোনও অর্থ বোধহয় তার কাছে ছিল না তখন। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অতসী যা বলল তার সঙ্গে কুনালের আলাপচারির কোনও প্রাসঙ্গিকতা রইল না। বললে, জান কুনাল, আমার মন বলছিল তুমি পজেটিভ রিপোর্টই পাবে।

—কেন ? এমন সন্দেহ কেন হল তোমার ?

—বোকা ছেলেটা কেন আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিল ?

এবার কুনালকেই চুপ করে যেতে হয়। বুঝে উঠতে পারে না, এমন অন্তরঙ্গ গোপন কথাটা কেন বলছে অতসী। ঐ সঙ্গে তার এ-কথাও মনে পড়ে গেল—দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সে কোনদিন অতসীকে বুকে টেনে নেয়নি।

—একবার নয়। বার বার! গত একমাসে অন্তত দশবার!

এবারে কুনাল একটু অসহায় বোধ করে। এ জাতীয় সংখ্যাতত্ত্ব উঠে পড়তে পারে তা যেন ভাবতেই পারেনি। একটু অবাক হয়। অতসীর ডিলিরিয়াম হওয়ার মত কোন কিছু ঘটেনি। তাহলে এসব কথা উঠছে কেন ?

না, ভিলি'রয়াম নয়। অতসীই রহস্যটা পরিষ্কার করে দেয়। বলে, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমরা দুজনেই অফিস-থিয়েটারে পার্ট নিয়েছি। রিহার্সালের সময় একটি দৃশ্যে রঞ্জন আমাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু···বুঝতে পারছ ···আমার নিঃশ্বাসেই ওর···

বুঝেছে। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেই বিশ্রি সুপারস্টিশান!

কুনাল প্রতিবাদ করে, কী পাগলামি করছ অতসী? তাই কখন হয়? তোমার নিঃশ্বাসে ওর ব্লাড ক্যান্সার হল?

অতসী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে কুনাল আবার বলে ওঠে, থাক অতসী। এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না আমি। বহু তর্ক করেছি। তোমার সংস্কারকে তাড়াতে পারিনি। সে যাই হোক, অন্য কয়েকটি জরুরী কথা তোমাকে বলে নিতে চাই। প্রথম কথা, এইমাত্র যে খবরটা তোমাকে জানালাম সেটা যেন সম্পূর্ণ গোপন থাকে।

—কেন কুনাল?—জানতে চায় অতসী।

—আমরা চাই না, রুগী জানতে পারে তার লিউকেমিয়া হয়েছে। কেন? একটু ভেবে দেখ ব্যাপারটা—

যুক্তি দিয়ে কুনাল বোঝাতে থাকে। অনেক অনেক কথা বলল সে।

এ জাতীয় রোগীকে প্রগ্‌নসিস্‌টা জানানো উচিত কি অনুচিত এ বিষয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দ্বিমত। বহু তর্ক, আলোচনা, লেখালেখির পর তাঁরা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা এই রকম—

লিউকেমিয়ার রোগী দু-জাতের হতে পারে। শতকরা পঁচানব্বই জন হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাদের ক্ষেত্রে রোগের কথাটা গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়। যেদিন রোগ নির্ণয় হল, সেদিন থেকে কয়েকমাসের মধ্যেই রোগীর জীবনাবসান হবে। অনিবার্যভাবে। তার যন্ত্রণার কিছু অবসান হয়তো করতে পার, কিন্তু দুর্বার-বেগে মৃত্যু যে তার কাছে প্রতিটি সেকেণ্ডে এগিয়ে আসছে তা ঠেকাবার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। এক্ষেত্রে ঐ যে-কটা দিন সে বাঁচবে তাকে সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে দেওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়? তার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুর দল যদি ক্রমাগত অশ্রুর বন্যায় তার ঐ সীমিত যাত্রাপথটুকু পিচ্ছিল করে দেয়, তাহলে কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে? তার চেয়ে অনেক অনেক ভাল—খবরটা গোপন রাখা। হয়তো আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুর পক্ষে সেটা কষ্টকর। অন্তর্দ্বন্দ্বে যখন ভিতরে ভিতরে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছ তখন তাদের গান গাইতে হয়, রসিকতা করতে হয়, হৈ-হুল্লোড়ে পরিবেশটা হাল্‌কা রাখতে হয়। কিন্তু এটুকু কষ্ট তোমাকে স্বীকার করতে হবে

—ঐ হতভাগার মুখ চেয়ে—সে আর কদিন? তোমাদের এ যন্ত্রণার অবসান হতে তো আর বাকি নেই! দাও না ওকে একটা সুযোগ—এ কটা মাস হেসে খেতে!

ভেবে দেখ যুধিষ্ঠিরের সেই জবাবটা—'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!' মৃত্যু তোমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। অনিবার্যভাবে। তবু তুমি হাসছ, খেলছ, গান গাইছ, নাচছ। কেন পারছ? যেহেতু তোমার জানা নেই সে দিনটা কবে আসবে। সেই অনিবার্য কালো ঘোড়সওয়ার কতদূরে। ঝরে পড়া কদম্বের কেশর সুগন্ধির আমন্ত্রণ লিপি নিয়ে যে দিন সেই অতিথি এসে দাঁড়াবে তখনই তোমাকে চেনা হতে হবে—তুমি প্রস্তুত কি অপ্রস্তুত সে জানতে চাইবে না। তুমি জান না সে দিনটা কেমন: শিউলি ঝরার শুরুরাত, দক্ষিণের দোলালাগা বসন্ত প্রভাত, হেমন্তের দিনান্ত বেলা, অথবা ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন বাইশে শ্রাবণ।

আর জানা না বলেই সে বিষয়ে তুমি সচেতন নও—নিজেকে অজর অমর বলে ধরে নিয়েছ। হেসে খেলে কাটিয়ে দিচ্ছ জীবনটা। কিন্তু যে মুহূর্তে তোমাকে বলে দেওয়া হল: তোমার জীবনের মেয়াদ এতদিন—অমনি দুনিয়া হারিয়ে গেল তোমার দৃষ্টি থেকে, জেগে রইল শুধুমাত্র সেই কালো ঘোড়সওয়ারের মূর্তিটা। বৃষ্টির ধারা পতনে, তরবারি তেহাইয়ে, সেতারের ঝালায় এবং ঘাড়ের পেশুলামে তুমি শুধুই শুনতে পাবে সেই কালো-ঘোড়সওয়ারের অশ্বক্ষুরধ্বনি—অনিবার্য ভাবে সে এগিয়ে আসছে, তিল তিল করে প্রতিটি ঘণ্টা-মিনিট সেকেণ্ড প্রতিটি খণ্ড মুহূর্তে!

যদি পার, তাহলে ঐ হতভাগাকে মুক্তি দাও এ যন্ত্রণা থেকে। কেন পারবে না? তোমাদের হাতে তো আছে আরও অনেক অনেক শিউলি-ঝরার শুরুরাত, দোলা-লাগা বসন্ত, ঝিল্লিসঘন শ্রাবণসন্ধ্যা অথবা হেমন্তের শিশিরস্নাত প্রভাত। সে সব দিনে তো ঐ হতভাগাটার পায়ের চিহ্ন পড়বে না তোমাদের বাটে, সে তোমাদের আনন্দের পশরায় ভাগ বসাতে আসবে না। তাহলে কেন পারবে না ঐ কটা দিন তাকে হেসে-খেলে গান গেয়ে ফুরিয়ে যেতে?

তাই ডাক্তারবাবুরা বলেন, শতকরা ঐ পঁচানব্বইটি ক্ষেত্রে সংবাদটা গোপন রাখাই বিধেয়।

অতসী এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। বললে, বাকি পাঁচটি ক্ষেত্রে?

—সংখ্যাতত্ত্ব বলছে, বাকি ঐ পাঁচটি ক্ষেত্রে সংবাদটা রোগীকে জানানোই মঙ্গল। তাঁরা ব্যতিক্রম; তাঁরা সাধারণ মানুষ নন। হয় বিজ্ঞান, নয় দর্শন, অথবা ধর্মের মাধ্যমে তাঁরা সাধারণের সমভূমি থেকে স্থিতপ্রজ্ঞের মালভূমিতে

উঠে গেছেন। তাঁরা শান্ত সমাহিত চিত্তে আঘাতটা গ্রহণ করেন। কালো-ঘোড়সওয়ারটা তাঁদের কাছে এসে দাঁড়াতে লজ্জা পায়। আসতে তাকে হয়ই; কিন্তু জানে, তার সবটুকু ভয়াল ভ্রূকুটিই ব্যর্থ। সে এসে দাঁড়ালেই মৃত্যুপথযাত্রী বলে বসবে. এসেছ বন্ধু, নাও হাতটা ধর, আমি প্রস্তুত!

কুনাল ওকে শোনাল অনেক অনেক রোগীর কথা। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসের দেহাবসান হয় ক্যান্সারের আক্রমণে—ব্লাড ক্যান্সার নয় যদিও। শোনাল নির্ভীক বৈমানিক চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গের কথা—সেই যিনি 1927 সালে একা একটি বিমান নিয়ে প্রথম অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন ডাক্তার এল তাঁকে দেখতে। রক্তপরীক্ষা করে দেখা গেল—লিউকেমিয়া। ওঁর মেয়াদ আর ছয় মাস। ডাক্তারবাবু জনান্তিকে মিসেস্ লিণ্ডবার্গকে ডেকে বলেছিলেন, খবরটা ওঁর কাছ থেকে গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়।

রাজী হতে পারেননি মিসেস লিণ্ডবার্গ। বলেছিলেন, আমি জীবনে কোন কিছু তাঁর কাছ থেকে গোপন করিনি। আজও করব না। তাঁকে আমি চিনি। তাঁকে সব কথা খুলে বলাই ভালো।

তাই হয়েছিল। চার্লস লিণ্ডবার্গ শুনে বলেছিলেন, খবরটা আমাকে জানিয়ে খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ, অ্যান। ছ-মাস সময় তো অনেক। ছেলে-মেয়েদের টেলিগ্রাফ পাঠাও। সকলকে একবার শেষবারের মত দেখে যাব। আর আমার আত্মজীবনীটাও শেষ করতে হবে।

কালো ঘোড়সওয়ারটা লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল সেদিন।

রঞ্জন চক্রবর্তী সেজাতের মানুষ নয়। সে রামকৃষ্ণও নয়, চার্লস লিণ্ডবার্গও নয়।

অতসী স্বীকার করল এই যুক্তি।

কুনাল বলল, আর একটা কথা অতসী। সেই কথাটা বলবার জন্যই তোমাকে বিশেষ করে ডেকেছি। আর সেজন্যই গোপন কথাটা তোমাকে জানালাম। আংলে রঞ্জনের দাদা-বৌদিকেও খবরটা জানানো হয়নি। তাঁরা হয়তো সব জেনেশুনে অতবড় অভিনয় করতে পারতেন না। একথা জানেন শুধু ঐ ঠাকুর মশাই, তুমি আর আমি। বুঝলে?

অতসী বললে, বিশেষ কথাটা কী? কী জন্যে আমাকে একথা জানালে?

কুনাল একটু অপেক্ষা করল। তারপর যেন মনস্থির করে বলল, না, ঢুলকো

লোকলজ্জার দোহাই দিয়ে আমরা যদি নীরব থাকি তাহলে সেই হতভাগার প্রতি অবিচার করা হবে—

—কী বলতে চাইছ তুমি ?

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে বসে কুনাল। অতসীর হাতখানা তুলে নিয়ে দুটি মুঠিতে বন্দী করে। আবেগঘন কণ্ঠে বলে, অতসী! একমাত্র তুমিই পার ওর এই তিনমাসের জীবনটাকে আনন্দঘন করে তুলতে। সার্থক করে তুলতে।

ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে, তোমার তাতে কিসের আগ্রহ ?

কুনাল বললে, জানি না আমার মুখ থেকে কথাটা তুমি কী ভাবে নেবে। আমি খুশি হব, যদি ঐ চব্বিশ বছরের কবিটা একেবারে খালি হাতে বিদায় না নেয়।

অতসী ওর চোখে চোখে তাকায়। জবাব দেয় না। কুনালই পাদপূরণ করে, আমি খুশি হব, যদি ঐ চব্বিশ বছরের ছেলেটা একেবারে খালি হাতে তোমাকে ফেলে রেখে না যায়। আমি যা দিতে পারিনি···

অতসী উঠে দাঁড়ায়। কুনাল বলে, বস। আরও কয়েকটা কথা বলে নিই। তোমার জানা থাকা ভাল। তোমাদের ঠাকুরমশাই লোকটা যতবড় পাষণ্ডই হন, এক্ষেত্রে বদান্যতা দেখিয়েছেন। তিনি রঞ্জন চক্রবর্তীকে তাঁর কারবারে ম্যানেজারের পদে বহাল করেছেন। পাঁচশ টাকা মাস মাহিনায়। পার্মানেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট। অবশ্য তিনি জানেন, মাস তিন-চারের বেশি মাইনে যোগাতে হবে না তাঁকে। রঞ্জন একটু সুস্থ হলেই তার এই নতুন চাকরির কর্মস্থলে চলে যাবে।

—সেটা কোথায় ? কতদূর ?

—ঠিক জানি না। উড়িষ্যায়। শুনেছি চক্রধরপুর থেকে বাসে যেতে হয়। সরাইকেল্লার কাছাকাছি।

—এ অবস্থায় কি ওর সেখানে গিয়ে থাকাটা উচিত হবে ? সেখানে ডাক্তার বদ্যি···

—ডাক্তার-বদ্যির কোনও প্রয়োজন ওর আর হবে না অতসী।

—কিন্তু একেবারে একা-একা···

—একেবারে একা একা নাও .তা হতে পারে! হয়তো ওর কোনও বান্ধবী রাজী হয়ে যাবে 'ঐ কটা দিন সুধায় ভরে দিতে!' এমন কোনও বান্ধবী ওর নেই, এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন ?

অতসী অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর তার আয়ত চোখ দুটি কুনালের দিকে মেলে ধরে বললে, তুমি কি ব্যঙ্গ করছ কুনাল ?

কুনাল সত্যই লজ্জা পেয়ে বলে, আয়াম সরি।

কেন জানে না, অতসী হঠাৎ বলে বসল, এ থেকে প্রমাণ হয় আমাদের গেছে যে দিন, একেবারেই তা গেছে, কিছু বাকি নেই—

কুনাল অবাক হয়ে বলে, হঠাৎ এ কথা কেন?

অতসী অসতর্কভাবে বলে বসল, 'লাভ-স্টোরি'র সেই অনবদ্য উক্তিটা:

—Love means not ever having to say you're sorry!

॥ ৯ ॥

অহেতুক কেন যে দুদিন কামাই করল তার মানে নেই। বাড়ি বসে থাকলেই কি মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে? ঐ নিবান্ধব বাড়িতে? বড়মামা জানতে এসেছিল, শরীর-গতিক কি ভাল লাগছে না রে অতু? অতসী এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েঞ্জামত হয়েছে। দু-দিন চুপচাপ শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে।

বড়মামা বিশ্বাস করেছিল। চুপচাপ বাড়িতেই পড়ে ছিল। কোথাও যায়নি। ওর ডায়েরি লেখার বাতিক। বড়মামা দুটো নাকে-মুখে গুঁজে কোথায় বেরিয়ে যেতেই ও খুলে বসত পুরানো দিনের ডায়োরিগুলো, হারিয়ে যাওয়া-দিনের চিঠিপত্র। এ কয়মাসের অনুভূতিগুলো লিখত দিনপঞ্জিকার পাতায়।

এতদিনে ও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্রের নির্দেশ। না মেনে উপায় নেই। উপর্যুপরি এতগুলি ঘটনা কাকতালীয় হতে পারে না। এ কথা কেমন করে অস্বীকার করবে—যে এসেছে অতসীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সে জলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। শেষ উদাহরণ ঐ আধ-পাগলা ছেলেটা! তার বৌদিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল টেলিফোনে জানাবে। কথা রাখতে পারেনি। মিথ্যা কথা বলবার মতো দাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। যা পারেন ঠাকুরমশাই করবেন। কুনাল তো বলছে, খবরটা ওঁদের এখনই জানানো হচ্ছে না।

বুধবার অফিসে যেতেই প্রমীলা বলল, কী খবর অতসীদি? দুদিন আসেননি যে? জ্বর-জ্বারি হয়নি তো?

...জ্বরই হয়েছিল। আজ ভাত খেয়েছি।

—এদিককার লেটেস্ট খবর শুনেছেন নিশ্চয়? অফিসের খবর—?

—না, কী?

—'মাটির ঘর' ধসে গেছে। থিয়েটার পোস্টপোনড্!

—তাই নাকি! কেন, কি হল আবার?

জয়ন্তী শোধ আগ বাড়িয়ে শুনিয়ে দিল বড়বাবুর ডায়ালগ—

"আমার জামাই, আমার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল কল্যাণ মরে যাচ্ছে! অথচ আমার চোখে জল নেই—একী বিপদ! কাঁদো সত্যপ্রসন্ন, দয়া করে একটু কাঁদো! না কাঁদলে লোকে যে তোমার নিন্দা করবে।"

রেখা বিশ্বাস যথারীতি খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে।

আর অতসী ভীষণ চমকে ওঠে। বলে, কে? কে মারা গেছে।

প্রমীলা অতসীর হাতখানা চেপে ধরে বলে, কী হল। আপনি অমন করছেন কেন? না, না মারা যায়নি কেউ। রঞ্জনবাবু রিজাইন দিয়েছেন।

অতসী কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে, ও! তাই বল!

—হ্যাঁ, কাল উনি এসেছিলেন। আপনার খোঁজ করেছিলেন। উনি মধ্যপ্রদেশ না উড়িষ্যায় কোথায় যেন একটা ভালো চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছেন—

অতসী বলল না। জয়ন্তীরই বলল কথাটা, পিস অব গুড নিউজ।

অতসী বলে, কাল সে এসেছিল বুঝি? কবে যাচ্ছে বলল?

—তা তো জানি না। আপনার হোম-অ্যাড্রেস নিয়ে গেছেন।

কথা ঘোরাবার জন্য অতসী বলে, বড়বাবু শুনে কি বললেন?

জয়ন্তী বললে: 'হেড-অফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত। তাঁর যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখন জানত?' রঞ্জনবাবু রিজাইন দিয়েছেন শুনেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সিলিং ফ্যানটার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে নাটকের শেষ ডায়ালগটা আউড়ে গেলেন, "স্টুপিড! তুমি স্টুপিড! আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি—আমাকে তুমি কাঁদাও! আমি কাঁদব না—আমি কাঁদব না।"

রেখা বিশ্বাস যেন তন্দ্রায় রোল করছে ঐ দৃশ্যে—'তন্দ্রা খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।'

একটু পরে অতসী নিজেই উঠে গেল বড়বাবুর কাছে। ছুটির দরখাস্তটা হাতে হাতে দিতে। বড়বাবু বললেন, স্যাড কেস অতসী। 'কল্যাণ' আমাদের ছেড়ে গেল।

অতসী বলল, 'স্যাড কেস' কেন হবে বড়বাবু? শুনছি সে ভাল চাকরি পেয়েছে। এ তো আনন্দের কথাই।

—না, হ্যাঁ; তা তো বটেই। যেখানে জয়েন করছে সেখানে কোনও 'ড্রামাটিক ক্লাব' থাকলে তাদের তো লাভই। আমাদের তো লোকসান হল। আমি আপাতত 'মাটির ঘর' পোস্টপোণ্ড করেছি।

অতসী বললে, তা তো করতেই হবে। আমি কিন্তু আজ অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলাম বড়বাবু—

—বল মা ?

—আমি দিন-সাতেকের ছুটি চাইতে এসেছিলাম। আগামী সপ্তাহটা। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, মন-মেজাজও ভাল নেই। সাংসারিক অশান্তি। হপ্তা-খানেক পুরী কি দার্জিলিঙ ঘুরে আসব।

—থিয়েটার যখন পিছিয়ে গেল তখন আমার আর অসুবিধা কি ? তবে দার্জিলিঙ এখন যেও না। বর্ষা নেমে গেছে সেখানে। পুরী অবশ্য যেতে পার। আরও একটা সাজেশান দিতে পারি—পশুপতিনাথ ঘুরে এস বরং। ঐ যে কুণ্ডু স্পেশ্যাল না কুণ্ডু ট্রাভেলস কি যেন আছে, ওরা যাচ্ছে।

অতসী বললে, কোথায় যাব ভেবে দেখিনি। দিন পাঁচ-সাত কোথা থেকে ঘুরে আসব ভেবেছি।

এ সিদ্ধান্তটা কাল রাতে নেওয়া। শরীর নয়, মনের উপর হঠাৎ চাপ পড়েছে ওর। অপ্রত্যাশিত কতকগুলো ঘটনা পর পর ঘটে যাওয়ায়। রঞ্জনের অসুস্থতা, কুনালের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা রঞ্জন চক্রবর্তীর মৃত্যু পরোয়ানা। সেই ছেলেটার মুখোমুখি হলে সে কী করবে, কী বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না। শুধু সেই ছেলেটাই বা কেন—তার দাদা, বৌদি, ভাইঝির। তাঁরা তো কেউ কিছুই জানেন না এখনো। অতসী জানে। জেনেও তাকে না-জানার অভিনয় করতে হবে। শুধু তাই নয়, অতসী জানে—রোগটার মূলে সে নিজেই।

সারাদিন আজও ঘোরের মধ্যে কাটল। তবে অফিসে কাজের চাপ ছিল। বেশ কিছু ডিক্টেশন নিতে হল। সারাটা দুপুর খটাখট্ করে তা শেষও করতে হল। আজ বারে বারেই ভুল বোতামে আঙুল চলে যাচ্ছে। দু-একখানি চিঠিতে এত বেশি ভুল হল যে, নিজেই রিটাইপ করল। বার দুয়েক সাহেবকে বলতে হল, 'বেগ-য়োর পার্ডন, স্যার ?'

নজর করে দেখল—ভারতের সিংহাসনের মত ডেস্‌প্যাচ সেক্‌শানের চেয়ারটাও খালি নেই। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসে আছেন। সে কার ভাইপো ভাগ্নে জানবার কৌতূহল হল না। ঘড়ির কাঁটাটা অপরাহ্ণে যথারীতি ক্লান্তিতে ঢলে পড়ল।

ছুটির মুখোমুখি হঠাৎ চমকে ওঠে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বরে, বাঃ। বেশ লোক তো মশাই আপনি! খুব ঘোরালেন নাকে দড়ি দিয়ে।

অতসী টাইপ-রাইটারের উপর থেকে মুখ তুলে দেখে—ভিজিটার্স চেয়ারে বসে আছে রঞ্জন। এক নাগাড়ে বলে চলেছে—খুঁজে খুঁজে বাড়ি পেলাম তা মাল্‌কিনকে দেখতে পেলাম না। অফিস বলে—ছুটিতে আছেন, তো বাড়ির লোক বলে—অফিসে আছেন।

প্রমীলা পট্টনায়ক বলে, জ্বর থেকে উঠেছেন। এত ঘোরাঘুরি নাই করতেন?

অতসী জবাব দিল না। তার চোখে বোধ হয় কাঁকর পড়েছিল। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে রুমালটা বার করে চোখটা মুছে নিল।

রঞ্জন বললে, বাঃ, কাল-বাদে পরশু দেশান্তরী হচ্ছি। অতসীদির সঙ্গে দেখা না করে গেলে চলে?

এতক্ষণে কথা বলল অতসী, ঠিকই বলেছে প্রমীলা! অসুস্থ শরীরে এত দৌড়াদৌড়ি করা ঠিক নয়। শনিবারেই তো প্রথম ভাত খেয়েছ।

রঞ্জন প্রমীলাকেই সাক্ষী মানে, দেখুন প্রমীলাদি! অতসীদির কাণ্ড দেখুন। যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।

জয়ন্তী ঠাট্টা করে বলে, কী করবেন বলুন রঞ্জনবাবু? এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম! তা বড় চাকরি পেলেন, আমাদের খাওয়ালেন না?

—নিশ্চয়ই! কী খাবেন বলুন?

প্রমীলা বলে, না না, আজই নয়। আপনি জয়েন করুন। মাইনে হাতে পান। এরপর যখন কলকাতায় আসবেন তখন খাওয়াবেন। আমরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না?

রঞ্জন বললে, না প্রমীলাদি, কথাটা যখন উঠেছে তখন মিটিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল। আবার কবে দেখা হবে কে জানে? মানুষের জীবন তো পদ্মপত্রে নীর।

অতসী রীতিমত চমকে ওঠে! বলে, ও আবার কি কথার ছিরি?

রঞ্জন শুনল না। বংশীকে ডেকে একটা দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বললে, সিঙাড়া আর সন্দেশ নিয়ে এস তো ভাই, আর চা।

বংশী বলে, চা-টা ফ্রি রঞ্জনদা। ওটা আমি খাওয়াচ্ছি আপনাকে। আপনার ফেয়ারওয়েল।

অগত্যা চা এল, সিঙাড়া-সন্দেশ এল। হৈ হৈ করল সবাই।

সন্দেশ যে এত তেতো হয়, অতসীর কল্পনায় ছিল না।

ছুটির পর রঞ্জন বললে, চলুন অতসীদি, আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

—বেশ তো, এস।

অফিস থেকে বাইরে এসে রঞ্জন বললে, সেই চায়ের দোকানটায় যাবেন?

—কেন? এইমাত্র তো সন্দেশ-চা খাওয়ালে।

—না, মানে, কিছু গল্প-গুজব করতাম। কতদিন আবার দেখা হবে না—

—আচ্ছা চল, আমারও এখন হাতে কোন কাজ নেই।

আবার ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে এস্‌প্ল্যানেড অঞ্চলে, সেই দোকানটিতে। রঞ্জনই এক নাগাড়ে বক্‌বক্ করে চলেছে। বেশ মনে হল ওর ছন্নছাড়-ফোঁড়া সৌভাগ্যটাকে ও যেন এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। ঠাকুর-মশাই যে হঠাৎ এমন একটা প্রস্তাব করে বসবেন, এটা সকলের কাছেই বেশ অভাবনীয় মনে হয়েছে। সোমবার বিকেলে ঠাকুরমশাই এসেছিলেন ঐ ব্লাড রিপোর্টটা নিয়ে। রক্তে কিছুই পাওয়া যায়নি। নিতান্ত কথার পিঠে কথা। রঞ্জন বলেছিল, সে সোমবারেই চাকরিতে জয়েন করবে। তাতে ঠাকুরমশাই বললেন, কলকাতা তোমার স্যুট করছে না রঞ্জন। তুমি কোথাও চেঞ্জে যাও। বেশ স্বাস্থ্যকর কোন জায়গায়। স্যাচারালি রঞ্জন বলেছিল, কত খরচ! আর তখনই উনি একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়ে বসেন, চক্রধরপুরের কাছে ওঁর নিজেরই একটা কাঠ-চেরাই কলে রঞ্জনের চাকরি হতে পারে। বুঝুন কাণ্ড!

অতসী বাধা দিয়ে বলে, রিপোর্টটা কই?

—দাদার কাছে আছে বোধ হয়। সেটার আবার কি দরকার হবে?

অতসী একটু অবাক হয়ে যায়। বলে, ডক্টর কুনাল বোসের সই আছে রিপোর্টটায়?

এবার অবাক হবার পালা রঞ্জনের। সে প্রতিপ্রশ্ন করে, কেন বলুন তো?

অতসী নিজেকে সামলে নেয়। বলে, আমি গিয়েছিলাম ডক্টর বোসের ল্যাবরেটারিতে, তোমার ব্লাড-রিপোর্টটা চেয়েছিলাম। উনি দিলেন না। বললেন, আপনারা নিলেই তো হারিয়ে ফেলবেন, ওটা আমার কাছে থাক, রঞ্জন চক্রবর্তীর ফাইলে। ভবিষ্যতে আবার রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হলে কম্‌পেয়ার করতে পারব।

রঞ্জন অবাক হয়ে বললে, আরে-আরে-আরে! আশ্চর্য কোয়েন্সিডেন্স তো! ঠিক ঐ ঘটনাই যে সোমবার বিকালে আমাদের বাড়িতে ঘটল। প্রায় একই জাতের কথোপকথন—

—কি রকম?

—এতক্ষণে মনে পড়েছে। ব্লাড-রিপোর্টটা দাদার কাছে নেই, আল্টিমেট্‌লি ওটা ঠাকুরমশায়ের কাছেই রয়ে গেল। উনি রিপোর্টটা দাদাকে দেখালেন। দাদা বললে—ও দেখে আমি কী বুঝব? ডক্টর বোস কী বললেন বলুন? তাতে

ঠাকুরমশাই বললেন, উনি বলেছেন—'রক্ত নির্দোষ। কতকগুলো ক্যাপসুল আর একটা টনিক দিচ্ছি। এগুলো খেলেই ভাল হয়ে যাবে।' দাদা যখন ঐ ব্লাড-রিপোর্টটা হাত বাড়িয়ে নিতে চাইলেন, তখন ঠাকুরমশাই ঠিক ঐ কথাই বললেন —'তুমি ভুলো মানুষ, কোথায় ফেলতে কোথায় ফেলবে, এটা আমার কাছেই থাক। ভবিষ্যতে আবার যদি কখনও রক্ত পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয় তখন এটা তুলনা করে দেখার দরকার হবে।' এই বলে রিপোর্টটা ওঁর পকেটেই রাখলেন!

অতসী বললে, এটা তোমার কাছে কোয়েন্সিডেন্স মনে হল রঞ্জন? আমার কাছে তো ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে। ডক্টর বোস আমাকে দিলেন না, নিজের ফাইলে রাখলেন, অথচ ঠাকুরমশাই—

বাধা দিয়ে রঞ্জন বলে, আপনি দেখা করার পরে নিশ্চয় ঠাকুরমশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং ওটা নিয়ে আসেন—

—তাই হবে। —অতসী প্রসঙ্গটা চাপা দেয়।

বয় দু'পেয়ালা চা দিয়ে গেল।

রঞ্জন পকেট থেকে সিগ্রেট-দেশলাই বার করল। দুজনেই কিছুটা চুপচাপ। শেষে রঞ্জন বললে, আপনাকে আজ খুব গম্ভীর গম্ভীর লাগছে। কী ভাবছেন এত?

—কই, কিছু না তো!

—মনটা খারাপ?

—কে বলল?

—আমি! এবং এও জানি, কেন আপনার মন খারাপ!

—তাই নাকি? তুমি যে দৈবজ্ঞ হয়ে উঠেছ দেখছি। বল তো কেন?

—আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছি বলে!

অতসী কষ্ট করে হাসল। বলল, নিজেকে বড় বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছ রঞ্জন!

—তা হয় তো দিচ্ছি। কিন্তু এই কদিনে আপনার পরিবর্তনটা বেশ লক্ষণীয়।

অতসী কথা ঘোরায়। বলে, সেটা তো তোমার তরফেও সত্য। তুমি আবার আমাকে 'অতসীদি' বলছ, 'আপনি-আপনি' করছ!

—তা তো করতেই হবে আপনি তো আর আমার 'তন্দ্রা' নন! 'কল্যাণ'-এর মৃত্যু পরোয়ানা তো ঘোষিত হয়ে গেছে—

—মৃত্যু পরোয়ানা!

—নয়? আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। 'কল্যাণ' করছি না। 'মাটির ঘর' ধসে গেছে। ফলে আপনি আবার 'অতসীদি' হয়ে গেছেন।

আশ্চর্য ছেলেটা! ও যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আবার কিছুক্ষণ নীরবে চা-পানের পর রঞ্জন বলে, ছুদিন কামাই করলেন কেন? জ্বর হয়েছিল?

—হ্যাঁ, শরীরটা ভাল নেই। আজ ছুটি নিলাম। দিন-সাতেকের। আগামী সোমবার থেকে। ভাবছি কদিন কোথা থেকে ঘুরে আসব।

—কোথায় যাবেন?

—তা এখনও ঠিক করিনি। জামসেদপুরে আমার এক বান্ধবী আছে। কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। ওর বর টাটায় এঞ্জিনিয়ার। একটা বাচ্চা হয়েছে। অনেক দিন থেকে লিখছে ওদের ওখানে যেতে। ভাবছি কদিন ঘুরে আসব।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ওঠে রঞ্জন, জামসেদপুর। ভি-লা-গ্র্যাণ্ডি! শুনুন। আমি শনিবার ইস্পাত এক্সপ্রেসে যাচ্ছি। আমি যাব চক্রধরপুর। মানে টাটানগরের পরের স্টেশান। চলুন, আমার সঙ্গে একই ট্রেনে। বেশ হৈ হৈ করতে করতে যাওয়া যাবে। চাই কি আমিও আপনার সঙ্গে টাটানগরে নেমে পড়তে পারি। আপনাকে বান্ধবীর বাড়িতে পৌছে দিয়ে নেক্সট ট্রেনে অথবা বাসে চক্রধরপুর চলে যেতে পারি।

অতসী হেসে ফেলে। বলে, বান্ধবীর কাছে তোমার কী পরিচয় দেব?

—কেন? যা সত্যি পরিচয়। আমি আপনার অফিসে কাজ করতাম। এখন নতুন চাকরি পেয়ে মাজুডিহি যাচ্ছি—

—কোথায় যাচ্ছ?

—মাজুডিহি। একটা সাঁওতালী গ্রাম। খড়খাই নদীর ধারে।

—সেখানে কী আছে?

—ঠাকুরমশাই জঙ্গল ইজারা নিয়েছেন। ওঁর একটা কাঠ-চেরাই-এর কারখানা আছে। জঙ্গল থেকে শালের লগ আসে, চেরাইকলে সাইজ-মত কাটা হয়। তারপর নানান জায়গায় চালান যায়—টাটানগর, চক্রধরপুর, মায়—রাউরকেল্লা। আমি তার ম্যানেজার হিসাবে জয়েন করতে যাচ্ছি। পাঁচশ টাকা মাইনে আর ফ্রি কোয়ার্টার্স।

অতসী চায়ে চুমুক দিয়ে সংক্ষেপে বললে, বোকা ছেলে! পুরুষমানুষকে তার মাহিনার অঙ্ক আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তার বয়স প্রকাশ্যে বলতে নেই, জান না?

কথা রঞ্জন বললে, বা-রে! বাইরের লোককে তো বলতে যাইনি! এখন আসল কথাটা বলুন, আমার সঙ্গে একই ট্রেনে যাবেন? দ্য লাস্ট রাইড টোগেদার?

অতসী বলে, কাজিল ছেলে! তা কেমন করে সম্ভব? আমার ছুটি তো সোমবার থেকে। তুমি যাচ্ছ শনিবার—

—বেশ, আমি তাহলে রোববার সকালের ট্রেনে যাব।

হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল অতসী। বেশ! তাই সই!

—ভে—রি গুড! আপনি সত্যিই ভা—রি ভালো!

॥ ১০ ॥

দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার!

কথাটা কিন্তু রঞ্জনের কণ্ঠে মেলোড্রামাটিক লাগেনি—কারণ সে তো ঐ চতুর বাক্য প্রয়োগের—যে অর্থে অতসী গ্রহণ করেছিল—রহস্যটা জানে না।

কিন্তু অতসী রাজী হয়ে গেল কেন? ক্ষতিই বা কী? অনেকদিন ধরেই রমলা ওকে লিখছে কয়েকদিনের জন্য টাটানগর ঘুরে আসতে। রমলা ওর সহপাঠিনী। একই বছরে বি. এ. পাস করে। রমলার স্বামী বিভাসও তার অপরিচিত নয়। কলেজজীবন থেকেই ওদের মেলামেশা, আর সেটা অজানা ছিল না অতসীর। বিভাসবাবুও ওকে বলেছিলেন—সেবার মিঠুর বিয়েতে যখন দেখা হল—কদিন ঘুরে আসবেন চলুন না জামসেদপুরে? আমাদের বোরিং লাগে—কিন্তু সপ্তাহ-খানেকের জন্য যারা যায়, তাদের ভালই লাগে। একদিন তোপ-চাঁচিতে কিংবা রিভার্স-মাউথে পিকনিকও করা যাবে।

সে নিমন্ত্রণ প্রায় তামাদি হয়ে যাবার জোগাড়। তারপর ওদের একটা বাচ্চা হয়েছে। রমলা তার ফটো পাঠিয়েছে। এতদিনে তার বছর-খানেক বয়স হল। অতসী অনেকবারই ভেবেছে সপ্তাহান্তের সঙ্গে দু-একদিন ছুটি নিয়ে ঘুরে আসবে—কিন্তু ঐ বড়মামার জন্য হয়ে ওঠেনি। এবার সে মনস্থির করে ফেলল। বড়মামা আপত্তি করল না। বরং বলল, তুই ঘুরে আয়, আমি ঠিক চালিয়ে নেব। অতসী সামনে পাঞ্জাবী হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দিয়ে গেল। অগ্রিম টাকাও কিছু দিয়ে গেল হোটেল মালিককে। সাবধান করে দিতে ভুলল না—বাবু টাকা ধার চাইলে দেবেন না, তবে দুবেলা উনি খেয়ে যাবেন, যতদিন আমি না ফিরে আসি।

সর্দারজী বলাই গাঙ্গুলীকে ভাল মতই চেনে; জানে অতসীকে—পাড়ার উপাজনক্ষম দিদিমণি বলে। সে নিশ্চিন্ত করেছিল, আপ বে-ফিকর রহিয়ে দিদি। বলাইবাবুর কুছু অসুবিধা হোবে না।

রবিবার ভোরবেলার ট্রেন। সুটকেস গুছিয়েই রাখা ছিল। ঘর-দোর বন্ধ-ছন্দ করে মামাকে যাবতীয় নির্দেশ দিয়ে অতসী যখন রওনা হল তখনও ভালো করে সকাল হয়নি। বলাই গাঙ্গুলী বললে, কবে ফিরছিস?

—দিন সাতেকের মধ্যে। পৌঁছে চিঠি দেব।

—ঠিক আছে, আয়। দুর্গা দুর্গা।

সকালের হাওড়া স্টেশন তখন ফাঁকা ফাঁকা। বারো নম্বর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল রঞ্জন। বললে, তাড়াহুড়ার কিছু নেই। ট্রেন ফাঁকা।

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওরা ট্রেনে এসে উঠল। সত্যই ট্রেনটা এখনও ফাঁকা। জানলার ধারে সুবিধামত বসল অতসী। রঞ্জন বসল মুখোমুখি। বললে, সকালে নিশ্চয় কিছু খেয়ে আসেননি। তাতে অসুবিধা নেই। বৌদি লুচি তরকারী করে দিয়েছেন।

অতসী বললে, আমি সন্দেশ নিয়ে এসেছি।

—ভি লা-গ্র্যাণ্ড! লুচি-তরকারী-সন্দেশ! দাঁড়ান ট্রেনটা ছাড়ুক জল আছে সঙ্গে?

—না তো?

—আমার কাছে আছে, তাছাড়া এটা করিডর-ট্রেন। 'ডাইনিং কার'ও আছে।

ট্রেন ছাড়ল। এতক্ষণে সকালের আলো বেশ ফুটেছে। ট্রেন ছাড়ায় মুখোমুখি বেশ কিছু যাত্রী উঠেছে। দু-চারটি ভেণ্ডারও আসতে শুরু করেছে। টফি-লজেন্স, চিকনি-তালা, গল্পের বই, ফাউন্টেন পেন। অনেক অনেকদিন পরে অতসী দূরপাল্লার ট্রেনে চেপেছে। ইতিমধ্যে দু'চারবার লোকাল ট্রেনে কাছাকাছি যেতে হয়েছে বটে; কিন্তু দূরের যাত্রার সুযোগ আসেনি।

—যাঁর কাছে যাচ্ছেন তিনি আপনার ক্লাসফ্রেণ্ড?

—হ্যাঁ। আমরা একই কলেজ থেকে বি. এ. পাস করি। ওর স্বামী টাটায় এঞ্জিনিয়ার। সেও আমাদের কলেজে পড়ত—বছর দুয়েকের সিনিয়ার।

—তার মানে প্রেম করে বিয়ে?

—হ্যাচারালি।

রঞ্জন বলে, কলেজ জীবনে আপনার কোন ছেলের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম হয়নি?

অতসী তাকিয়ে দেখল ওর দিকে। না, কোনও কৌতুকের আভাস নেই, ফাজলামিও নেই। স্রেফ কুশলপ্রশ্ন করার মতো নির্বিকার। যেন কলেজে ওর ফষিনেশন কী ছিল জানতে চাইছে। অতসী বলল, হয়েছিল। ধোপে-টিকল না।

—ও! আমারও হয়েছিল, জানেন। তবে একতরফা। মানে, আমিই মেয়েটাকে ভালবাসতাম, সে আমাকে পাত্তা দেয়নি!

—প্রেম নিবেদন করেছিলে কোন দিন?

—দু—র! সাহসই হল না। বড়লোকের মেয়ে যে।

—তা অত উঁচু নজর করতে গেলে কেন? মধ্যবিত্তঘরের একটা ফুটফুটে মেয়ের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করলেই পারতে।

—ওই তো মুশকিল! প্রেম জিনিসটা ওরকম হিসেব করে করা যায় না।

—ভারি মুশকিলের কথা। 'যার যাতে মজে মন', তাই নয়?

রঞ্জন এক ঠোঙা চিনেবাদাম কিনল। অম্লানবদনে ঠেলে দিল আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকা অতসীর কোঁচড়ে। আর নির্বিবাদে টুকিয়ে টুকিয়ে খেতে থাকে। ব্যাপারটা হয়তো সামান্যই, কিন্তু অতসী ব্যাপারটাকে বুঝে নিতে চাইল। অনাত্মীয় প্রায় সমবয়সী মহিলার কোল-আঁচড়ে এভাবে চিনেবাদাম ঢেলে দিয়ে খুঁটে খুঁটে খাওয়া যে রুচিসম্মত নয়, তা কি ও জানে না? যদি না জানে তবে তার ব্যাখ্যা—ও এখনও রীতিমতো ছেলেমানুষ। এমন ছেলেমানুষের পক্ষে আসন্ন মৃত্যুর সংবাদটা সহ্য করা অস্বাভাবিক; অর্থাৎ ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কুনাল। আর যদি এটা ওর জানা থাকে, তবে তার এক মাত্র ব্যাখ্যা—অতসীকে সে নিতান্ত আপনজন বলে ভাবতে শিখেছে। আমরা যেমন দিদির কোলে চিনেবাদাম ঢেলে দিয়ে বলি, খা না।

হঠাৎ আবার বলে, আচ্ছা অতসীদি, আপনি সেই যে ছেলেটিকে ভালবেসে ছিলেন তার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম খোপে টিকল না কেন? ছেলেটাই কেটে পড়ল, না আপনি সরে এলেন?

অতসী বলে, তোমার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় ছেলেটার দোষ ছিল না, আপনি তাকে পাত্তা দেননি।

—কেন? এমন ধারণা হল কেন তোমার?

—এমনিই। বলুন, ঠিক বলেছি কি না?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। সে আমাকে বিয়েই করতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি।

—দেখলেন! কী দারুণ প্রেডিক্ট করেছি! কিন্তু কেন? প্রেম-ট্রেম করতে পারলেন, অথচ বিয়ে করতে রাজী হলেন না কেন?

—সব কথা তোমাকে কেন বলতে গেলাম?

—না, মানে এমনিই জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, সে ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন?

—হ্যাঁ, বছর দেড়েক।

—এখনও আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

—কালই হয়েছিল।

—এখন তাঁর অ্যাটিচুড কেমন?

অতসী হেসে ফেলে। বলে, আরে, তুমি কি আমাকে কাঠগড়ায় আসামী পেলে নাকি?

রঞ্জন এক টিপ বাল-মুন মুখগহ্বরে ফেলে বলে, না, মানে আমার জানতে ইচ্ছে করে—বিয়ের পরে, প্রাক্তন-প্রেমিকার সঙ্গে লোকে কেমন ব্যবহার করে।

অতসী জবাব দিল না। ট্রেন খড়্গপুরে পৌছালো। ওদের পাশের বেঞ্চির একদল লোক নেমে গেল। রঞ্জন বললে, এবার ব্রেকফাস্টটা সেরে নেওয়া যাক অতসীদি।

কথাটা ঘুরে ফিরেই জেগে উঠছে অতসী'র মনে: দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার! প্রাণচঞ্চল ঐ ছেলেটাকে ছেড়ে সে নেমে যাবে পরের স্টেশানে, আর তার সঙ্গে জীবনে দেখাই হবে না। বিদায় নিতে হবে শান্ত অচঞ্চলভাবে—ও যেন বুঝতে না পারে—এই ওদের শেষ সাক্ষাৎ। ও হয়তো বলবে, 'চিঠিপত্র লিখলে জবাব দেবেন তো'? অথবা, 'চলুন না অতসীদি, নেক্সট পুজোর ছুটিতে একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাই'।

কী জবাব দেবে অতসী?

ট্রেন একটা বড স্টেশানে প্রবেশ করছে। অতসী বললে, টাটানগর এসে গেল নাকি? মুখ বাড়িয়ে কী দেখে নিয়ে রঞ্জন বললে, হ্যাঁ। কী? আপনার সঙ্গে নেমে পড়ব? এখনও বলুন?

অতসী তো পাগল নয়? অনাত্মীয় একজন যুবককে নিয়ে বান্ধবীর বাড়ি হাজির হবে। বললে, তা হয় না রঞ্জন। ওরা কী ভাববে?

—কী আবার ভাববে? আমি তো বিকালের দিকেই চলে যাব চক্রধরপুর?

—কিন্তু কী লাভ তাতে?

—আরও কয়েক ঘণ্টা আপনার সঙ্গে একসঙ্গে থাকা যাবে।

অতসী নিশ্চুপ কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। রঞ্জনের কথাটা কানে যেতে ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল কুনালের সেই অদ্ভুত কথাটা. 'ঐ কটা দিন সুধায় ভরে দিতে'!

গাড়ি টাটানগরে এসে থেমেছে।

রঞ্জন অতসীর স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে বললে, থাক আপনাকে বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি—

—কী বুঝতে পেরেছ ?

—আপনি চান না, আমিও আপনার সঙ্গে টাটানগরে নামি !

অতসী হঠাৎ মনস্থির করেছে। হেসে বললে, ঠিক তাই, কিন্তু কারণটা কি জান ?

—কারণ তো একটাই, আপনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

—না ! কারণটা তা নয়। কারণটা এই—আমি টাটানগরে নামছি না।

রঞ্জন হাঁ হয়ে যায়। বলে, মানে ?

ওর হাত থেকে স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে অতসী বলে, চা-ওয়ালাটাকে ডাক দিকিনি।

রঞ্জন কথাটা শুনতে পায় না। সামনের বেঞ্চিটায় বসে পড়ে বলে, তার মানে ?

—তার মানে, আমি তোমার সঙ্গে চক্রধরপুরে যাচ্ছি। তোমাকে তোমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাসে করে টাটানগর চলে আসব !

লাফিয়ে ওঠে রঞ্জন, ভি লা-গ্রাণ্ডি ! আপনি সিম্‌প্লি মার্ভেলাস !

বাকি রাস্তাটা রঞ্জন কত কী বক্‌বক্ করে গেল তা কানেই গেল না তার। ও শুধু নিশ্চুপ ভাবছে, এমন একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত হঠাৎ কেন নিয়ে বসল সে ? ঐ ছেলেটার বাকি জীবনের সুনির্দিষ্ট তিন-চার হাজার ঘণ্টার ভিতর মাত্র তিন-চার ঘণ্টার সাহচর্যে সে কী এমন সম্পদ দিতে পারে ? কিন্তু শুধুই কি দেওয়া ? পাওয়ার জন্যও কি অধীর আগ্রহে সে নিজেই উন্মাদ হয়ে যেতে বসেনি ?

চক্রধরপুর স্টেশানে নেমে প্রথমেই রেলওয়ে রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিল দুজনে। তারপর মালপত্র নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো বাসের গুমটিতে। রাউরকেল্লার দিক থেকে বাসটা আসবে, যাবে সরাইকেল্লার দিকে। সেই বাসেই যেতে হবে ওদের,—কী এক মাঙুডিহি গ্রামে। বাসের সড়ক থেকে মাইল পাঁচেক জঙ্গুলে রাস্তা। ঠাকুরমশাই বলেছেন, খবর দেওয়া আছে, দুবেজি গো-গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে বাসের রাস্তায়। নেহাত গো-গাড়ি না পেলে কুলি নিয়ে আসবে সে, যাতে মালটা বইতে অসুবিধা না হয়। রঞ্জন বলে, পাঁচ মাইল তো রাস্তা, হাঁটতে পারবেন না ?

অতসী বলে, এসব কথা আগে বলনি কেন? কোথায় পাঁচ মাইল? যাতায়াতে তো দশ মাইল। আজ সন্ধ্যায় তাহলে কেমন করে ফিরব?

—না-ই ফিরলেন? কাল সকালে আমি নিজে এসে আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে যাব। গোরুর-গাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ভাবছেন কেন অত? ঠাকুরমশাই বলেছেন, দু-কামরার কোয়ার্টার্স। আমি বাইরের ঘরে শোব বরং।

অতসী আর কথা বাড়ায় না।

বাসে ভিড় যথেষ্ট। তাও তো আজ হাট বার নয়। হাটের দিন এ বাসে পা রাখাই দায়। রাস্তাটা ভালই, পীচমোড়া। রঞ্জন বসার জায়গা পায়নি, অতসী পেয়েছিল। বিসর্পিল পথে রওনা দিল চক্রযান।

কণ্ডাকটারকে বলা ছিল. ঘণ্টাখানেক পরে সে হাঁকাড় দিল—মাঝুডিহি, মাঝুডিহি।

মালপত্র নিয়ে ওরা নেমে পড়ল। শুধু ওরা দুজনেই নামল এখানে। বাসটা পরমুহূর্তেই রওনা হয়ে গেল সরাইকেল্লার দিকে।

ঠিক তখনই এগিয়ে এল একজন বিহারী লোক। পায়ে ভারি নাগরাই, ঊর্ধ্বাঙ্গে মেরজাই, মাথায় বিরাট পাগড়ী এবং হাতে মস্ত লাঠি। অভিবাদন করে রঞ্জনকে বললে, কাঁহা যাইবন বাবু?

রঞ্জন ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, দুবেজী?

পুনরায় অভিবাদন করে দুবেজী বলে, জী হাঁ। আইয়ে আইয়ে ইধার পদারিয়ে।

তার পরেই দুবেজীর নজর পড়ে অতসীর দিকে। যুক্তকরে নমস্কার করে, নমস্তে মাইজী, আইয়ে—

অতসী প্রতিনমস্কার করতে ভুলে যায়। তার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে দুবেজী রঞ্জনকে মৃদু ধমক দেয়. খবর দেনা চাহিয়ে থা কী মাইজী ভি আতি হৈ!

রঞ্জন কিছু বলার আগেই অতসী বলে ওঠে, আমার আসার কথা ছিল না দুবেজী; শেষ-মেষ আমিও চলে এলাম। দু-এক দিনের মধ্যেই আমি ফিরে যাব।

—আপ্ বে-ফিকর রহিয়ে মাইজী, সব ইন্তেজাম হইয়ে যাবে। আসিয়ে যখন পড়েসেন দু-চার রোজ ঠাহ্রিয়েই যান। জগাহ্ আচ্ছাই আছে!

অতসী বলে, গোরুর গাড়ি পাওয়া গেছে?

বিজের হাসি হাসল দুবেজী, জী না! হামি বোলেছি কি না, বে-ফিকর রহিয়ে! বয়েল-গাড়ি নেহি, ম্যয় উস্সে ভি আচ্ছা ইন্তেজাম কিয়া!

উৎকৃষ্টতর যানের মালিক সিংজী এক পা এগিয়ে এসে নমস্তে করল।

দুবেজী করিতকর্মা ব্যক্তি। নতুন ম্যানেজারের অভ্যর্থনার ভালই ইন্তেজাম করেছে। জংলী কাঠ আসে যে ট্রাকে তারই একখানা দাঁড়িয়ে আছে বোঝাই-কাঠ নিয়ে। পাঁচ মাইল রাস্তা গোযানে পাড়ি দিতে হবে না শুনে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল অতসী; কিন্তু আশঙ্কিতও হল কিছুটা। ঐ দুবেজী, ঐ সিংজী—আরও না-জানি কারা কারা প্রথম থেকেই একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে গেল: নতুন ম্যানেজারবাবু বিবাহিত, এবং সস্ত্রীক এসেছেন কর্মস্থলে!

তা হোক! রঞ্জনের মেয়াদ তো দু-তিন মাসের। অতসীর আরও কম—দু-তিন দিনের।

॥ ১১ ॥

আশ্চর্য আরণ্যক পরিবেশ! আজন্ম শহরে মানুষ অতসী মুগ্ধ হয়ে গেল। কাদার দেওয়াল, হুড়িয়া টালির ছাদ, দু-কামরা ছোট্ট বাড়িটি কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। পূর্ববর্তী বাসিন্দা একটু বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন মনে হয়—বেড়া-দেওয়া বাগানে ফুলের গাছ নেই, আছে ফলের গাছ—পেয়ারা, ডুমুর, পেঁপে, আতা। ভিতরে উঠানের ও-প্রান্তে রান্নাঘর—তার সামনে বাঁশের খুঁটি-দেওয়া একচালা, বোধকরি আসন পিঁড়ি হয়ে ওখানে আহারের আয়োজন হত। ভিতরের উঠোনেও লাউ-কুমড়ো-ঝিঙের শুকিয়ে যাওয়া চারাগাছ। মাঝখানে একটি কাঁচা পাতকুয়া—ওপাশে একটি ভেঙেপড়া তুলসীমঞ্চে তুলসীর চারাগাছটা কিন্তু টিকে আছে।

দু-কামরা বাড়ির সামনের ঘরটা ছোট। সেখানে খান-দুই বেতের মোড়া, একটি পিয়াশালের চেয়ার টেবিল। প্যাকিং বাক্স ভেঙে তাক বানানো হয়েছে। দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার, যদিও গত বছরের। ভিতরের ঘরটি আকারে কিছু বড়। তাতে একটি নেয়ারের খাটিয়া পাতা। এঘরে একটি কুলুঙ্গি আছে—বর্তমানে শূন্যগর্ভ, কিন্তু প্রদীপ শিখার কজ্জল-চিহ্ন প্রমাণ দেয়, ওখানে কোন ঠাকুরের মূর্তি বা পটের সামনে এককালে প্রদীপ জ্বালানো হত।

অতসীর গৃহ-পরিদর্শন শেষ হয়েছিল। দুবেজীকে প্রশ্ন করে, 'লছমি' কার নাম? শুধু দুবেজী নয়, রঞ্জনও অবাক হয়ে যায় এ-প্রশ্নে। দুবেজীকে স্বীকার করতে হয়, লছমি তার একমাত্র কন্যা, চার বছর বয়স—লছমির মা থাকে পাশের কোয়ার্টার্সে। একটু পরেই সে আসবে। জানতে চায়, অতসী কেমন করে তার নাম জানল।

অতসী সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, আগেকার ম্যানেজারবাবুর একটা মেয়ে ছিল, ছোট্ট মেয়ে, নয় ?

—জী নেহী, এক লেড়কা থা। কাইসে সমঝ্‌লেন ?

অতসী এবারও ওদের কৌতূহল নিবৃত্ত না করে প্রশ্ন করে, রান্নার বাসন আছে তো ? আমরা তো সে সব কিছু আনিনি।

দুবেজী তার বাঁধা লজ্জে ফিরে যায় : বে-ফিকর রহিয়ে। আগামীকাল হাট-বার। সব কিছুই পাওয়া যাবে। মাটির হাড়ি, অ্যালুমিনিয়ামের থালা, গ্লাস, লোহার হাতা-খুন্তি। ঐ সঙ্গে জানায়, আজ রাত্রে অতসীকে রান্না করতে হবে না। আজ রাত্রে লছমীর মা ওদের দুজনকে নিমন্ত্রণ করছে। তবে হ্যাঁ, দুবেজীরা নিরামিষাশী, ফলে—

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে, বে-ফিকর রহিয়ে দুবেজী। আমরা আমিষ নিরামিষ দুই-ই খেতে অভ্যস্ত।

দ্বারের প্রান্তে একটি বছর পনেরোর উদোম-গা ছোকরা উঁকি মারছিল। দুবেজী তাকে ডেকে নিয়ে এসে তার বিচিত্র ভাষায় বলল, এর নাম বুধন, এ আপনাদের দেখ্‌ভাল করবে। মাইজী স্বয়ং আসছেন একথা তো জানা ছিল না, তাই বুধনকে বলে রেখেছিল। বুধন পূর্ববর্তী ম্যানেজারের কথাইও-হ্যাও ছিল—অর্থাৎ ঘর দোর সাফা করা, জামা-কাপড় কাচা, জল তোলা থেকে বাঙালী খানাও সে কুছু-কুছু পাকাতে পারে।

বুধন এসে সলজ্জে সেলাম করল মাইজীকে।

অতসী তাকে প্রশ্ন করে, চা বানাতে পারিস ?

বুধন ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

অতসী ওকে তিনকাপ চা বানাতে বলল। তারপর শুধরে নিয়ে বলে, চার কাপই বানা। তুইও তো চা খাস ? না কি রে ?

—হিঁ ! —একগাল হাসল বুধন।

বুধন চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। উনুন তৈরীই আছে, কাঠও জমা করা আছে ভাঁড়ারে। দুবেজী বুদ্ধি করে চায়ের পাতা, চিনি ও দুধ রেখেছিল জমিয়ে।

অতসীকে সংসার গুছিয়ে নেবার সুযোগ দিতে দুবেজী ম্যানেজারবাবুকে ডেকে নিয়ে বাইরের দাওয়ায় মোড়া টেনে নিয়ে বসল। দুবেজী এ কাঠের কারখানায় আজ আট-দশ বছর আছে। আংরেজী জানে না, তবে কাঠের হিসাব বোঝে। পাঁচ-ছয়-সাত ইঞ্চি ব্যাসের গুঁড়িতে কত দৈর্ঘ্যে কত 'সিয়েফটি' কাঠ

পাওয়া যাবে মুখে মুখে হিসাব জুড়ে বলতে পারে। কাঠচেরাই কলে বিদ্যুৎ নেই—হাত-করাতে চেরাই হয় কাঠ। দশ-বিশ জন মুনিষ খাটে। সেকৃশান অনুযায়ী কাঠ লাদ দেওয়া হয়, নম্বর দেওয়া হয়। তারপর হাওয়ায় সিজনিং করা হয়। কীভাবে কাঠ সাজালে রসস্থ স্যাপওয়ালা কাঠ স্বল্পসময়ে উপযুক্ত 'সিজণ্ড-কাঠে' রূপান্তরিত হয় এসব তত্ত্ব দুবেজী'র ভালমতন জানা। নতুন ম্যানেজারবাবু আংরেজী জানেন, কিন্তু কাষ্ঠ-বিজ্ঞানের এসব গুহ্য গুরুমুখী বিদ্যা যে তাঁর জানা নেই তা অচিরেই সমঝে নিল 'কাঠবুড়ো'। রঞ্জন অকপটে স্বীকারও করল অজ্ঞতা। দুবেজী ওকে আশ্বাস দিল তার বাঁধাবন্ধ লব্জে: আপ বে-ফিকর রহিয়ে।

একটু পরে কাচের গ্লাসে দু-গ্লাস চা নিয়ে এল বুধন, সঙ্গে একটা কলাইয়ের থালায় খানকয় বিস্কুট অতসীর বাক্সে তখনও কিছু বিস্কুট অবশিষ্ট ছিল। চা পানান্তে দুবেজী রঞ্জনকে নিয়ে কাঠ চেরাই-এর কারখানা দেখাতে নিয়ে গেল। অতসী বুধনকেও বিদায় দিয়ে দরজায় আগড় দিল। সারাদিন ঘামে ভিজে ব্লাউসটা জবজব করছে। কুয়ো থেকে জল তুলে এবার সে গা ধোবে। স্নানঘর নেই এ বাড়িতে—অবশ্য উঠানের চারিদিকেই বেড়া তোলা—গা খুলে স্নান করায় অসুবিধা নেই কিছু, তবু আজন্ম সংস্কারে বাথরুমের চার-দেওয়ালের অভাবটা আজ অনুভব করল বিশেষ করে। সদর বন্ধ করে স্যুটকেস খুলে তোয়ালে, সাবান, শাড়ি ব্লাউস বার করতে করতেই আবার সদর দরজায় টোকা পড়ল। বাধ্য হয়ে উঠে আসতে হল আবার। দরজা খুলে দিয়ে দেখে ওরই বয়সী—বা ওর চেয়ে কিছু ছোটই হবে, বন্দনার বয়সী একটি মেয়ে। হিন্দুস্তানী। একটা ছাপা শাড়ি ডানদিকে আঁচলা দিয়ে পরেছে, বাঁ হাতে সবুজ-লাল-হলুদ কাচের চুড়ি; কপালে একটা কাচপোকার টিপ। আন্দাজে মনে হল, এ নিশ্চয় দুবেজীর ঘরনী; কিন্তু ঠিক কি তাই? দুবেজী চল্লিশের কোঠায়, তার বউ এতটুকুন? অতসী বললে, আইয়ে ভিতর।

মেয়েটি সাদা বাংলায় বললে, আপনি আসছেন আমরা জানতুমই না—

অতসী অবাক হল। বিশেষ করে 'জান' ধাতুতে 'তুম' প্রয়োগে। বলে, এত ভাল বাংলা কোথায় শিখলেন?

—আমার পিতাজী বার্নপুরের কারখানায় কাজ করতেন! ছেলেবেলায় বাঙালী ছেলেমেয়েরাই আমার সাথী ছিল। আস্নান করতে যাচ্ছিলেন বুঝি?

অতসীর হাতে তখনও ধরা আছে সাবান তোয়ালে। স্বীকার করে বললে,

হ্যাঁ, তা স্নান না হয় পরেই করা যাবে। আপনি বসুন ভিতরে এসে। আমার নাম অতসী, আপনি—

—আমি লছমীর-মা। আমাকে 'যমুনা' বলে ডাকবেন। আর তুমিই বলবেন। তা শুধুমুখে বসব কেন, চলুন আপনার জল তুলে দিই।

অতসী আপত্তি জানায়; কিন্তু লছমীর মা কর্ণপাত করে না। অবলীলাক্রমে সে তিন-চার বালতি জল তুলে ফেলল পাতকুয়া থেকে। বলে, স্নান করে নিন, আরাম লাগবে। সারাদিন কত ধকল গেছে—

অতসী বলে, এমন খোলা-মেলা জায়গায় স্নান করা তো অভ্যাস নেই, কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

লছমীর মা একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়েছিল। ওখান থেকেই বলে, আমাকেও সরম হচ্ছে না কি দিদি? ঘরে উঠে যাব?

অতসী লজ্জা পায়, বলে, না না তা নয় ··তবে অন্য সময়···

লছমীর মা মুখ টিপে বলে, অন্য সময়েই বা কী? আপনার সংসারে শ্বশুর ভাশুর মায় দেয়রভি তো না-আছে! অন্য সময় থাকলে তো থাকবে আপনার মরদ! তার কাছে সরম হলে আমরা নাচার!

অতসী খুশি হয় মুখরা মেয়েটিকে পেয়ে। এসব ক্ষেত্রে আক্রমণই হচ্ছে প্রতিরক্ষার উপায়। তাই কথা ঘুরিয়ে অতসী বলে, তাই বুঝি? তা তোমার ঘরেও বুঝি এই হাল? মরদের সামনে গা খুলে স্নান করতে হয়?

লছমীর-মা রীতিমত মুখরা। ফস্ করে বলে বসে, না দিদি। আমার বাড়িতে আমি অন্য ইন্তেজাম করে নিয়েছি। আমার মরদ তো আপনার মরদের মত নওজোয়ান নয়—বুড্ডার নজর থেকে নিজেকে আড়াল করতে না পারলে মন খুলে আস্নান করতে পারি না।

একটু আহত হয় অতসী। বলে, বুড্ডা! বুড্ডা হবেন কেন দুবেজী?

—দোজবরে তো! ওরা ঐ রকমই হয়।

এতক্ষণে রহস্যটা পরিষ্কার হল। যমুনা নিজে থেকেই বলে—লছমীর মা স্বর্গে যাবার পর দুবেজী তাকে বিবাহ করেছে। প্রসঙ্গটা চাপা দিতে অতসী বলে, এ বাড়িতে স্নানঘর নেই, কিন্তু পায়খানাও তো দেখছি না—

লছমীর-মা বলে, ও-কথা বলবেন না দিদি। পা-খানা এ বাড়িতে এক মাইল লম্বা! খিড়কীর দরজাটা খুলে দেখবেন—পিছনে কী বিরাট জঙ্গল। সবটাই আপনার। ওদিকে কেউ যায় না:

এ প্রসঙ্গটাও চাপা দিতে হয়। অতসী গায়ে সাবান মাখতে মাখতে বলে,

একটা মুশকিল হয়েছে। ঘরে একটা মাত্র খাটিয়া আর একটা যোগাড় হয় না?

খেয়াল হয় যমুনার। বলে, তাই নাকি? কই দেখি—

উঠে চলে যায় ভিতরে। শোবার ঘরে কী সব খুটখাট করতে থাকে।

স্নান সেরে ভিজে কাপড়টা মেলে দিয়ে অতসী ফিরে এল শোবার ঘরে। এখনও দিনের আলো আছে। ঘরের ভিতরটায় গুটি গুটি অন্ধকার এগিয়ে আসছে। ঘরে ঢুকে দেখে ইতিমধ্যে যমুনাবাঈ একা হাতে রঞ্জনের বেডিংটা খুলে ফেলেছে। চারপাইটা খাড়া করে দেওয়ালে ঠেসানো। ঘরজোড়া মস্ত বিছানা পেতে মশারী খাটিয়ে দিয়েছে। অতসীকে দেখেই বললে, দেখুন দিদি, বিছানা পসন্দ হচ্ছে? দোসরা খাটিয়ার আর জরুরৎ আছে?

অতসী কী বলবে ভেবে পায় না।

মুখরা যমুনা বলে, একটা কথা বলব দিদি? কিছু মনে করবেন না তো?

—কি?

—মশারী তো এনেছেন একটা—দুটো চারপাই নিয়ে কী করতেন?

এর কি জবাব? অতসী আদৌ বিছানা সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়নি। বান্ধবীর বাড়িতে বিছানার দরকার হবে না; ট্রেনেও দিনে দিনে যাতায়াত। ফলে বিছানা সে আনেইনি আদৌ। যমুনা বলে, দু-নম্বর প্রশ্ন: হ্যাঁ, দিদি—তামাম রাত বুঝি একটা মানুষের হাতে মাথা দিয়ে শুতে হয়? দু-নম্বর একটা বালিশও তো আনবেন?

মরমে মরে যায় অতসী। আমতা আমতা করে বলে, এত তাড়াহুড়ার মধ্যে গুছিয়ে নিতে হল···

—বুঝেছি। এবার আপনার সিঁদুর কৌটাটা বার করুন দিকি। আস্নান করবার সময় সিঁথিটা বিলকুল সাদা হয়ে গেছে।

বিড়ম্বনার চূড়ান্ত। যমুনাই শেষে বলল, ঠিক আছে। রাতে যখন আমার ওখানে আসবেন তখন সিঁদুর পরিয়ে দেব। এবার হিসেব জুড়ে দেখুন, আর কি কি আনতে ভুলেছেন।

অতসী নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এ কি? তুমি যাচ্ছ কোথায়? এস একটু চা করি। খেয়ে যাও।

—আজ নয় দিদি। আজ আমার বাড়িতে দুজন মেহ্‌মান আসবেন। ইন্তেজাম এখনও বাকি আছে আমার। আমি শুধু আপনাকে নিজে মুখে বলতে এসেছিলাম। বুড্‌ডার নেওতা যদি না নেন তাই, চলি—

যমুনা চলে গেল। সদর-দরজাটা বন্ধ করে অতসী এসে বসল পাতা বিছানায়, শুয়েই পড়ল। এ কী কাণ্ড সে করে বসেছে! কোথা থেকে কী হয়ে গেল! আজ সকালেও কি সে ভাবতে পেরেছিল এমন একটা অসম্ভব কাণ্ড বাধিয়ে বসবে? কেন-কেন কেন?

যদি বল, ঐ মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি এ একটা অহৈতুকী করুণা, তবে সেটা নির্জলা সত্য হবে না—এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি ওর আছে। ওর অবচেতন মন এমনই একটা কিছু চাইছিল—কুনালের ভাষায়: 'আমি খুশি হব, ঐ চব্বিশ বছরের ছেলেটা যদি একেবারে খালি হাতে তোমাকে ফেলে রেখে না যায়! আমি যা দিতে পারিনি…'

ছি-ছি-ছি! তাই কি এমন একটা ফাঁদ পেতেছে অতসী? বিছানাটা সে স্বয়ং রচনা করেনি; কিন্তু পরিবেশটা যে তার নিজে হাতে গড়া। রঞ্জন এটাকে কী ভাবে নেবে? বিছানাটা এখনই গুটিয়ে ফেলবে? তাতেই বা সমাধান কোথায়? মশারী একটাই। খাকারে সেটা বেশ বড়। দ্বিতীয় মশারী কোন লজ্জায় চাইবে? কার কাছে? আর বিনা মশারীতে একটা মানুষ এই বিজন-বনে শোবেই বা কি করে?

যমুনার সেই উৎকট রসিকতাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না, তামাম রাত বুঝি একটা মানুষের হাতে মাথা রেখে ঘুমাতে হয়?

অতসী—যে অতসী আঠাশ বছর বয়সে আজও জানে না, পুরুষ মানুষে চুমু খেলে সারা দেহে কী-জাতের শিহরণ লাগে—সে এ-কথার জবাব খুঁজে পায় না। আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধ্যা রাতেই।

ঘুম ভাঙলো যখন, রাত তখন আটটা। সদর দরজায় কারা ধাক্কা দিচ্ছে।

দোর খুলে দেখে লণ্ঠন হাতে দুবেজী তাকতে এসেছে। রঞ্জনও আছে তার সঙ্গে। অতসী তৈরী হয়েই ছিল। সদর দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। দুবেজীর ছাপরা দূরে নয়, কাছেই। যজ্ঞডুমুর গাছটার ওপাশে।

লছমী ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত ধরে অতসীকে ভিতরে নিয়ে গেল যমুনা। ঘরদোর ঘুরিয়ে দেখালো টেমি হাতে নিয়ে। দুবেজী আর রঞ্জন বাইরের দাওয়ায় বসল মাদুর পেতে। যমুনার ছাপরা এক কামরার। এখানেও পৃথক রান্নাঘর। ওর শয়নকক্ষে লক্ষ্মীর পট আছে। বাঙালী মেয়েদের দেখাদেখি সে প্রতি লক্ষ্মীবারে পুজো করে। শাঁখ বাজায়। যমুনা বললে, ওদের আগে খাইয়ে দিই, কি বলেন? তারপর আমরা দু-বোন একসাথে খাব! কেমন?

অতসীরও সেটাই পছন্দ। হারিকেন বাতির আলোয় পুরুষ দুজন আসনপিঁড়ি

হয়ে খেতে বসল। রান্নাঘর থেকে যোগান দিল যমুনা, পরিবেশন করল অতসী। আয়োজন সামান্য—অথবা কে জানে, এই হয়তো দুবেজী-যমুনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাজকীয় আহার্য : রুটি, অড়হরের ডাল, রাম-তরুইয়ের তরকারী, আলু-বেগুনের ঝোল, পাঁপর ভাজা, দুরকম আচার এবং সবশেষে একবাটি করে ঘন দুধ।

কর্তাদের খাইয়ে ওরা দুজন খেতে বসল। বাসনের অভাব। মেজে নেওয়ার না আছে সময়, না প্রয়োজন। যমুনা অম্লানবদনে দুটি এঁটো থালা তুলে এনে নতুন করে আহার্য সাজালো।

ঠাঁই করে, আহার্য সাজিয়ে যমুনা বলল, একটু অপেক্ষা করুন দিদি। আমার নজরে ব্যাপারটা বিলকুল বুরা লাগছে। আগে ওটার ব্যবস্থা করি—

—কোনটার? কোন জিনিসটা খারাপ লাগছে তোমার?

যমুনা ঘটির জলে এঁটো হাতটা ধুয়ে উঠে গেল নিজের শয়নকক্ষে। একটু পরেই ফিরে এল একটা কাঠের সিঁদুর কৌটা নিয়ে। আঙুলে করে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল অতসীর সিঁথিমূলে। অতসী সংস্কারমুক্ত নয়, কিন্তু কিছুই করণীয় নেই তার। নির্বিকারভাবে প্রতিদানে যমুনার সিঁথিতে সিঁদুরচিহ্ন এঁকে দিল, নোয়ায় সিঁদুর ঠেকালো। ওর নিজের হাতে শাঁখা-নোয়া কিছুই নেই। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যমুনা এল না। আধুনিকা বাঙালী সীমন্তিনীরা অনেকে যে ওসব ব্যবহার করে না এটুকু তার জানা।

দুজনে আহারে বসল।

একটু পরে যমুনা বলে, আমার রান্না দিদির পসন্দ হচ্ছে না, নয়? কিছুই তো খাচ্ছেন না আপনি!

অতসী প্রতিবাদ করে, না না, রান্না তো ভালই হয়েছে। খাচ্ছি তো—

—তবে বোধহয় নিরামিষ রান্না বলে খেতে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

অতসী কেমন করে বোঝাবে—সেসব কিছুই নয়। ওর আঠাশ বছরের জীবনে আজই প্রথম অপরের এঁটো থালায় খেতে হচ্ছে। এটা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। এতে সে অভ্যস্ত নয়।

রাত দশটা নাগাদ ওরা বিদায় নিল। যমুনা বলল, কাল সকালে মুখ হাত ধুয়ে এখানেই চলে আসবেন কিন্তু দিদি!

জবাব দিল রঞ্জন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বললে, আসবে। কিন্তু কাল রাত্রে আপনারা তিনজনে আমার ওখানে খাবেন। কাল তো হাটবার?

লণ্ঠন ধরে দুবেজী ওদের বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল।

এক আকাশ তারা। এমন ঝলমলে তারা ওঠে না কলকাতার আকাশে।

দুবেজীকে বিদায় দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করেই হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে রঞ্জন।

অতসী ধমক দেয়, কী হল? হিজবিজবিজের মত হাসছ কেন অমন করে?

রঞ্জনের হাসির দমক তখনও থামেনি। কোনক্রমে আঙুলটা তুলে সে নির্দেশ করে অতসীর সিঁথিমূলের দিকে।

অতসী বলে, তা এতে এত হাসির কী আছে? তন্দ্রার বোলে মেকআপ্ নেবার সময়েও তো সিঁথিতে সিঁদুর মাখতে হত। হত না?

—তা ঠিক! ওরা আচ্ছা জব্দ হয়েছে কিন্তু। ভেবেছে আপনি আমার বউ!

আপনি! এই রুদ্ধদ্বার কক্ষে তন্দ্রার স্বামী পুনরুজ্জীবিত হল না তাহলে?

সুর কাটল। অতসী গম্ভীর হয়ে বললে, আমি কিন্তু কাল সকালেই টাটানগর চলে যাব রঞ্জন।

হাসি থেমে যায়। রঞ্জন সামলে নিয়ে বলে, তা কেমন করে হবে? কাল রাতে ওদের নিমন্ত্রণ করলাম যে?

—সে তুমি করেছ। তোমার দায়িত্ব। আমি তার কি জানি?

—এ্যাই, না! প্লীজ! অতসী'দ! অন্তত কালকের দিনটা ম্যানেজ করে দিয়ে যান।

অতসী জবাব দিল না। খোঁপা খুলতে খুলতে চলে এল এঘরে। রঞ্জনও এল পিছন-পিছন। বকবক্ করতে করতে। হঠাৎ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে যেন ভূত দেখল, একী! এভাবে বিছানা করেছেন কেন?

অতসীর কান্না পাচ্ছিল। কোনক্রমে সামলে নিয়ে বলে, আমি কেন করব? যমুনা বিছানা পেতে দিয়ে গেছে।

—ও! তাই বলুন! আসুন দুজনে ধরাধরি করে ঠিক করে নিই। আমি ঐ বাইরের ঘরে শোব, মাটিতে। আর আপনি এঘরে খাটিয়া পেতে।

দাঁতে-দাঁত চেপে অতসী বললে, কিন্তু মশারী যে মাত্র একটা?

এতবড় সমস্যাটাকে পাত্তাই দিল না রঞ্জন। অম্লানবদনে বললে, মশারী আপনিই খাটান। আমি ওডোমস মেখে শোব।

অতসী—যে মেয়েটা টাটানগর স্টেশনে মরিয়া হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিল—সে এবার একই ভঙ্গিমায় মরিয়া হয়ে বলে বসল, তা কি সম্ভব? এখানে প্রচণ্ড মশা! জঙ্গলের মশার কামড়ে কী যন্ত্রণা তুমি জান না!

মশার কামড়ের যন্ত্রণা কী নিদারুণ রঞ্জন তা নিশ্চয়ই জানে না— একটি আঠাশ বছরের অনাঘ্রাতা কুমারীর অন্তরের নিদারুণ যন্ত্রণা—যাতে তাকে এভাবে

নির্লজ্জ হতে হয়—তাও যখন সে জানে না। বললে, মশারা আমাকে কামড়াবেই না! রক্ত কোথায় আমার শরীরে? দেখুন না!

হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

এই কি হাত বাড়িয়ে দেওয়া? অতসী জবাব দিতে পারে না। কীই বা বলতে পারত জবাবে? কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল। রঞ্জন ভ্রূক্ষেপ করল না। একা হাতেই নতুন ব্যবস্থা করল। বাইরের ঘরে পাতল নিজের বিছানা, মাটিতে। এঘরে খাটিয়া পেতে বিছানা পাততে গেল। অতসী রাজী হয় না। খাটিয়ায় শোওয়া তার অভ্যাস নেই। অগত্যা এঘরেও মাটিতে বিছানা পাততে হল। মশারী খাটালো। তারপর স্যুটকেস খুলে বার করল গেঞ্জি, পায়জামা, চপ্পল। সব নিয়ে ওঘরে যেতে গিয়েও হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনি লছমীর নাম জানলেন কেমন করে?

অতসী আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল দেয়ালে পেনসিল দিয়ে লেখা আছে নামটা। বাঙলা হরফে।

রঞ্জন বলে, লছমী বাঙলা-হরফ চেনে না। এ নিশ্চয় আগেকার ম্যানেজার-বাবুর ছেলের কাণ্ড। 'কাফ্-ল্যাভ।'

অতসী জবাব দিল না। রঞ্জন ওঘরে চলে যাবার পর সে কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেল! পোশাকী শাড়িটা পালটিয়ে আটপৌরে লালপেড়ে একটা মিলের শাড়ি পরল। ব্লাউস-ব্রেশারী খুলে রেখে শুতে যাবে, হঠাৎ আবার দ্বারের বাইরে থেকে রঞ্জন ডাকল, অতসীদি, শুয়ে পড়েছেন নাকি? এঘরে খাবার জল নেই। একগ্লাস জল নিয়ে মাথার কাছে রাখব।

সারা গা ভাল করে ঢেকে অতসী আবার দরজাটা খুলে দেয়।

রঞ্জন ঘরে ঢুকল। কলসী থেকে ওর ফ্লাস্কে কিছুটা জল ভরে নিয়ে ফিরবার উদ্যোগ করেছে, হঠাৎ অতসী বলে, একটা কথা রঞ্জন—আজ তুমি এই জনান্তিকেও আমাকে 'অতসীদি', 'আপনি' বলছ কেন? এখানে তো বাইরের লোক কেউ নেই।

রঞ্জন দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, বা-রে পরিস্থিতিটা যে একেবারে কনভার্স থিয়োরেম। তখন আপনি ছিলেন 'তন্দ্রা', আমি 'কল্যাণ'। তাই সর্বসমক্ষে তখন আপনি ছিলেন অতসীদি, জনান্তিকে—'আমার তন্দ্রা'। এখন ঠিক উল্টো। বাইরের জগতে—দোবেজী-যমুনার দৃষ্টিতে—আপনি আমার বিয়ে-করা-বউ; আর ঘরের ভিতর আপনি আমার অতসীদি।

অতসী অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর হঠাৎ বলে, আর একটা কথা।

একদিন তুমি আমাকে একটা ইংরাজী কোটেশান শুনিয়েছিলে, মনে আছে? এরিক সেগলের 'লাভ্-স্টোরি' থেকে?

—হ্যাঁ, মনে আছে! কেন বলুন তো?

—বইটা আমার পড়া নেই। গল্পটা সংক্ষেপে বলবে?

—'লাভ্-স্টোরি' পড়েননি? সিনেমাটাও দেখেননি? আশ্চর্য! রায়ান ও' নীল আর অলি ম্যাকগ্র-র অনবদ্য ছবিটা কলকাতায় অনেকদিন তো চলেছিল! আচ্ছা শুনুন। সরে বসুন তাহলে—

রঞ্জনের ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, কিন্তু পায়জামার পকেটে সিগ্রেট দেশলাই ছিল। সে মৌজ করে একটা সিগ্রেট ধরালো। বালিশটা টেনে নিল কোলের উপর। বসল বিছানার প্রান্তে। অতসী আঁচলটা দিয়ে সারা গা ভালো করে ঢেকে বসল অপরপ্রান্তে।

রঞ্জন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—অতসী বইটাও পড়েছে, ছায়াছবিটাও দেখেছে। ও শুধু আজ শুনতে চায়—রঞ্জনের মুখ থেকে শুনতে চায়—লিউকেমিয়ার রোগিনী জেনীর কথা—কীভাবে জেনী সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা গ্রহণ করেছিল।

॥ ১২ ॥

গল্পের নায়ক হচ্ছে: অলিভার ব্যারেট IV। বয়স কুড়ি, উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো, ওজন একশ পঁচাশি পাউণ্ড, হার্বাটে আইনের ছাত্র। তা যেন হল, কিন্তু ঐ ব্যারেট IV ব্যাপারটা কী? তার মানে, ওর বাপের নাম—'অলিভার ব্যারেট III', ঠাকুর্দার নাম—'অলিভার ব্যারেট II' এবং ওর সন্তান হলে তার নাম অনিবার্যভাবে হবে—'অলিভার ব্যারেট V'। খানদানী ব্যবস্থা। অন্যার্থ: গল্পের নায়ক—কী বলব? আমেরিকায় তো রাজা নেই, নইলে বলতুম: রাজপুত্র। অলিভার ব্যারেট III—নায়কের পিতৃদেব, অত্যন্ত রাশ-ভারী মানুষ। অপরিমেয় অর্থ, অতুলনীয় প্রতিপত্তি, দুর্দান্ত স্বাস্থ্য এবং সবচেয়ে বড় কথা তাঁর ব্যক্তিত্ব। ছেলে য়ুনিভার্সিটি ব্লু—জনপ্রিয় স্পোর্টসম্যান; কিন্তু তার পিতৃদেব তাঁর আমলে ছিলেন আরও বড় জাতের খেলোয়াড়। শুধু হার্বাটের প্রতিনিধিত্বই করেননি, করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের—অলিম্পিকে। এহেন পিতা এবং এহেন পুত্রের দ্বৈরথ সমর উপন্যাসের উপজীব্য বটে! উপলক্ষ্য? গল্পের নায়িকা—জেনী ক্যাভিলেরি।

আভিজাত্যের তুঙ্গশীর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত অলিভার ব্যারেট III ঐ নামগোত্রহীনা মধ্যবিত্ত পরিবারের কুমারী কন্যাটিকে যে পুত্রবধূ করে নিতে স্বীকৃত হবেন না এটা আশঙ্কাতীত নয়। জেনীর অপরাধ একাধিক—প্রথম কথা, সে গরীব বাপের একমাত্র মেয়ে, দ্বিতীয়ত ওরা রোমান ক্যাথলিক, তৃতীয়ত খাঁটি অ্যাংলো-স্যাকশন নয়, ইতালিয়ান। এমন মেয়ের প্রেমে পড়ল কি করে অমন ছেলে?

এরিক শেগলের মাত্র একশ একত্রিশ পৃষ্ঠার এই রচনাটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে বাক-সংযম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলাপচারী এত সংক্ষেপে সোচ্চার যে এই রচনাশৈলীকে অনন্য বলা চলে। ওদের প্রথম সাক্ষাতের পরিবেশটার আক্ষরিক অনুবাদ শোনাই, তাহলেই বুঝবেন।

অলিভার একটি বিশেষ বইয়ের খোঁজে র‍্যাডক্লিফ লাইব্রেরীতে এসেছে। জেনী ঐ র‍্যাডক্লিফে 'সঙ্গীত' নিয়ে উচ্চশিক্ষার ছাত্রী। অবসর সময়ে সে লাইব্রেরী কাউন্টারে ডিউটি দেয়—বাড়তি রোজগার তার প্রয়োজন। হার্বার্ট বড়লোকের ছেলেদের কলেজ, তার নিজস্ব লাইব্রেরী প্রকাণ্ড। তবু অলিভার এসেছিল র‍্যাডক্লিফ লাইব্রেরীতে। কাউন্টারে-বসা উনিশ বছরের নীলনয়নার দিকে এগিয়ে এসে অলিভার বললে, 'তোমাদের এখানে The Wanning of the Middle Ages বইটা পাব?'

মেয়েটি একনজরে আমাকে দেখে নিয়ে বলল, তোমাদের হার্বার্ট কলেজের তো নিজস্ব লাইব্রেরী আছে!

—আছে। কিন্তু হার্বার্টের ছেলেরা র‍্যাডক্লিফ লাইব্রেরীও ব্যবহার করতে পারে।

—আমি আইনের কথা বলছি না, প্রেপি; বলছি সৌজন্যের কথা। তোমাদের হার্বার্টের লাইব্রেরীতে পঞ্চাশ লক্ষ বই আছে; আমাদের আছে মাত্র কয়েক হাজার ছেঁড়াখোঁড়া বই।

আরে ব্বাস! এ যে দেখছি দিদিমণি টাইপ! যারা ভাবে—যে-হেতু র‍্যাডক্লিফ আর হার্বার্টের অনুপাত 'পাঁচ : এক' তাই মেয়েগুলোকে পাঁচগুণ স্মার্ট হতে হবে! এজাতীয় দিদিমণিদের নাকে ঝামা ঘষে দেওয়াই যদিচ আমার স্বভাব, তবু আজ সংযত হতে হল—বইটার সত্যই বড় প্রয়োজন ছিল সেদিন।

—শোন, ঐ শালার বইটা আমার জরুরী দরকার।

—দয়া করে জিবটাকে আর একটু সংযত করবে, প্রেপি?

—তুমি কি করে ধরে নিচ্ছ আমি 'প্রেপ স্কুলের' ছাত্র—

—তোমার চেহারায়। বেশ বোঝা যায়—তুমি বড়লোকের আদুরে ছেলে এবং হাবাগোবা!

—আমি প্রতিবাদ করি—ভুল বললে! আমি আসলে স্মার্ট এবং গরীব।

—না-হে প্রেপি! তুমি তা নও! স্মার্ট এবং গরীব হচ্ছি আমি।

মেয়েটা আমার চোখে চোখ রেখে বসে আছে। নীল দুটি নয়ন। ঠিক আছে, হয়তো আমাকে দেখলে বড়লোকের ছেলে বলে বোঝা যায়; কিন্তু তাই বলে কোন র‍্যাডক্লিফ ছুঁড়ি—হোক না কেন নীলনয়না—আমাকে 'হাবাগোবা' বলে পার পেয়ে যেতে পারে না। বললুম, হঠাৎ নিজেকে অত স্মার্ট ভাবছ কেন বল দিকিন?

—কেন জান? ধর তুমি যদি আমাকে এখন কফি-পানে আমন্ত্রণ করে বস, তাহলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করব। এজন্যই আমি স্মার্ট!

—বটে! তবে শোন হে স্মার্ট-সুন্দরী! তোমাকে আমি এখন কফি-পানে আদৌ আমন্ত্রণ করছি না!

—আর তাতেই প্রমাণ হচ্ছে তুমি: হাবাগোবা!

এই হল সূচনা। এ ছেন জেনীকে নিয়ে যেদিন অলিভার IV তার পিতৃদেবের প্রাসাদে উপনীত হল, তার বান্ধবীকে পরিচয় করিয়ে দিল, সেদিন সৌজন্যের কোনও ত্রুটি দেখা দিল না অলিভার III-র তরফে। কিন্তু পুত্রকে তিনি জনান্তিকে জানিয়েও দিলেন এ বিবাহ তিনি অনুমোদন করছেন না। কোনদিন করবেন না।

চার নম্বর অলিভার ব্যায়েট দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া এবং পিতার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে তার ছিল আকৈশোর জেহাদ। এক কথায় বাড়ি ছেড়ে বার হয়ে এল সে, সম্পর্ক চুকিয়ে দিল বাপের সঙ্গে। ওর মা অ্যালিসন হচ্ছেন কাব্যে উপেক্ষিতা—ব্যক্তিত্বময় স্বামী এবং বিদ্রোহী সন্তানের মাঝখানে তাঁকে দেখা-যায়-কি-না-যায়।

তিন-নম্বর যে চার-নম্বরকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, এ সংবাদ অজানা ছিল না হার্বার্ট ল-স্কুলের অ্যাসোসিয়েট ডীন মিস্টার উইলিয়াম টমসনের কাছে। তাই ঐ মেধাবী ছাত্রটি যখন শেষ বছরের জন্য স্কলারশিপ প্রার্থী হল, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বলা বাহুল্য তাতে চার-নম্বরকে দমিয়ে রাখা গেল না।

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হল জেনী এবং অলিভার। অনাড়ম্বর আয়োজন। জেনী ততদিনে পাস করে বেরিয়েছে—তার উপার্জনেই অলিভার আইন পরীক্ষার শেষ ধাপটা অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। ওদের দাম্পত্য জীবনের সূচনাটা

বেদনাদায়ক—নিতান্তই অর্থাভাবে। সেই জীবনযাত্রার কিছুটা বর্ণনা শুনুন। শ্রেগলের ভাষায়—আক্ষরিক অনুবাদে :

—ওমর খৈয়ামের সেই বিখ্যাত লাইন-কটা পড়া আছে? সেই যে এক টুকরো রুটি, একটা মদের পাত্র, একটা কাব্যগ্রন্থ আর কুঞ্জবিতানে শুধু : তুমি! ঐ কবিতার বইটাকে ধরে নাও আইনের একটা চাউস রেফারেন্স, রুটি আর মদ শ্রেফ্ বাদ্দাও! ব্যস! তাহলেই দেখবে ঐ 'তুমি'-র রোমান্টিকতা শ্রেফ কর্পূর!

…জীবন মানেই তো পরিবর্তন। প্রতিটি সামান্যতম সিদ্ধান্তকে তৌল করতে হচ্ছে নবদম্পতির যৌথ-বাজেট কমিটিতে। হয়তো ও বলল, হাই অলিভার, চল, আজ রাতে 'বেকেট' নাটকটা দেখে আসি। জবাবে আমাকে বলতে হয়, তার মানে বোঝ? নগদ তিনটি ডলার! ও বলে, তার মানে? আমি বলি, তার মানে তোমার দেড় ডলার, আমার দেড় ডলার! ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, তাহলে শেষমেষ কি দাঁড়ালো? আমরা যাচ্ছি, না যাচ্ছি না? আমি বলি, দুটোর একটাও নয়। মানেটা দাঁড়ালো—নগদ তিন ডলার

…কেটে গেল দুটি বছর। নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায়। জেনী উদয়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে, আর অলিভার উদয়াস্ত পড়ে যায় পরীক্ষার পড়া। স্যাঁৎস্যাঁতে ঘর, আধপেটা আহার, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে ওদের দাম্পত্যজীবন। তারপর একদিন ডাকবাক্সে এল একখানা আমন্ত্রণ লিপি : মিস্টার অলিভার III-র ষাট বছরের জন্মদিনে আমন্ত্রণ করা হয়েছে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস্ অলিভার IV কে। শনিবার সন্ধ্যা সাতটায়, ম্যাসাচুসেট্স্-এর ইপ্স্উইচে ওদের পৈতৃক প্রাসাদ—'ওভার হাউসে'। নিমন্ত্রণ পত্রের বামদিকের কোনায় ছোট্ট হরফে লেখা : 'আর. এস. ভি. পি.।'

জেনী বললে, এবার কী হবে?

আমি ধমকে উঠি, এবার কী হবে জানতে প্রশ্নটা করতে হচ্ছে তোমাকে?—বলেই আবার বইটার মধ্যে ডুবে যাই আমি—আইনের বই। The State vs. Percival, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা।

ও বলে, আমার মনে হয় এতদিনে—

—এতদিনে কী?—জানতে চাই আমি।

—এতদিনে কী, তা তুমি ভালরকমই জান অল! তুমি কী আশা কর? বৃদ্ধ ভদ্রলোক হামাগুড়ি দিয়ে তোমার বাসায় এসে ক্ষমা চাইবেন? অলি, দেখ, তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—

—ষাঁড়ের গোবর! দেখছ না, খামের উপর হাতের লেখাটা আমার মায়ের?

—তাই নাকি! তবে যে বললে, তুমি চিঠিটার দিকে তাকিয়েও দেখনি?

—বেশ, না হয় দেখেছি! তাতে হলটা কী? আমার এখন সামনে পরীক্ষা!

—অলি, একটা কথা ভেবে দেখ! ষাট বছর বয়সটা বড় কম নয়; হয় তো যতদিনে তুমি মিটমাট করতে রাজী হবে ততদিনে তিনি একেবারে ভেঙে পড়বেন! তুমি কি—

আমি বাধা দিয়ে বলি—বুড়োটার সঙ্গে আমার এ জীবনে কোনদিনই মিটমাট হবে না। সেটা হবার নয়!

জেনী আমার বিছানায় এসে পায়ের দিকে বসে পড়ল। সে কোন কথা বলছে না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, সে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। অগত্যা বই বন্ধ করে তার দিকে ফিরে বসলাম।

—তুমি কি একটা কথা ভেবে দেখেছ? একদিন ঠিক ঐভাবে তোমার সন্তান অলিভার ব্যারেট V—

—না!—আর্ত চীৎকারে ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিই! বলি, না। তার নাম 'অলিভার ব্যারেট V' হবে না!

জেনীর কণ্ঠস্বরে পর্দা চড়ল না। একইভাবে ও বলতে থাকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, অল। ধরা যাক তুমি তার নাম রাখলে 'হোঁদল কুৎকুৎ'; কিন্তু সেও তো তোমার প্রতি এ রকম ব্যবহার করতে পারে! সে যতদিনে নওজোয়ান হয়ে উঠবে ততদিনে তুমি হয়তো সুপ্রিম কোর্টের এক পলিতকেশ বৃদ্ধ!

আমি বললাম, তা হতে পারে না। ছেলের সঙ্গে আমার কোন মতবিরোধই হবে না, হতে পারে না। ও জানতে চাইল—কেমন করে এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হলাম। ওয়েল, প্রমাণ আমার হাতে নেই, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে না পারলেও—আমি দৃঢ়স্বরে বললাম—এ আমি নিশ্চিতভাবে জানি কারণ আমি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসব।

জেনী হাসল। বললে, ও! ভালবাসা! কিন্তু অলিভার, তোমার বাবাও তোমাকে ভালবাসেন, ঠিক যেভাবে তুমি হোঁদল কুৎকুৎকে ভালবাসবে, সেই ভাবেই। তবে তোমাদের ভালবাসার ধরনটাই যে ঐ রকম—তোমরা, ব্যারেটরা এত আত্মকেন্দ্রিক, এত প্রতিযোগিতা-পরায়ণ যে, পরস্পরকে শুধু ঘৃণা করতে করতেই তোমরা ভালবাসতে জান!

আমি ঐ প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ টেনে বলি: আমাকে বইটা পড়তে দাও।

—দাঁড়াও! আরও একটা ব্যাপার আছে। ঐ 'আর. এস. ভি. পি.'?

তা আছে। সৌজন্য বলে, নিমন্ত্রণ-পত্রের এক প্রান্তে ঐ চারটি অক্ষর ছাপা থাকলে প্রাপককে জানাতে হয় সে নিমন্ত্রণ রাখতে আসবে কি না। কিন্তু র‍্যাডক্লিফের সঙ্গীত-গ্র্যাজুয়েট কি আমার সাহায্য ছাড়া অমন একটা প্রত্যাখ্যান-পত্রও মুশাবিদা করতে পারে না?

জেনী কাতর ভাবে বললে, অল, শোন। দেখ, জীবনে মিথ্যা হয়তো বলেছি, লোককে অজ্ঞানে ঠকিয়েছিও; কিন্তু বিশ্বাস কর, জ্ঞাতসারে কখনও কোন মানুষকে আমি অহেতুক আঘাত দিইনি! ওটা আমি বোধহয় চেষ্টা করলেও পারব না।

ততক্ষণে আমি ধৈর্যের প্রান্তসীমায় উপনীত। গম্ভীর হয়ে বললাম, প্রীজ জেনী, জবাবে তুমি যা-ইচ্ছে লিখতে পার—যতটা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করতে চাও ততটাই বিনয় দেখিও। শুধু দয়া করে মনে রেখ—পৃথিবী রসাতলে গেলেও আমরা দুজনে ঐ নিমন্ত্রণ রাখতে যাচ্ছি না!

আবার বইটা টেনে নিলাম আমি।

—নম্বরটা কত?—তাকিয়ে দেখি জেনী টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েছে।

—টেলিফোন করার কী দরকার? একখানা চিঠি লিখে দাও না?

জেনী গম্ভীরভাবে বলল, আমার ধৈর্যেরও সীমা আছে, অল। নম্বরটা কত?

একরোখা মেয়েটাকে চিনতে বাকি নেই। ঝামেলা না বাড়িয়ে নম্বরটা বাৎলে দিয়ে পার্সিভালের সঙ্গে সুপ্রীম-কোর্টে ফিরে গেলাম। সুপ্রীম-কোর্ট অনেক দূর, সেখান থেকে জেনীর দূরভাষণ শুনতে পাবার কথা নয়। তবু শুনতে পাচ্ছিলাম—

—গুডমর্নিং স্যার! আমি জেনী, জেনী ব্যারেট—

ওয়োরের বাচ্ছাটাই টেলিফোন ধরেছে নাকি? ওর তো এখন ওয়াশিংটনে থাকার কথা। কাগজে তাই তো দেখলাম। তবে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'কে বিশ্বাস নেই। আঃ! 'আমরা যাচ্ছি না'—এই কথাটা বলতে কতক্ষণ লাগে?

—অলি!—তাকিয়ে দেখি, টেলিফোনের কথামুখে হাত চাপা দিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে: অলি, তোমার মতটা কি কিছুতেই বদলাবে না?

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লাম আমি।

ও টেলিফোন থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত—মানে আমরা দুজনেই অত্যন্ত দুঃখিত স্যার···

আমরা! দুজনেই। আমাকে জড়ানোর কি কোন প্রয়োজন ছিল?

—অলিভার!

আবার কী? কী আশ্চর্য! এখনও লাইনটা কাটেনি। এখনও টেলিফোনের কথামুখে ওর হাত চাপা দেওয়া। বললে, বৃদ্ধ সত্যই মর্মাহত হয়েছেন। উনি আশা করেছিলেন···মানে প্লীজ অলিভার···একটা লোকের রক্ত ঝরছে, আর তুমি নির্বিকারভাবে··

কি করে ওকে বোঝাই—অলিভার III পাথরে গড়া। পাথরে আঘাত করলে রক্ত ঝরে না। ও আবার আমাকে বলে, অল! তুমি নিজে দু-একটা কথা বলবে?

ওকে! ঐ পাথরের মূর্তিটাকে! জেনী কি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে?

—মানে, যা হোক কোনও কথা···জাস্ট একটা 'হ্যালো'!

—আমি কোনদিন ওর সঙ্গে কথা বলব না। এ জীবনে নয়!—দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করি।

তাকিয়ে দেখলাম জেনী কাঁদছে। শব্দ হচ্ছে না কিন্তু। শুধু ওর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর দুটি ধারা নেমে এসে টপ টপ করে পড়ছে টেলিফোনের মাউথপীসে। আর তখনই—ঠিক তখনই জেনীর একটা নতুন রূপ দেখলাম। সেই জেদি তেজিয়ান মেয়েটার একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপান্তর। জেনী ভিক্ষা চাইছে!

—আমার অনুরোধ অলিভার! আমি কখনও তোমার কাছে কিছু চাইনি। আজ চাইছি! দেবে? শুধু দুটি মিষ্টি কথা? বলবে?

আমরা তিনজন। আমরা তিনজনে নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি (হ্যাঁ, আমার মনে হল আমার পিতৃদেব—সেই শুয়োরের বাচ্ছাটাও দাঁড়িয়ে আছে এ ঘরে)!

জেনী কি বুঝতে পারছে না—সে যেটা চাইছে তা আমার অদেয়? আমি কার্পেটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সেইভাবেই মাথা নেড়ে ওর ভিক্ষাটা প্রত্যাখ্যান করলাম আমি। জেনী দাঁতে দাঁত চেপে আমাকে ভৎর্সনা করল। ওর এ রূপটাও আমি জীবনে কখনও দেখেনি। ও অস্ফুটে শুধু আমাকে বললে, তুমি একটা হৃদয়হীন জানোয়ার!

টেলিফোন রিসিভার থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে পরমুহূর্তেই সে বললে, মিস্টার ব্যারেট, অলিভার আপনাকে বলতে চায়, তার নিজস্ব পন্থায়···

নিঃশ্বাস নেবার জন্য ওকে থামতে হল। ও তখন কাঁদছিল। ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে। তাই একটু দম নিয়ে শেষে বলল, ওর বিচিত্র পন্থায় আপনাকে সত্যিই ভালবাসে।

শক্তির শেষ বিন্দুটি ব্যয়িত করে এতক্ষণ সে রিসিভারে যন্ত্রটা নামিয়ে রাখে। ঠিক পরমুহূর্তটিতেই আমি যে কাণ্ডটা করে বসলাম তার কোনও কৈফিয়ৎ নেই। বোধহয় খণ্ডমুহূর্তের জন্য আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম—এটাই আমার কৈফিয়ৎ। না! কোন কৈফিয়ৎই আমি দেব না। আমি যা করেছিলাম তার ক্ষমা নেই।

আমি এক ছুটে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। টেলিফোনটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম। এবং দেওয়ালের উপর আছড়ে সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললাম—God damn you, Jenny! Why don't you get the hell out of my life?

নিশ্চল কয়েকটি মুহূর্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলাম। জানোয়ারের মত। জানোয়ারই তো। হায় ঈশ্বর! আমি কি সত্যই জানোয়ার? ধীরে ধীরে সম্বিত ফিরে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম ওর দিকে।

কিন্তু ও কোথায়?

আশ্চর্য! জেনী নেই। 'নেই' মানে কোথাও নেই। ঘরে নেই, বারান্দায় নেই, উঁকে মেরে দেখি—না, রাস্তাতেও নেই। নিঃশব্দে কেমন করে চলে গেল সে? কখন? সেই যখন আমি দুনিয়ার বার হয়ে জানোয়ারের মত হাঁপাচ্ছিলাম?

…এরপর অলিভারের ব্যর্থ সন্ধানের দীর্ঘ বিবরণ। ঘটনা সন্ধ্যার, কিন্তু রাত একটা পর্যন্ত সম্ভব অসম্ভব সর্বত্র সন্ধান নিয়েও সে জেনীকে খুঁজে পায় না। না, ল-স্কুল লাইব্রেরীতে নেই। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীদের বাড়িতে সে যায়নি, এমনকি বাপের কাছেও সে ফিরে যায়নি। লক্ষ্য করে দেখল—জেনী তার ওভারকোট এবং টুপিটাও নিয়ে যায়নি—অথচ বাইরে প্রচণ্ড বরফ-পড়া ঠাণ্ডা। দেহে-মনে চরম পরিশ্রান্ত হয়ে অলিভার ফিরে এল সেই তাদের অভাবের সংসারে। তারপর ওর ভাষাতেই শুনুন—

রাত একটা বেজে গেছে। সমস্ত পাড়া নিশুতি। আর দৌড়াচ্ছি না আমি। দৌড়ানোর পালা শেষ হয়ে গেছে। সেই পরিত্যক্ত শূন্য ঘরে ফিরে আসতে দৌড়াব কেন? বাড়ির কাছাকাছি এসেই দেখতে পেলাম—সিঁড়ির উপর, সদর দরজার সামনে কে যেন শীতের মধ্যে গুঁড়িসুড়ি মেরে বসে আছে। তার গায়ে মাথায় স্নো-ফ্লেক।

জেনী!

আতঙ্কগ্রস্ত হবার মত মনটাও অবশিষ্ট ছিল না, কথা বলারও শক্তি নেই। একমাত্র আশা ছিল—ওর হাতে একটা শক্ত কিছু থাকবে, যা দিয়ে ও আমাকে আঘাত করবে। ছিল না! ও রিক্তহস্তা।

—জেন?

—অলি? আমি চাবিটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। চল, ঘরে যাই।

জানি না, কতক্ষণ হল সে এসেছে। কতক্ষণ এই প্রচণ্ড শীতে সদর দরজার সামনে বসে কাঁপছে হিহি করে। দোষ করলাম আমি, আর শাস্তি পাচ্ছে ও। আমি এগিয়ে এসে বললাম, জেনী, আয়াম সরি—

—থাম

জেনী ঘুরে দাঁড়ালো আমার মুখোমুখি। তারপর শান্তস্বরে বললে, Love means not having to say you're sorry—

[ভালবাসার অভিধানে 'সরি' শব্দটার ঠাঁই নেই]

নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই। ওদের নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্যের সংসারেও এল হঠাৎ আলোর ঝলকানি অলিভার দারুণ রেজাল্ট করে আইন পরীক্ষায় পাস করেছে। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে হয়েছে তৃতীয়। প্রথম হয়েছে যে ছেলেটি সে নিতান্ত বইয়ের পোকা, দ্বিতীয় একটি ডিসপেপটিক ছাত্রী। ফলে হার্বার্টের পপুলার খেলোয়াড় অলিভার III এর বাজারদর প্রচণ্ড। একাধিক ভালো ভালো চাকরির অফার পেল সে। শেষমেষ জয়েন করল নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত সলিসিটার্স ফার্ম: 'জোনহা অ্যাণ্ড মার্স'-এ। সসঙ্কোচে লেখক বলছেন, একটা কথা বলি—ওঁরা আমাকে এগারো হাজার আটশ ডলারের অফার দিয়েছিলেন—আমাদের বছরে এত বেশি মাহিনার চাকরি কেউ পাইনি। অর্থাৎ থার্ড হয়েছিলাম শুধু পরীক্ষার লিস্টে!

নতুন চাকরিতে যোগদান করে অলিভার একদিন বললে, এ্যাই, একটা কথা বলব, হাসবে না তো?

জেনী রান্নাঘরে তরকারি কুটছিল, বেরিয়ে এসে বললে, কী এমন কথা?

—কদিন ধরে ঐ নামটা আমাকে 'হন্ট' করছে।

—নাম! কোন নাম?

—ঐ 'হোঁদল কুৎকুৎ'! দারুণ নামটা দিয়েছ তুমি রাগের মাথায়।

জেনী হেসে ফেলে আমার ভাবসাব দেখে।

কিন্তু একটু চিন্তা-ভাবনা করার পরে আমাদের দুজনেরই মনে হল—তাই

তো। এতদিনেও আমাদের সন্তান হল না কেন? কোন গণ্ডগোল নেই তো? থাকলে কার? ওর, না আমার? এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অগত্যা ডক্টর মটিমার শেফার্ড-এর সঙ্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট করে দুজনেই একদিন তাঁর চেম্বারে হাজির হলাম। ডক্টর শেফার্ড আমাদের দুজনকেই পরীক্ষা করলেন—নানান পদ্ধতিতে। সেটা ছিল সোমবার; বললেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যেই জানা যাবে আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ কি না—অর্থাৎ পিতামাতা হওয়ার উপযুক্ত কিনা! বৃহস্পতিবার টেলিফোন করতেই ডাক্তারবাবু বললেন, জেনীকে আর একবার ওঁর চেম্বারে যেতে হবে। ওর রক্ত পরীক্ষাটা আবার করা দরকার। ওঁর নার্স বুঝি কি গড়বড় করে ফেলেছে আগেকার স্লাইডটা নিয়ে। এ নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি, নার্স তো গড়বড় করতেই পারে; তবু দুজনেরই মনে হল—গণ্ডগোল যদি আদৌ কিছু থাকে তবে তা জেনীর, আমার নয়।

পরদিন ডক্টর শেফার্ড আমাকে অফিসে টেলিফোন করলেন; বললেন, অফিস ছুটির পর যেন ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করি। তখনই নিঃসন্দেহ হলাম। তাহলে শারীরিক ত্রুটিটা জেনীরই। কিন্তু সেটা কতদূর? চিকিৎসার অতীত? টেলিফোনে বললাম, জেনীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাব? ডাক্তারবাবুর প্রতিবাদটায় কেমন যেন খটকা লাগল, না, না তুমি একাই এস।

অফিস ফেরত ওঁর চেম্বারে গিয়ে দেখা করলাম। বললাম, তাহলে দোষটা জেনীরই এ-কথা বলবেন বলে ডেকেছেন তো?

—না, না, 'দোষ' কথাটা আপত্তিকর।

—ঠিক আছে, না হয় 'শারীরিক অপূর্ণতা'—

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন না! কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বললাম, বুঝেছি। অসুস্থতাটা চিকিৎসার অতীত। ঠিক আছে। আমরা না হয় অর্ফনেজ থেকে ছেলেকে নিয়ে আসব। এতে এত ভেঙে পড়ার কী আছে? যেন আমিই ডাক্তার, আর ডক্টর শেফার্ড পিতৃত্ব থেকে বঞ্চিত রোগী। উনি এতক্ষণে কথা বললেন, অলিভার, সমস্যাটা তার চেয়েও বড়···অনেক, অনেক বড়···মানে জেনী অসুস্থা, অত্যন্ত অসুস্থা।

—তাই তো বললেন এখনই···

—না! এখনও বলিনি···জেনী, জেনী মারা যাচ্ছে!

—'মারা যাচ্ছে'। তার মানে?

—বলতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে অলিভার · কিন্তু বলতে আমাকে হবেই। ব্লাড ক্যান্সার! লিউকেমিয়া—

আমি ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিলাম। এ হতে পারে না। অসম্ভব। কী দুর্দান্ত স্বাস্থ্য জেনীর। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল হয়েছে। ডাক্তারবাবু কোনও প্রতিবাদ করলেন না। বললেন না যে, তিনি তিন-তিনবার পরীক্ষা করে স্থির-সিদ্ধান্ত হয়েছেন। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকলাম। ধীরে ধীরে বুঝলাম, এ অনিবার্য পরিণামকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রশ্ন করলাম, জেনাকে কী বলেছেন?

—বলেছি যে, তোমরা দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ। যে কোন দিন ও 'মা' হতে পারে।

—তাহলে আসল কথাটা তাকে কখন বলা হবে?

—সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে অলিভার।

ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিলেন—এ জাতের লিউকেমিয়ার কোনও চিকিৎসা নেই অনিবার্যর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া। আমি হঠাৎ সংযম হারিয়ে বলে বসলাম, ডক্টর! জেনীর বয়স মাত্র চব্বিশ!

যেন ডাক্তারবাবুর সে কথা জানতে বাকি। উনি একটা হাত আমার কাঁধে রেখে বললেন, যতদিন সম্ভব, যতখানি তোমার পক্ষে সম্ভব ওর সঙ্গে স্বাভাবিক-ভাবে ব্যবহার কর। যেন, কিছুই হয়নি!

যেন কিছুই হয়নি!

জীবনে এই প্রথম ঈশ্বরের কথা মনে পড়ল।

পরীক্ষার সময়, বল নিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, মাঝে মাঝে তাঁর কথা আগেও ভেবেছি। এবার অন্য রকম। আমার যা স্বভাব তাতে এ-ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মোকাবিলা করতে অন্যভাবে আমার চিন্তা করার কথা! আশ্চর্য! আমারও স্বভাবের বোধহয় পরিবর্তন হয়ে গেছে। চোয়ালে একটা বিরাশী-সিক্কা আণ্ডারকাট মারবার ইচ্ছা নিয়ে ঈশ্বরকে আহ্বান করিনি। গালমন্দ করতেও নয়। সকালে ঘুম ভেঙে যখন দেখতুম—জেনী ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে তখন আমি ঈশ্বরকে বলতাম, তোমাকে ধন্যবাদ—আমার আজকের দিনটা তুমি সার্থক হতে দিয়েছ।

না, জেনীর নিত্যকর্মপদ্ধতির কোনরকম পরিবর্তন হতে দিইনি। রান্নাবান্না সে হু করছিল। আমার আচরণে সে যেন না সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। আমাকে যে স্বাভাবিক থাকতে হবে। যেন কিছুই হয়নি!

—আজ তো তোমার খেলা আছে—অফিস থেকেই ক্লাবে যাবে? স্ক্রাম্‌বল্‌ড এগ্‌ বানাতে বানাতে জেনী প্রশ্ন করে।

আমি কাগজে মুখটা আড়াল করে বলি, না। আজ খেলতে যাচ্ছি না।

জেনী ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, কেন বলতো? হঠাৎ এত ঘরকুনো হয়ে উঠলে কেন?

—দূর! খেলতে ভাল লাগে না।

জেনী এগিয়ে এসে খবরের কাগজটা কেড়ে নেয় আমার মুখোমুখি বসে বলে, শোন অল, খোলা কথা বলে দিচ্ছি। দু-দশ বছরেই তোমার পেটে চর্বি জমলে আমি তোমার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব। না। খেলাটা ছাড়তে পারবে না, কিছুতেই। ভুলে যেও না, তুমি মিস্টার হোঁদল কুৎকুৎ ব্যারেট নও। সে তোমার ছেলে।

আমার বোধ· ·খানে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠার কথা, নয়? আমি শুধু বললাম, না, ভাবছিলাম আজ দুজনে থিয়েটার দেখতে যাব। যাবে?

ও মুখ টিপে হেসে বলল, তার মানে বোঝ? নগদ তিনটি ডলার!

এ ক্ষেত্রেও আমার প্রতিবাদ করার কথা। দেড় ডলারের টিকিট কাটব কেন আমি? আমার কি এখন টাকার অভাব অভাব তো সময়ের, দাম্পত্য-জীবনের অবশিষ্ট কটা মুহূর্ত। কিন্তু, জবাব দিতে আমার দেরি হয়ে গেল। জেনীই হাসতে হাসতে পাদপূরণ করে: তোমার দেড় ডলার, আমার দেড় ডলার!

অলিভার ব্যারেট IV ক্লাবে যায় না, মাঠে যায় না, অফিস ছুটি হবার আগেই বেরিয়ে পড়ে, আর গুটিগুটি বাড়ি ফিরে যায়। তোমরা এর কারণটা আন্দাজ করতে পার? তোমরা পার—কারণ খবরটা তোমাদের জানা। জেনী পারে না। পারবে কেমন করে? আসলে যে কিছুই পরিবর্তন হয়নি, আমি যে স্বাভাবিক। ব্যাঙ্ক থেকে একলপ্তে হঠাৎ অনেক টাকা তুলে ফেললাম। দুখানা টিকিট কিনতে, নিউইয়র্ক টু প্যারী। তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। টিকিট দুটো পকেটে নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। আজ জেনীকে অবাক করে দেব। খুশিয়াল হয়ে উঠবে সে। আমরা দুজনে য়ুরোপ দেখিনি আজও। বেল দিতেই দরজা খুলে দিল জেনী। দরজায় ফ্রেমে বাঁধানো যেন জেনীর পূর্ণাবয়ব পোর্ট্রেট!

—একটা দারুণ খবর আছে। সেটা কী, আন্দাজ করতে পারেন মিসেস ব্যারেট?

—পারি! তোমার 'চাকরি নট' হয়ে গেছে!

—আজ্ঞে না মশাই। এই দেখুন। —পকেট থেকে ট্রাভেল এজেন্সি·· ·কেট

ছুটো বার করে ওকে দেখাই। বলি, কাল রাতের প্লেনে আমরা ছুজনে য়ুরোপ ট্যুরে যাচ্ছি। বন্-ভয়েজ মিলেস্ ব্যারেট!

প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হল না। জেনী শুধু বললে: ষাঁড়ের গোবর!

এমন তো হবার কথা নয়। পারী হচ্ছে জেনীর স্বপ্নের স্বর্গ।

একটু থতমত খেয়ে বলি, ঐ ষাঁড়ের গোবরটা বিশ্লেষণ করলে কি দাঁড়ায়?

—ষাঁড়ের গোবর বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—আমরা য়ুরোপ যাচ্ছি না।

—হেতু?

—আমি পারী চাই না, আমি বেড়াতে যেতে চাই না, আমি···আমি শুধু তোমাকে চাই, অলি!

—আমি তো তোমারই আছি সোনামণি! কী অদেয় আছে বল?

হঠাৎ ছু-হাত দিয়ে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, টাইম! সময়! যা তুমি ইচ্ছে করলেও দিতে পারবে না।

আমার বুকে ওর বুকের স্পন্দন। এ আলিঙ্গন প্রেমের নয়,—প্রাণধারণের তাগিদে অতলস্পর্শী খাদের মুখে মানুষ যেভাবে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে সেইভাবে জেনী জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। ওর মুখটা দেখা যাচ্ছে না। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ও অস্ফুটে বললে, শরীরটা খারাপ লাগছিল। ট্যাক্সি নিয়ে ডক্টর শেফার্ডের চেম্বারে গিয়েছিলাম। উনি সব কথা আমাকে বলে দিয়েছেন, অলি!

ছুজনে ছুজনকে আঁকড়ে আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি। কেউই কাঁদছি না! কিন্তু হে ঈশ্বর, কান্নায় যদি কোন একজন ভেঙে পড়ে, তবে তুমি দেখ, যেন ছুজনেই একসঙ্গে ভেঙে পড়ে। একজন কাঁদছে, অপরজন কাঁদতে পারছে না, সে বড় বেমানান। আমি জীবনে কখনও কাঁদিনি। কাঁদতে শিখিনি আমি। কেমন করে কাঁদব?

একটা বিড়ম্বনা থেকে অন্তত অব্যাহতি পেয়েছি—ঐ অভিনয় করা থেকে: যেন কিছুই হয়নি! স্বাভাবিক হবার জন্য আর চেষ্টা করতে হচ্ছে না এখন—ছুজনেই স্বাভাবিক। নবদম্পতীর আনন্দঘন জীবনের পরিসরে প্রত্যাবর্তন করেছি আমরা, যদিও জানি—আমাদের প্রতিটি মিনিট সীমিত। এখন খোলাখুলি প্রসঙ্গটা আলোচনা করা যাচ্ছে। ও একদিন বললে,

—তোমার উপর আমি কিন্তু অনেকটা ভরসা করছি, অলি! তোমাকে শক্ত হতে হবে। মাঠে তোমাকে যে-ভাবে খেলতে দেখেছি—

—আমি শক্তই আছি জেন্, শক্তই থাকব।

—না, আমি বাবার জন্ত ভাবছিলাম। ওঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার দায়িত্বটা তো তোমাতেই বর্তাবে! অনেক বয়স হয়েছে তো। তোমার আর কী? সাতাশ বছরের প্রমিসিং ল-ইয়ার। বিপত্নীক! সে তো বাঁধনছাড়া, বেপরোয়া, খুশিয়াল—

—আমি খুশিয়াল বিপত্নীক হব না জেন্!

—'খুশিয়াল' তোমাকে হতে হবে! আমার হুকুম! বুঝলে?

—বুঝলাম।

—'খুশিয়াল' হবে তো?

—হব!

আরও মাসখানেক পরে। নৈশাহার শেষ করে জেন অর্গানে বসে 'চোপিন'; বাজাচ্ছিল। হঠাৎ অন্তরায় ওর বাজনা থেমে গেল। ঘূর্ণ্যমান টুলটায় অর্ধ-চন্দ্রাকার পাক দিয়ে আমার মুখোমুখি বসল। বললে, ভাবছি একটু বেরুব। ট্যাক্সির ভাড়া মেটাবার মত টাকা আছে তোমার ব্যাগে?

—আলবৎ। কোথায় যাবে ভাবছ?—আমি উৎসাহে উঠে বসি।

—ধর যদি হাসপাতালে যাওয়া যায়?

তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম। এই মুহূর্তটার জন্তই আজ দু-তিন মাস কণ্টকিত আতঙ্কে প্রতীক্ষা করছি। ও বুঝতে পেরেছে। ওর শরীরের ভিতরে কিছু একটা ইঙ্গিত সে পেয়েছে। ও নড়াচড়া করছে না। পিয়ানোর টেবিলটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে বসে আছে। আমি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটা ব্যাগে ওর জামা-তোয়ালে-টুথব্রাশ চিরুনি ভরে নিলাম। ও আমাকে কোন সাহায্য করল না—বোধহয় সে ক্ষমতাও ছিল না ওর। শেষে বলি, কোন বিশেষ কিছু তুমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও?

—এ্যাঁ?···ও হ্যাঁ! তোমাকে!

দুজনে নেমে এলাম নিচে। এ সময়টা থিয়েটার ভাঙার সময়। সেই যেসব নবদম্পতী তিন ডলার খরচ করে থিয়েটার দেখতে যায়, তাদের মরশুম। আমাদের দারোয়ানটা ট্যাক্সি ধরবার জন্ত ছুটাছুটি করছে। আধো-অন্ধকারে জেনী তার দেহভার আমার দেহে ন্যস্ত করে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। ভাব-ছিলাম, হে ঈশ্বর, ট্যাক্সি যেন না পাওয়া যায়! অনিবার্য পরিণামটা তো অপরিবর্তনীয়! জেনকে আমার কাছ থেকে তুমি কেড়ে নেবে। মোদ্দা

কথাটা তো এই ? তাহলে হাসপাতালের প্রহসন কেন নাও না। কেনই। আমার বাহুবন্ধেই ওকে মুক্তি দাও না কেন ? সবাই তো বলে—তুমি করুণাময়।

অবশেষে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ড্রাইভারটা লোক ভালো। বেশ হাসিখুশি। আমাদের একনজর দেখে নিয়ে বললে, বাছারা, ভয় পেও না। তোমরা অভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়েছ। আমার গাড়িতে যারাই হাসপাতালে গেছে, 'লালজুতুয়া' পরা সোনার গোপাল কোলে নিয়ে তারা বাড়ি ফিরেছে।

পিছনের সীটে জেনী আমাকে ততক্ষণে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছে।

—এই বুঝি প্রথমবার ?—জানতে চাইল ড্রাইভার স্টিয়ারিঙ ঘোরাতে ঘোরাতে আমি মনে মনে বললুম, না, এই শেষ বার! প্রকাশ্যে বলি, হ্যাঁ, একটু জোরে চালাতে পার ভাই ?

লোকটা সত্যি ভাল। নিমেষমধ্যে হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে পৌঁছে দিল। নিজেই দরজার হাতল ধরে টেনে জেনীকে নামতে সাহায্য করল। বললে, কিছু ভেব না মা। সোনার চাঁদকে কোলে পেলেই সব দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যাবে। অদ্ভুত মেয়ে ঐ জেনিথার ক্যাভিলেরি—হোঁদল কুৎকুতের মা—ঐ শরীর-মনের যন্ত্রণা অস্বীকার করে সে মিষ্টি হাসবার চেষ্টা করল

বললে, থ্যাঙ্কু।

জেনীকে ওরা ভিতরে নিয়ে গেল। একটা টুল দেখে আমি বসে পড়ি।

অল্পবয়সী একজন ডাক্তার আমাকে একখানা রেজিস্টারে কী-সব লিখতে বললেন। লিখে দিলাম। কী—তা মনে নেই। প্রশ্ন করলেন, কোনও মেডিকেল ইন্সুরেন্স আছে কিনা। জবাবে জানলাম, না নেই। সব খরচই আমার এবং ঐ সঙ্গে বললাম—আর একটা কথা। আমি চাই বেস্ট কেবিন। স্পেশাল নার্স। ওর যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়। খরচের কথা ভাববেন না।

ছেলেটি বললে, এমন রুগী কিন্তু মাসের পর মাস টিকেও থাকে।

আমি ওর নাকে ঘুষি মারিনি। শুধু বলেছিলাম: বছরের পর বছর হলেও!

মানহাট্টান সিক্সটি থার্ড স্ট্রীটের পূর্ব প্রান্ত থেকে বোস্টনের মাস টার্নপাইক পর্যন্ত আজ পর্যন্ত কোনও গাড়ি—তা সে আমেরিকান মেকই হ'ক অথবা বিদেশী রসিং কারই হোক- কোনদিন তিন ঘণ্টা বিশ মিনিটে পাড়ি দিতে পারেনি। বিশ্বাস করুন, জেনীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে, গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে ঐ সময়ের মধ্যেই আমি সেখানে এসে পৌঁছলাম সকাল আটটায়। অলিভার

ব্যারেট III যে সকাল সাতটার মধ্যে অফিসে হাজিরা দিয়ে থাকেন এটা অজানা নয়। ওঁর চেম্বারের সামনে ভিজিটার্স লাউঞ্জে সাত-আটজন বিশিষ্ট বিজনেস-ম্যাগনেট অপেক্ষা করছেন। ওঁর সেক্রেটারী--সে আমাকে ছোটবেলা থেকেই চেনে—আমাকে দেখেই থতমত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ইন্টারকমে আমার নামটা জানালো। প্রতীক্ষমান দর্শনার্থীরা সবিস্ময়ে দেখল, অলিভার ব্যারেট III ভিতর থেকে কোন সাড়া দিলেন না। পরমুহূর্তেই তাঁর ঘরের দরজার প্যানেল খুলে গেল; দেখা গেল উনি উঠে এসেছেন দ্বার-প্রান্তে, অলিভার?

আমি এতটা অভিভূত ছিলাম যে, আমার নজর হল না—বৃদ্ধ বৃদ্ধতর হয়েছেন; এ তিন বছরে ওঁর চুল আরও পাতলা, আরও সাদা হয়ে গেছে।

—ভিতরে আয়!

'তুমি' নয়, তুই!

ওঁর পিছন পিছন ঘরে ঢুকে ওঁর ভিজিটার্স চেয়ারে এসে বসলাম।

কতক্ষণ দুজনে মুখোমুখি বসে ছিলাম? জানি না। আমি অন্তত ওঁর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি। ফাইল, টেলিফোন, ইন্টারকম, পেন্‌সিল স্ট্যাণ্ড—ও পাশে একটা ফটো স্ট্যাণ্ড। মায়ের ছবি, আর·· হ্যাঁ, আমার!

—কেমন আছিস!

—ভালো।

--আর জেনিফার?

পারলাম না। নির্জলা মিথ্যেটা আটকে গেল গলায়। বলতে পারলাম না, সে মৃত্যুশয্যায়। এখনও বেঁচে আছে কি না জানি না। অথচ—কী আশ্চর্য—ওর কথা বলব বলেই তো এসেছি। পাগলের মত এতটা ড্রাইভ করে!

—কিরে জেনি কেমন আছে?

—বাবা (হ্যাঁ, পিতৃ-সম্বোধনই করেছিলাম—গরজ বড় বালাই) আমি তোমার কাছে হাজার পাঁচেক ডলার ধার করতে এসেছি।

—ও!

—দেবে?

—কারণটা জানতে পারি?

—না! আমি বলতে পারব না! দয়া করে টাকাটা দেবে?

ঐ ধনকুবেরের কোটি-কোটি ডলারের মধ্যে থেকে একমাত্র পুত্রকে পাঁচ হাজার ডলার ধার দিতে লোকটার নিশ্চয়ই আপত্তি ছিল না—সে পরিবর্তে চাইছিল···

চাইছিল, অন্তত আমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে। তাই বললে, তোমাকে জোন্‌হা অ্যাণ্ড মার্স তো ভালই মাহিনা দেয়, দেয় না?

আমি জবাবে শুধু বললাম, দেয়।

কত দেয় তা বলিনি। অপ্রয়োজন বলে। আমি কোথায় চাকরি করি তা আমি ওকে জানাইনি। সে খবরটা যদি ও সংগ্রহ করে থাকে তবে একথাও নিশ্চয় জানে যে, আমাদের বছরের ছাত্রদের ভিতরে আমার রোজগারই সবার চেয়ে বেশি।

—আর তোমার বউও তো স্কুলের দিদিমণি?

কথাটা আমার ভাল লাগল না। বলি, 'তোমার বউ' শব্দটা ভাল লাগছে না।

ও প্রতিপ্রশ্ন করল না, তবে কী বলব? 'আমার পুত্রবধূ'?

বরং বললে, তোমার বিপদটা কিসের? স্ত্রীলোকঘটিত ফ্যাসাদ?

আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, ঠিক তাই! টাকাটা দেবে?

আভিজাত্যের শিক্ষাই অন্যরকম। অলিভার ব্যারেট III ধীরে-সুস্থে টানা ড্রয়ারটা খুললেন। চেক বইটা বার করে লিখলেন—নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরলেন চেকটা। হয়তো হাত বাড়িয়ে চেকটা নিতে খণ্ড-মুহূর্তের বিলম্ব হয়ে গেল! উনি ভুল বুঝলেন। হয়তো ভাবলেন, হাতে-হাতে চেকটা নিতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে—আভিজাত্যের অভিমানে বাধছে—আমিও তো অলিভার ব্যারেট IV। উনি চেকটা টেবিলে রেখে একটা কাগজ-চাপা দিয়ে চাপা দিলেন। আমি সেটা নিয়ে পকেটে রাখলাম। এ রকম নিশ্চুপ মুখোমুখি বসে থাকার কোন মানে হয় না। বাইরের লাউঞ্জে একাধিক দর্শনার্থী ধনকুবের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় আছেন—এ আমার স্বচক্ষে দেখা। তাই উঠে দাঁড়াই। দরজা পর্যন্ত গিয়ে সাহসে বুক বেঁধে ফিরে দাঁড়াই। দেখি, বৃদ্ধ নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছেন অপসৃয়মান অলিভার ব্যারেট IV-এর গমনপথের দিকে। আধখোলা দরজার ও-প্রান্ত থেকে শুধু বললুম, থ্যাঙ্ক ফাদার!

ফিল ক্যাভিলেরী—জেনীর বৃদ্ধ বাপকে দুঃসংবাদটা জানানো বাকি। সেটা আমাকেই বলতে হবে। আর কে বলবে? ভেবেছিলাম বৃদ্ধ একেবারে ভেঙে পড়বে। তা কিন্তু পড়ল না। যেন বিশ্বাসই করল না ব্যাপারটা! দরজায় তালা দিয়ে এসে উঠল আমার সেই নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাট-বাড়িতে। অনিবার্য দুর্দৈবের সঙ্গে লড়াই করতে আমরা দু'জাতের হাতিয়ার বেছে নিয়েছি। আমি সংসারটা

অগোছালো করে চলি—কার জন্ত এসব গুছিয়ে রাখব? আর ফিল উঠে-পড়ে লাগল ঘর দোর সাফা করতে, গোছাতে—যেন ওর মেয়ে দুদিন পরে এ বাড়িতে এসে না বলে: ইস্ তোমরা কী নোংরা করে রেখেছিলে সব!

ফিল দিবারাত্র ডিশ্‌গুলো ধোয়, মোছে, পালিশ করে আপন মনে। করুক। যে যেভাবে পারে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিক।

একদিন পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম বুড়ো আপন মনেই বলছে, আর যে পারি না!

আমি সাড়া দিইনি। কী-ই বা বলতে পারতাম আমি? ঈশ্বরকেও ডেকে বলিনি, ওহে সর্বশক্তিমান, শুনতে পাচ্ছেন? আমি পারছি। আমি সহ্য করতে পারছি! শেষ পর্যন্ত সহ্য করেও যাব! কারণ জেনী হচ্ছে জেনী!

সেদিন সন্ধ্যায় ফিল-বুড়োকে নিয়ে হাসপাতালে যখন দেখা করতে গেছি তখন জেনী বললে, এই, একটু বাইরে যাও তো!

ফিস্-বুড়োর সঙ্গে ওর কী-এমন গোপন পরামর্শ থাকতে পারে? আমাকে ইতস্তত করতে দেখে ফের বলে, আমরা বাপ-বেটিতে দুটো গোপন-কথাও বলতে পারব না? দাঁড়িয়ে আছ কেন সঙের মত?

ঠিক আছে!—আমি চলতে শুরু করতেই ফের বলে, তাবলে দূরে চলে যেও না যেন। এখনই ডাকব তোমাকে। জরুরী কথা আছে।

একটু পরেই ফিল-বুড়ো বেরিয়ে এল। বললে, ও তোমাকে ভিতরে যেতে বলল। আমি এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনতে যাচ্ছি।

আমি ঢুকতেই বলে, দোরটা বন্ধ করে দিয়ে কাছে এস দিকিন!

আমি ওর খাটের কাছে এগিয়ে এলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, ওর মুখটা বিছানার চাদরটার মত সাদা। ওর ডান হাতে সুঁচ বিঁধানো একটা নল আছে, রক্ত দেওয়া হচ্ছে তাতে করে। আমার দিকে ফিরে বললে, বিশ্বাস কর অলি, আমার এখন কোনও যন্ত্রণা নেই। ইয়ে হবার সময়ও বোধহয় কষ্ট পাব না, নয়?

আমার তলপেটে কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হল, পেট থেকে কী-একটা গলা দিয়ে উঠে আসছে! কান্না নাকি? না, না, আমি কাঁদব না তো! আমি জীবনে কখনও কাঁদিনি—ছেলেবেলার কথা মনে নেই—জ্ঞান হবার পর কখনও কাঁদিনি।

—কী মনে হচ্ছে জান? ঠিক মনে হচ্ছে খুব, খু—ব উঁচু একটা পাহাড় থেকে আমি স্লো-মোশান পিকচারের ভঙ্গিতে নিচে পড়ে যাচ্ছি! তোমার কখনও এমন মনে হয়েছে?

আমি তো কাঁদব না। রসিকতা করব। তাই বললুম, হয়েছিল। যখন প্রথম তোমার প্রেমে পড়ি।

ও বোধহয় খুশি হল আমার জবাবে। বললে, আচ্ছা কোথায় আছে বলত—"Oh, what falling off was there?"

—মনে নেই, বোধহয় শেক্সপীয়র!

হ্যাঁ, শেক্সপীয়র তো বটেই; কিন্তু কোন নাটকে?

আমি জবাব দিইনি কোন জবাব কি ও প্রত্যাশা করছিল? এবার হঠাৎ সে আপন মনেই বললে, পিয়ানো কন্‌সার্টোতে সি-মাইনরের নম্বরটা কত?

এ প্রশ্নের উত্তর আমার জ্ঞানরাজ্যের বাইরে। তবু কথার কথা বলতে হবে, তাই বলি, কাল দেখে এসে বলব

—কিছুতেই মনে আসছে না। কী আশ্চর্য! এমন সহজ জিনিসটা···

আর সহ্য হল না আমার। বলি, জেনী। এখন কি গান বাজনার আলোচনা না করলেই নয়। অন্য কোন প্রসঙ্গ···

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, অন্য কোন প্রসঙ্গ? তুমি কি এখন 'ফিউনেরাল' নিয়ে আলোচনা করতে চাও?

মরমে মরে যাই আমি। বুঝতে পারি, ওকে বাধা দিয়ে ঠিক করিনি ওর হাতে একমুঠো সময় আছে—সে যেমনভাবে ইচ্ছে খেয়ালখুশিতে তা ব্যয় করুক।

—সে কথাইএতক্ষণ আলোচনা করছিলাম বাবার সঙ্গে। তুমি কি আমার কথা শুনছ অলি?

—শুনছি জেনী, বল?

—আমি ওকে বলেছি, ক্যাথলিক পদ্ধতিতে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে। তুমি রাজী তো?

কী এসে যায়? আমি মাথা নিচু করে বলি, রাজী।

হঠাৎ ধমকে ওঠে: মুখ নিচু করছ কেন অলি? তুমি তো কোন অপরাধ করনি।

অনেক কষ্টে আমি মুখ তুলে ওর চোখে-চোখে তাকালাম। জেনী বললে, অলি, আমি এখন যদি কিছু চাই, তুমি প্রত্যাখ্যান করবে না, তাই না?

আমি নির্বাক তাকিয়ে থাকি।

—পারীর দুটি টিকিটই ফেরত দিও না। তুমি একাই ঘুরে এস। দেশভ্রমণে তোমার মনটা হাল্কা হবে। কেমন? রাজী?

এবার আমার পক্ষে কথা বলা অসম্ভব।

—তুমি বুঝতে পারছ না? আমার কাছে এখন পারী-য়ুরোপ-অর্কেস্ট্রা সবই নিরর্থক! আমি খুব শান্তি নিয়ে সব কিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছি! বিশ্বাস করতে পারছ না?

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম. না! পারছি না!

হঠাৎ ক্ষেপে গেল ও। বললে, তাহলে চলে যাও এঘর ছেড়ে। আমাকে একা একাই লড়তে দাও শেষ লড়াইটা।

—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি. জেনী!

—এই তো লক্ষ্মী ছেলে! তাহলে আমার আর একটা অনুরোধ রাখবে? এইটাই শেষ—

কান্না রুখতে গিয়ে বাকশক্তি হারিয়েছি আমি। তাই শুধু মাথা নেড়ে সায় দিই।

—তুমি আমাকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরবে? 'ও' আসছে!

ও আসছে! মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে জেনী। আমি আলতো করে ওকে বুকে টেনে নিলাম। উঃ! কী ভীষণ রোগা হয়ে গেছে জেনী! তবু তখনও ওর বুকটা কবুতরের বুকের মত ধুকপুক করছে!

—না, অলি, ওভাবে নয়! জোরে, আরও জোরে! আগে যেমন ধরতে!

সত্যই তো—ঐ সব রাবারের নল পঁচ. ঔষধ ওসব তো এই মুহূর্তে নিরর্থক। ওর শেষ ইচ্ছার পথে ওরা কেন বাধা হয়? আমি ওকে সবলে বুকে টেনে নিলাম :

থ্যাংকস্, অলি।

এইটাই ওর শেষ কথা!

ঐ চরম পরিণতির পরেও এরিক শেগল আর একটি নতুন পরিচ্ছেদ লিখেছেন দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলাম মাত্র দেড়-পাতার একটি পারচ্ছেদ--তা হোক। কথাসাহিত্যের কারবারী হিসাবে আমার মনে হয়েছিল,—অকপটেই স্বীকার করব—এর পর যে-কোন কথা লিখতে বসলেই রসাভাস ঘটবে, অতিকথনের দোষ বর্তাবে দেখলাম, আমার ধারণাটা ভুল। দেড় পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটার আক্ষরিক অনুবাদ করে যাই বরং :

ফিল্ ক্যাভেলারী সামনের সোলারিয়ামে বসে তার এন্-এথ্তম সিগ্রেটটি ধ্বংস করছিল। আমাকে আগিয়ে আসতে দেখে সে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো। আমি অস্ফুটে শুধু বললাম, ফিল?

—ইয়া?—পরমুহূর্তেই বুঝলাম, ও বুঝতে পেরেছে।

আমি আস্তে করে হাতটা ওর কাঁধে রাখি। সে মুহূর্তে একটু সান্ত্বনার স্পর্শের জন্য ও বোধহয় কাঙাল হয়ে ছিল। আশঙ্কা ছিল ও কেঁদে ফেলবে। আমি নিশ্চিন্ত, আমি কাঁদব না। কাঁদতে পারি না। ও বারণ করে গেছে।

ফিল আমার হাতটা টেনে নিল। কিছু একটা বলতে চাইল। বলল না। তাড়া কী? এক সময় বললেই হবে। সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

তারপর হঠাৎ মতটা বদলে কথাটা বলেই ফেলল, আমি ভুল করেছি। জেনীকে কথা না দিলেই হত যে, তোমার মুখ চেয়ে আমি কাঁদব না।

আঃ! আবার সেই কথা! আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। আমাকে একটু-ক্ষণ একা থাকতে হবে। নিরিবিলি। একটু বাতাস ফুসফুসে ভরে নিতে। কিংবা একটু পায়চারি করতে।

নিচে, হাসপাতালের লবিটা একেবারে নির্জন। লনোলিয়ামে আমার জুতোর মশ্‌মশ শব্দটাও শুনতে পাচ্ছি—

—অলিভার!

থমকে দাঁড়াই।

আমার বাবা। দূরে রিসেপ্‌শান-ডেস্কের ঐ মহিলাটি ছাড়া এ নির্জন করিডোরে শুধু আমরা দুজন। বোধ করি রাত্রির সেই শেষপ্রহরে নিউইয়র্ক শহরে অল্প কয়েকজনই মাত্র জেগে আছে। তার ভিতর আমরা দুজন।

আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমি দ্রুতপদে রিভলভিং দরজাটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই উনি এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন।

—অলিভার! কেন তখন আমাকে বললে না?

ভীষণ শীত। একপক্ষে এটা ভালই হয়েছে; আমার সেই মুহূর্তে একটা তীব্র দৈহিক অনুভূতির প্রয়োজন ছিল। শেষরাত্রের হিমেল হাওয়াটা তাই খারাপ লাগছে না। বাবা প্রায় কানে-কানে বলার ভঙ্গিতে বললেন: যে মুহূর্তে খবরটা জানতে পারলাম তৎক্ষণাৎ গাড়িতে করে আমি ছুটে এসেছি

কে জানে, হয়তো সেই বৃদ্ধ স্পোর্টসম্যানও তিন ঘণ্টা বিশ মিনিটে এ পথ পাড়ি দিয়েছে!

—অলিভার! বল্। কীভাবে তোকে সাহায্য করতে পারি আমি?

—জেনী আর নেই!—আমি কোনক্রমে বললাম।

—আ'য়াম স'রি!—প্রায় আত্মগতভাবে স্বগতোক্ত করলেন অলিভার ব্যারেট III.

আমি আজও জানি না—কেন, কিসের প্রেরণায় আমি মুখস্থর মত বলে ফেললাম সেই অনবদ্য লাইনটা—যা বলেছিল সেই আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটা যে শুয়ে আছে—ঐ বদ্ধ কেবিনটায়।

: Love means not ever having to say you're sorry.

[ভালবাসার অভিধানে 'সরি' শব্দটার ঠাঁই নেই]

আর তারপর আমি এমন একটা কাজ করে ফেললাম, যা আমি জ্ঞান হবার পর কখনও করিনি—ওঁর সামনে তো নয়ই আর এমন করে ওঁর বুকে মুখ গুঁজে তো কখনই নয়।

আমি কাঁদছিলাম।

॥ ১৩ ॥

মাদুভিহি জঙ্গলের একান্তে, সেই এক আকাশ তারা-জ্বলা অবাক রাত্রির তৃতীয় প্রহরে এই বিদেশী লেখকের কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদে যখন উপনীত হল কথক, তখন সে যেন সম্বিত ফিরে পেল। হঠাৎ নজর হল—তার একমাত্র শ্রোতা সামনে বসে নেই! সে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে একবালিশওলা সেই ভূশয্যায়!

কাঁদছে সেও—যদিও শব্দ হচ্ছে না কোনও—ওর আঁচল-খসা অনাবৃত পিঠটা শুধু মাঝেমাঝে থরথর করে কেঁপে উঠছে, ওর খোলা চুল লুটাচ্ছে দু-পাশে।

রঞ্জন এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেল। না কি হারালো?

দু হাতে সেই বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনীর দুই কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, এ্যাই, এ্যাই—এ কী হচ্ছে?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মতো উঠে বসল অতসী। তার খেয়াল নেই—আঁচলটা খসে পড়েছে। সবলে সে আলিঙ্গন করে ধরল ঐ ছেলেটাকে।

প্রাণধারণের তাগিদে অতলস্পর্শী খাদের মুখে মানুষ যেভাবে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে, অথবা জেনী ধরে 'অল'কে, ঠিক সেইভাবে।

বোকা ছেলেটা বুঝতে পারল—আসলে বুঝতে পারল না। তাই সে পরম-করুণাময় ঈশ্বরকে ডেকে বলতে পারল না—হে ঈশ্বর! কান্নায় যদি কোন একজন ভেঙে পড়ে, তবে তুমি দেখ, যেন দুজনেই একসঙ্গে ভেঙে পড়ে। একজন কাঁদছে, অপরজন কাঁদতে পারছে না, সে বড় বেমানান!

সে তার মতো করে যেটুকু বুঝেছে তাতেই অস্ফুটে শুধু বললে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, অতসী!

কী যেন কথাটা বলেছিল কুনাল?

: আমি খুশি হব—যদি ঐ চব্বিশ বছরের কবিটা একেবারে খালি হাতে বিদায় না নেয় এ দু নয়া থেকে?

তাই কি? না আর কিছু?...মনে পড়ছে না!

কবি কোথায়? তারুণ্যের মধ্যগগনে মধ্যাহ্ন মানুষটার যে তখন অস্তমুতি! অতসী...তার আঠাশ বছরের জীবনে প্রথম এমন একটি ক্রান্তিকারী মুহূর্তে কি মনে পড়ে কে কখন, কোথায়, কী বলেছিল?

মাঙ্গুডিহি জঙ্গলে একটা রাতচরা পাখি অহেতুক ডেকে উঠল!

: উহু-উহু উহু-উহু'

॥ ১৪ ॥

সময় যদি হয় অ্যাব্‌সিসা আর পরিবর্তন হয় অর্ডিনেণ্ট—তাহলে দেখা যাবে, কোন মানুষের জীবনের গ্রাফ সমান-চালে ঊর্ধ্বমুখী সরল-রেখা নয়। বন্দনার বিয়ের পর থেকে অতসীর জীবনের ছন্দটা ছিল ভূমির সমান্তরালে—ঢিমে তালে: অলস মনে দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু'।

কিন্তু মাঙ্গুডিহি থেকে ফিরে আসার পরে এই তিন মাসে সেই আনুভূমিক রেখাটা হঠাৎ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠল। মাত্র তিনটি মাসে ওর জীবনে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অফিসে সবাই বলাবলি করে—অতসীদির কী হয়েছে বল তো?

শুধু মানসিক নয়, পরিবর্তনটা দৈহিকও। তার কিছুটা প্রকাশ্য—চোখের কোণে কালি, মুখটা শুকনো; কিছুটা বা লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত গোপনে।

যথারীতি দশটা-পাঁচটা অফিস করে। বাকি সময় নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী করে রাখে ওর ঘরের চার-দেওয়ালের চতুঃসীমায়। সিনেমা দেখে না, বেড়াতে যায় না, কারও সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাতে আগ্রহী নয়। ঘর-দোর গোছায় না, টেবিলে একপ্রস্থ আলগা ধুলো, আয়নার কাঁচটা ঝাপসা, সিলিঙে ঝুল, মায় উনানটাও জ্বালে না। বাড়ির সামনের ঐ পাঞ্জাবি হোটেলের মালিক সর্দারজীর সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত করেছে। ঐ হোটেলের ছোকরা-চাকরটা টিফিন-ক্যারিয়ারে

লাজিয়ে সকাল সন্ধ্যা পৌঁছে দিয়ে যায় একজনের খাবার। হ্যাঁ, একজনের, অতসীর সংসারে এখন দ্বিতীয় প্রাণী নেই। বলাই গাঙ্গুলী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

মাজুডিহি থেকে ফিরে এসে দরজায় তালা মারা দেখে প্রথমটা বিরক্ত হয়েছিল। এমন অবেলায় দোরে তালা দিয়ে বড়মামা আবার কোথায় গেল? ডুপ্লিকেট চাবি ছিল ওর ভ্যানিটি ব্যাগে। তালা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখে সব কিছুই বিশৃঙ্খল। জিনিসপত্র এখানে ওখানে ছড়ানো। বারান্দার উপর শূন্য চায়ের ভাঁড। রান্নাঘরে তিন-চারটে এঁটো শালপাতা। উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে আছে ঘরময়। একটু ক্ষুব্ধ হল অতসী। বড়মামার একটা হাত নেই—এঁটো থালা তার পক্ষে মেজে রাখা কষ্টকর। তাই সে হোটেলের ঐ ছোকরা-চাকরটার সঙ্গে সে ব্যবস্থাও করে গেছিল। উচ্ছিষ্ট থালা-বাটি সে প্রতিদিন ধুয়ে রেখে যাবে। সর্দারজীও সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল: আপ্ বে-ফিকর রহিয়ে দিদি।

এখন দেখা যাচ্ছে সে আশ্বাস নিতান্ত ফাঁকা বুলি।

তালা খুলে নিজের ঘরে ঢুকল। বড়মামীর ঘরখানা। এটার চাবি বড়মামার কাছে থাকে না। তাই যেমন রেখে গেছিল তেমনই আছে। ঘামে-ভেজা রেলের জামাকাপড় পাল্টাতে যাবে এমন সময় রুদ্ধদ্বারে টোকা পড়ল। বড়মামা ফিরে এসেছে মনে করে কাপড় সামলে নিয়ে এসে সদর দরজা খুলে দেয়। না, বড়মামা নয়, সর্দারজী এসেছে।

—ম্যায় খুদ চালা আয়া দিদি! এক বাত হ্যায়। ভিতর আঁউ?

—হ্যাঁ, আসুন।

একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়। সর্দারজী বসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিবেদন করে তার বক্তব্য। তার বিচিত্র ভাঙা ভাঙা বাংলায়—

অতসীর অনুপস্থিতকালে এ বাড়িতে এক জটাজুট সাধুবাবা একদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি বলাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। বলাই গাঙ্গুলী যখন ঘরে তালা দিয়ে চলে যায় তখন সর্দারজীর সঙ্গে দেখা করে। বলে যায়, দিদিমণি ফিরে এলে জানাতে যে, তার মামা তীর্থদর্শনে যাচ্ছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই।

—তো ম্যায়নে পুছা, ঘরকা কুঞ্চি? দিদি ঘুসেগা কৈসে?

তাতে নাকি বলাইবাবু আশ্বাস দিয়ে যায়—ডুপ্লিকেট চাবি দিদির কাছে আছে।

অতসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে জানতে চেয়েছিল, কোথায় তীর্থ করতে গেল তা বলেনি ?

—জী নেহী। লেকিন মুঝকো এক খৎ দে-গয়া। ইয়ে লিজিয়ে।

মুখবন্ধ একটি খাম এবং হিসাব অনুযায়ী অগ্রিমের বাকি পয়সা প্রত্যর্পণ করে সর্দারজী বিদায় হল।

ট্রেন জার্নির ক্লান্তি ভুলে অতসী তখনই খুলে ফেলল খামটা। সদর-দরজা বন্ধ করেই।

আঁকা-বাঁকা হাতের লেখা। ডান হাতটা খোয়া যাবার পর বড়মামা বাঁ-হাতে লিখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লেখাপড়ার ধার সে বড় একটা ধারত না কোনদিনই। ফলে হাতের লেখাটা সড়গড় হয়নি মোটেই। সেই শিশুর হস্তাক্ষরে বড়মাম লিখেছে—

"বড় খুকি,

"ভাবিস না সংসারে বীতরাগ হওয়ায় সন্ন্যাস নিচ্ছি। অনেক ভেবে দেখলুম—আমি আড়ালে সরে না গেলে তোর কোন একটা হিল্লে হবে না। দোষটা আমার। নিতান্তই আমার। ছেলেবেলা থেকেই আমি পরমুখাপেক্ষী। প্রথমে মা, পরে তোর বড়মামী, আর এই শেষ বয়সে—তুই। ওঁরা দুজনেই মুক্তি পেয়েছেন ; কিন্তু তোর যে গোটা জীবনটাই সামনে পড়ে আছে! বলতে পারিস্—'হ্যাঁ গো বড়মামা, তোমার এ সুবুদ্ধিটা আর কবছর আগে হল না কেন ?" হ্যাঁ, একথা বলার হক আছে তোর! কী জানিস ?—ঐ যে বললাম একা একা পথ চলতে পারি না। সাধুবাবার একটা চেলার দরকার। আমারও চাই একটা সঙ্গী—দোকলা চলার পথে।

"আমার খোঁজ করিস্ না। আমার ঠিকানা তুই পাবি না। কিন্তু তোর খবর আমি ঠিকই পাব। তোর বড়মামীর একটা কম্বল, নিজের কিছু জামা কাপড় আর পিতলের বড় ঘটিটা শুধু নিয়ে যাচ্ছি। হয়তো আবার হুট করে ফিরে আসব। তোর গালমন্দ খেতে। অথবা কে জানে, হয়তো নাতি-নাতনীর আদর খেতেও!

"রঞ্জন ছেলেটা ভাল। দু-এক বছরের ছোট বলে দ্বিধা করিস্ না। আজকাল তাও তো আকছার হয়। আশীর্বাদ রইল তোর বড়মামার।"

অতসীর ইচ্ছা করছিল তখনই ছুটে যায়—কুনাল-নন্দনার কাছে। ওদের নাকের ডগায় চিঠিখান মেলে ধরে বলতে : এ্যাই দেখ! তোমরা যে বলতে লোকটা পাষণ্ড! এখন কী ?"

বড়মামার অন্তর্ধানই ওর বাঁধাধরা জীবনে একটা বৈপ্লবিক ধাক্কা। দ্বিতীয় আঘাতটা মানসিক। মাঙ্গুডিহির স্মৃতি।

শুধু পরম আনন্দ নয় একটা চরম আঘাতও সে পেয়েছিল ওখানে।

প্রথমরাত্রির অবসানে ঘুম ভেঙে সে দেখেছিল পাশের জায়গাটা খালি। ওর শয্যাসঙ্গী সাতসকালে শয্যাত্যাগ করে উঠে গেছে। মুখ ধুচ্ছে সে বাইরের বারান্দায়। অতসী তড়িঘড়ি শয্যাত্যাগ করেনি। রসিয়ে রসিয়ে পূর্বরাত্রের অভিজ্ঞতাটা রোমন্থন করতে থাকে। এ এক অনাস্বাদিত জগৎ—যার কথা সে জেনেছে, জানে—কাব্যে-সাহিত্যে-সিনেমায়; অথচ যার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না এতদিন। শুয়ে শুয়েই ও সিদ্ধান্তে এল: এই সপ্তাহব্যাপী স্বর্গসুখ ত্যাগ করে সে টাটা-জামসেদপুরে আদৌ যাবে না। ছুটির সাতটা দিন বিকিয়ে দেবে এই খেলাঘরের চতুঃসীমায়। সদ্যবিবাহিতের এই নতুনপাতা পুতুল খেলার সংসারটার আকর্ষণ অদম্য: 'তার মূল্য তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে।'

সীমন্তে দিয়েছে খেলাঘরের সিন্দূরবিন্দু। প্রতিবেশিনী পেতে দিয়ে গেছে ওর বাসরশয্যা; রঙ্গ-রসিকতা করে বলেছে: হ্যাঁ দিদি, তামাম রাত কি একটা মরদের হাতে মাথা দিয়ে শুতে হয়? তারা-জ্বলা অবাক রাতে ধরা দিয়েছে মুগ্ধ-প্রেমিকের বাহুবন্ধে। সার্থক করেছে তার নারীজন্ম!

না, সে আর কোথাও যাবে না, যেতে পারবে না। মৃত্যুপথযাত্রীর শেষের কটি দিন সে সুধায় ভরে দিয়ে যাবে। শুধু দেবে নয়, নেবেও! অঞ্জলি ভরে। ওর আজন্ম-উষর জীবনের একটি মধুময় সপ্তাহ! দুনিয়া জানতে পারবে না। সমাজ তেড়ে আসবে না। সহকর্মীরা মুখ বেঁকিয়ে হাসবে না! সপ্তাহের দিনগুলো একটি একটি করে চৈত্রমাসের ঝরাপাতার মতো খসে পড়বে, নিঃশেষে হারিয়ে যাবে। তবু তার একটা অদ্ভুত মিষ্টি সৌগন্ধ্য লেগে থাকবে ঘ্রাণে—যেমন আছে বড়মামীর গয়নার বাক্সে সেই উপে-যাওয়া সেন্টের শিশিটায়। এই মাঙ্গুডিহি যেন দুনিয়ার বার-এ এক কল্পলোক। অরণ্যপ্রান্তের এই অবাক দিনগুলো বেঁচে থাকবে এক অনূঢ়ার মস্তিষ্কের স্মৃতি মঞ্জুষায়!

কিন্তু বাস্তবে তাও হল না। রঞ্জন ছেলেটা নিতান্ত ছেলেমানুষ। না, শুধু ছেলেমানুষ নয়,—মূর্খ! ঈডিয়ট!

পরদিন সকালে কোথায় সে খুশিয়াল হয়ে উঠবে, তা নয়, একেবারে শম্বুক-বৃত্তি অবলম্বন করল। চোখ তুলে যেন আর তাকাতে পারছে না বাড়ির দ্বিতীয় প্রাণীটার দিকে। বেচারী অতসী! কতবার আকারে ইঙ্গিতে সে বোঝাতে চেয়েছে যে, গতরাত্রির ব্যাপারটাকে সে দুর্ঘটনা বলে মনে করেনি

আদৌ। যা অনিবার্য পরিণাম তাই তো ঘটেছিল! এটা সে নিজেও চেয়েছিল চাইছে!

কিন্তু আর কত নির্লজ্জভাবে বলা যায়? হাজার হোক, সে তো মেয়েমানুষ! রঞ্জন—মূর্খ রঞ্জন—সারাদিন আঁকড়ে ধরে থাকল তার উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট খিয়োরিটাকে: নিতান্ত কামার্ত হয়ে সে একটা চূড়ান্ত অসংযমের পরিচয় দিয়ে বসে আছে! নির্জন অর্গলবদ্ধ ঘরের সুযোগে যে তার অতসীদিকে···আ—ছি ছি ছি!

সহ্য করতে পারেনি অতসী

পরদিন প্রতিশ্রুতিমতো সে প্রতিবেশীদের রান্না করে খাইয়েছে। যমুনা এসে হাতে হাতে সাহায্য করেছে। মসলা পিষে দিয়েছে, তরকারি কুটে দিয়েছে; আর যমুনার উপস্থিতির অজুহাতে রঞ্জন সারাটা দিন কোথায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালো। রাত্রে আহারান্তে দোবেজী সস্ত্রীক বিদায় নেবার প রঞ্জন বিনা বাক্যব্যয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল মাদুর পেতে। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে।

তা সত্ত্বেও চেষ্টা করেছিল অতসী। আটপৌরে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে এঘরে এসেছিল। লজ্জায় মাথা খেয়ে বলেছিল, এ কী? তুমি এমন করে এখানে শুয়েছ? চল, ওঘরে চল?

রঞ্জন মাথা নিচু করে বলেছিল, না অতসীদি। কাল যা ঘটে গেছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু একই ভুল আমি দ্বিতীয়বার করব না।

'অতসীদি। ভুল'—আচ্ছা তোমরাই বল, আঠাশবছরের প্রায়-উত্তীর্ণযৌবনা কোন একটি মেয়ের কী প্রতিক্রিয়া হয় এতে? সে যেন সেই অন্ধ্রদেশের রাজনটী —এসেছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ফুসলে নিয়ে যেতে। তবু দাঁতে দাঁত চিপে বলেছিল, তুমি এটাকে ভুল বলছ কেন রঞ্জন? এটাই তো প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের ভালবাসার স্বাভাবিক পরিণতি। আমি কিছু মনে করিনি। তুমি তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে···

—সে আপনার মহানুভবতা। আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন এ আপনার মহত্ত্ব, কিন্তু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। আমার সাহস নেই। আপনি শুতে যান, অতসীদি!

—আমার সাহস আছে, অথচ তোমার নেই?

—না নেই! অতটা আত্মবিশ্বাস আমার নেই। আমাকে ক্ষমা করুন আপনি—

আশ্চর্য! শেষ কথা-কয়টা সে বলেছিল যুক্তকরে।

এঘরে ফিরে এসে গতরাত্রের আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটার কথা ভাবতে বসে। ছেলেটা নির্বোধ? না, তা তো নয়। তাহলে কাল রাত্রে কেন সে বলে উঠেছিল, "এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, অতসী।" তাহলে রাত পোহালে তার এ আচরণের অর্থ কী? ছেলেটা দারুণ পিউরিটান? প্রাকবিবাহ জীবনে দৈহিক ঘনিষ্ঠতা সে পাপ বলে মনে করে? কিন্তু তার কবিতা পড়ে তো তা মনে হয়নি। কবি রঞ্জন তার কবিতার খাতাখানা দিয়েছিল ওকে পড়তে। অনেকগুলিই রোমান্টিক কবিতা। তাতে দেহতত্ত্বও আছে। পড়ে তো মনে হয়নি—কবি-প্রিয়াকে অগ্নিসাক্ষী রেখে সাতপাকে বেঁধে তারপর কলম নিয়ে বসেছে। তাহলে কী?

তোমরা অতসীকে মার্জনা কর। সে সিদ্ধান্তে এসেছিল—দায়ী করেছিল নিজের রূপযৌবনকে! গতকাল রাত্রে যেকোন কারণেই হোক রঞ্জনের বুকের পাঁজর-গুহায় এক ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠেছিল! সে আত্মসংবরণ করতে পারেনি আধো অন্ধকারে তার শয্যাসঙ্গিনীর দিকে নজরই পড়েনি সে শুধু দেখেছিল - অসংবৃত-দেহা একটি রোরুদ্যমানা নারী দেহ! ওর বয়স যে আঠাশ, ওর মুখে যে ব্রণ-চিহ্ন এসব নজরে পড়েনি সুপ্তোত্থিত পুরুষ-সিংহের। আজ এই মধ্যরাত্রে দৃষ্টিতে সেই মাদকতা নেই।

অতসীর সিদ্ধান্তে তোমরা কি ওকে বোকা ভাবছ? ভুল কর না ভাই। অভিমান এমন একটা আজব বস্তু যা উপেক্ষিতকে বারে বারে, যুগে যুগে এই একই ভুল করিয়েছে!

অতসী কলকাতায় ফিরে এসেছিল পরদিন সকালে। প্রায়-বিনিদ্র দ্বিতীয় রাত্রিটা একক-শয্যায় অতিবাহিত করে। যমুনার বারম্বার উপরোধ অগ্রাহ্য করে। দোবেজী কারিৎকর্মা লোক। আর একটি কাঠ-বোঝাই ট্রাকে করে ওকে পৌঁছে দিয়েছিল বাস-এর সড়কে। সেখানে বাস ধরে স্টেশানে। রঞ্জনও সঙ্গে ছিল। অবশ্য দোবেজীর উপস্থিতিতে আর কোন কথা হয়নি অভিমানী অতসী মুখ ফুটে বলতে পারল না—মাঝে মাঝে চিঠি দিও। কী দরকার? ও যদি এক রাত্রের অবিমৃষ্যকারিতার কথাটা ভুলে থাকতে চায়, তাতে অতসী বাধা দেবে কোন অধিকারে?

কিন্তু আর একটা কাজ সে করে এসেছিল। যমুনাকে নিজের ঠিকানা দিয়ে অনুরোধ করেছিল - বুড়ীর তবিয়ৎ একটু বেচাল হলেই সে যেন খবর পায়। যমুনা গ্রাম্য সরল মেয়ে হলেও খানিকটা আন্দাজ করেছিল বলেছিল, এক বাৎ পুছু দিদি? বাবুজীর সঙ্গে অচানক কাজিয়া করলে কেন?

—কে বলেছে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে?

—কে আবার বলবে? লছমীর বাপের মতো ছুঁচো-কানাও সেটা বুঝেছে।

অতসী প্রতিবাদ করেনি। বলেছিল, মরদের সঙ্গে সবাই তো ঝগড়া করে। তুমি কর না? শোন—যে কথা বলছি: বাবুজীর মাঝে মাঝে হঠাৎ জ্বর হয়। গ্ল্যাণ্ড কোলে……

—গ্ল্যাণ্ড কী?

—মানে কুঁচকিতে ব্যথা হয়। সে অসুখের দাওয়াই বাবুর কাছে আছে। কিন্তু তেমন কিছু হলেই আমি যেন খবর পাই, কেমন?

—কিন্তু আমি যে বাংলা লিখতে পারি না দিদি?

—তাতে অসুবিধা নেই। তুমি হিন্দিতেই লিখ। আমাদের অফিসের দারোয়ান হিন্দুস্থানী। ছাপরা জিলার। তাকে দিয়ে পড়িয়ে নেব আমি।

যমুনা রাজী হয়েছিল।

কিন্তু এ তিনমাসে তার কোন চিঠি আসেনি।

কেন? কুনাল বলেছিল—মাল তিন-চার ওর মেয়াদ। ষোল সপ্তাহ ওর বরাদ্দ, বড়জোর বিশ। তার তো অনেকটা পথই অতিক্রান্ত। এতদিনেও কি দূর থেকে শোনা যাবে না সেই কালো ঘোড়সওয়ারটার অশ্বখুরধ্বনি। যে অশ্বারোহী দুর্বার গতিতে ছুটে আসছে—যে নাকি এসে পড়ল বলে? নাকি যমুনা চিঠি দিয়েছে, ডাক-বিভাগের গণ্ডগোলে খোয়া গেছে চিঠিটা? এক-একবার মনে হয় বাণ্ডইআটি চলে যায়। গিয়ে জেনে আসে, তাঁরা কতদিন আগে ওর চিঠি পেয়েছেন। পারে না। সাহসে কুলায় না। প্রথমত ওঁরা আজও জানেন না সেই অজ্ঞাত-পরিচয় কালো ঘোড়সওয়ারটার কথা। কুনাল বারণ করেছিল—ওঁদের জানানো হয়নি। দ্বিতীয় কথা: বৌদির সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে সেই রবিবার রাত্রে সে টেলিফোন করে তাহা মিথ্যা কথাটা বলতে পারেনি।

অবশেষে ত্রয়োদশ সপ্তাহে—মাত্র দিন তিনেক আগে—এল যমুনাবাঈয়ের চিঠি। হিন্দিতে নয়, বাংলায়। লিখেছে—

'দিদি,

'আপনি বলে গেছিলেন বাবুজীর তবিয়ৎ খারাপ হলে খবর দিতে। শরীর তাঁর খারাপ হয়নি একতিলও। দিব্যি বহাল-তবিয়তে আছেন। তা সত্ত্বেও এই চিঠি দিচ্ছি। বিশেষ কোন কারণে নয়। এমনিই অচানক লিখতে ইচ্ছে হল বলে। পরশুদিন সরাইকেল্লা এসেছি, আমার এক কাকার বাড়িতে। বিয়ের

নেওতা। আমার চাচাতো বোন—যার বিয়ে হচ্ছে তার পরের বোন, বাংলা জানে। তাকে দিয়েই এ চিঠি লেখাচ্ছি।

'বাবুজীর খবরটা আগে দিই। তিনি দিব্যি ভাল আছেন। অরজারি হয়নি, ফুঁচকি-মুচকি ফোলেনি। বুধনই রান্নাবান্না পাকায়। আমি যদি ভালোমন্দ কিছু পাকাই—এঁচোড়, লৌকা বা মোচা—হাঁ দিদি, বাংগালী কায়দায় আমি মোচাভি পাকাতে পারি—তাহলে আপনার কর্তাটির জন্য একবাটি পাঠিয়ে দিই। মুংলীর একটা বাচ্চা হয়েছে। মুংলীকে মনে আছে তো? ভিখনের গাই। বাবুজীকে সে রোজ তিনপো দুধ যোগান দেয়। এসব কথা শুনতে আপনার ভালো লাগবে বলে লিখছি।

'আপনি আবার কবে মাজুডিহিতে আসবেন? একটা বুরা খবরও আছে। দিন পনের আগে মালিক এসেছিলেন। মালিককে পহ্‌চান্তে পারছেন তো? ঠাকুর মোশাই। কী নিয়ে যেন বাবুজীর সঙ্গে তাঁর খুম লড়াই-কাজিয়া হয়েছে। লছমীর বাপের সঙ্গেও। সে বলে, বাবুজীর কোনও গল্‌তি হয়নি। ঠাকুরমোশা সিরিফ গা-জুরি ঝগড়া করেছেন। যেন বহাল-তবিয়তে ইমানদারী কাজ করাই একটা গলৎ!

'যাক ওসব বড়-বড় বাতেঁ। আমি ওসব বুঝি না। বাবুজীর কাছে মাঝে মাঝে মুখবন্ধ লেফাফা আসে। লছমীর বাপের কাছে জানতে পারি। না জানে, তা ওঁর রিস্তাদারদের, না আপনার।

'ঝট্-সে একদিন চলে আসুন। লম্বা ছুটি নিয়ে। লছ্‌মির বাপ ট্রাক-ড্রাইভার প্রতাপ সিংজীকে বলে রেখেছে। আপনি এলে আমরা সবাই মিলে টাটা-জামসেদপুর বেড়াতে যাব। আসছেন তো? প্রণাম নেবেন।

'ইতি যমুনাবাঈ।'

অতসীর অভ্যস্ত জীবনছন্দে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় হেতুটা দৈহিক। এখনো সেটা লোকচক্ষুর অন্তরালে; কিন্তু অতসী জানে—অচিরেই তা অনিবার্য ভাবে প্রকাশ্য হয়ে পড়বে। আজ প্রায় দশ সপ্তাহ হল ওর আকৈশোর জীবনছন্দে একটা মারাত্মক ছন্দপতন ঘটেছে। প্রথমে একটা দুরন্ত ভয়ে ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এমন একটা অঘটন ঘটল! মাত্র একরাত্রের ভুলে? হ্যাঁ, 'ভুল' বইকি! ঠিকই বলেছিল রঞ্জন। খেড়ে মেয়ে; এতবড় ভুলটা কেমন করে করল সে? মনে পড়ে গেছিল, যে অশ্লীল কথাটায় একদিন যে রঞ্জনার গায়ে হাত তোলে। ঐ একফোঁটা মেয়েটার যা অহরহ খেয়াল থাকত, এ বয়সেও তার তা থাকে না কেন?

প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে এসেছিল সে—ভারমুক্ত হতে হবে। প্রথমেই তার মনে পড়েছিল কুনালের কথা। ওর পরিচিত দুনিয়ায় সেই আছে একমাত্র মানুষ, যাকে সব কথা খুলে বলা যায়। তাছাড়া সেই তো পরোক্ষভাবে দায়ী। ঐ পাগল কবিটার শেষের এ-কটা দিন সুধায় ভরিয়ে দেবার ন্যাকামি সেই কুনালই প্রথম শোনায়নি কি? ব্যাপারটা এখন আইনসঙ্গত। একেবারে অপরিচিত ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চেয়ে কুনালের মাধ্যমে ব্যবস্থা হওয়া ভালো।

কিন্তু ব্যাপারটা সঙ্কোচের। লজ্জার। বিশেষ কুনালের কাছে। যে কুনাল ওর সঙ্গে প্রেম করেছে, কিন্তু কোনদিন চুমু পর্যন্ত খায়নি। ইতস্তত করতে করতেই কেটে গেল আরও একটা মাস।

তারপর ওর চিন্তাধারায় অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এল। একটা ইংরাজী উপন্যাস পড়তে পড়তে। সিঙ্গল-পেরেণ্টেজের করুণ কাহিনী। ছেলেটি দায়িত্ব এড়িয়ে পালিয়ে গেল। মেয়েটি কিন্তু ভারমুক্ত হতে স্বীকৃত হল না। কুমারী মাতা হিসাবে জীবন সংগ্রামে নেমে পড়ল।

ইউরোপ-আমেরিকায় এ তো আকছার হচ্ছে। সমাজ তা মেনে নিয়েছে। এখানে এটা চালু নয়। প্রথম দিকে অতসীকে প্রচণ্ড আঘাত সইতে হবে। ও ভ্রূক্ষেপ করবে না। জবাবদিহির দায় তো তার নেই। এক ছিল বড়মামা। সেও সরে গেছে অন্তরালে। কার কাছে জবাবদিহি করবে সে? প্রথম দু-তিন বছর! স্কুলে ভর্তি করার সময় অসুবিধা হবে কি? হতেই পারে না। তারপর কেউ জানতে চাইবে না—কে ওর সন্তানের বাবা। অনিবার্য ভাবে সবাই ধরে নেবে বাচ্চাটা বিধবার একমাত্র সন্তান।

সেই ভালো। একটা সুখস্মৃতির চিহ্ন। রঞ্জনের দুনিয়াদারী ফুরিয়ে যাবে তার সন্তানের জন্মের অনেক-অনেক আগে। উপায় কি? তবু অতসীর সমস্তটা উপেক্ষিত যৌবনের একটি মাত্র সার্থক মুহূর্তের স্মৃতিকে সে হারিয়ে যেতে দেবে না। সব আঘাত সে বুক পেতে নেবে। সমাজ, প্রতিবেশী, অফিসের সহকর্মীদের তির্যক রসিকতা আর বাঁকা হাসি।

রঞ্জনকে সব কথা জানিয়ে দিলে মনে হয় সে আনুষ্ঠানিক বিবাহে সম্মত হবে। ওদের অজাত সন্তান তাহলে জারজের পরিচয় নিয়ে অবতীর্ণ হবে না দুনিয়ায়। কিন্তু সে বড় বিশ্রী ব্যাপার। সব অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে ওদের দুজনকে নতমস্তকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে সেই বাগুইআটিতে। কী দরকার ছেলেটাকে পাঁকের মধ্যে টেনে আনে? সে তো স্পষ্টই স্বীকার করেছে, সেরাত্রের মধুর অভিজ্ঞতা ও তার কাছে একটা দুর্ঘটনা—কামোন্মত্ত দুটি নরনারীর বাঁধনছেঁড়া

ব্যভিচার! কী দরকার তাকে জানানোর—যে, সেই সংযমহীনতার একটা স্থায়ী কলঙ্কচিহ্নের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে! কয়টা সপ্তাহই বা পুঁজি তার?

অবশ্য একটা প্রচণ্ড লাভের ক্ষীণ সম্ভাবনাও আছে। ও যদি বিয়েতে রাজী হয়ে যায়? আনুষ্ঠানিক বিবাহের পর তো আর সে অচ্ছুৎ 'অতসীদি' হয়ে থাকবে না। মাঙ্গুডিহির সেই খাপরাটালির ঘরখানা বসান-তুবড়ির মতো কিছু-দিন ফুলঝুরি কাটবে। যে কয়দিন তার সঞ্চিত বারুদ শেষ না হয়।

ইতস্তত করতে করতে একদিন সে এসে হাজির হল কুনালের ল্যাবরেটারিতে। অফিসে বড়বাবুর কাছে ফার্স্ট-হাফটা ছুটি চেয়ে নিয়ে। কুনাল দপ্তরে ছিল। তখনো লোকজনের ভিড় হয় নি। স্লিপ দেওয়া মাত্র ডাক পড়ল ঘরে।

অতসীকে দেখে একটু চমকে উঠল কুনাল, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

অতসী ওর ভিজিটার্স চেয়ারে বসল। রুমালে মুখটা মুছে নিয়ে বলে, অসুখ না হলে কেউ ডাক্তারের কাছে আসে?

—ও! তুমি বুঝি ডাক্তারের কাছে এসেছ? আমি ভেবেছিলুম—বিপদে পড়ে তোমার কুনালদার কাছে এসেছ বুঝিবা। বস্তুত তোমাকে প্রত্যাশাই করছিলুম কি না।

—প্রত্যাশা করছিলে? তুমি জানতে, আজ আমি আসব?

—আজই আসবে তা জানতুম না। তবে আজকালের মধ্যেই যে তুমি আসবে, তা জানতুম।

—হেতুটা?

—সেটা তো তুমি জানই। যেজন্য এসেছ।

—আমি জানি। কিন্তু তুমি তো এটা এখনো জান না কুনাল।

—আমিও জানি।

রীতিমতো অবাক হয় অতসী। বলে, কী জানো?

—তোমাকে একজন গরু-খোঁজা খুঁজছে। তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছ। ডাক্তারের কাছে নয়। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর কাছে। কুনালদার কাছে।

চমকে ওঠে অতসী। গরুখোঁজা খুঁজছে! কে? রঞ্জন? কিন্তু রঞ্জন তো তার ঠিকানা ভালভাবেই জানে। বাড়ির এবং অফিসের। তাহলে? বললে, না কুনাল, তোমার হেঁয়ালিটা আমি ধরতে পারলাম না।

—তুমি বলতে চাও যে, তুমি জান না—ঠাকুরমশাই তোমাকেই সন্দেহ করেছেন?

—ঠাকুরমশাই! সন্দেহ করেছেন? কী?

কুনাল তার ছোকরা-চাকরটাকে ডেকে চায়ের ফরমাশ করল। সে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলে বলল, দুজনেই যদি তাস লুকাই তাহলে খেলা জমে না। আমি খুলেই বলি: দিন-দশেক আগে তোমাদের অভ্রান্ত গ্রহাচার্য ঐ কাঠগোলায় হানা দিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি আমার গৃহে পদধূলি দিতে এসেছিলেন। বস্তুত এসেছিলেন তোমার খোঁজে। তোমার ঠিকানা তিনি জানেন, তোমার বড়মামা থাকলে সেখানেই যেতেন গুজুর গুজুর করতে। তিনি নেই, তোমার সম্মুখীন হবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি।

অতসী বলে, বিশ্বাস কর কুনাল, আমি তাও ঠিক বুঝতে পারছি না। তিনি এমন মর্মান্তিকভাবে অস্থানে আমাকে খুঁজছেনই বা কেন, আর আমাকে ভয়টাই বা কী?

—তোমাদের অভ্রান্ত গ্রহাচার্যটি সেই সাঁওতালীগ্রামে—নামটা ভুলে গেছি—গেছিলেন তত্ত্বতালাশ নিতে। মাসিক হিসাবে ন'মাসে ছ'মাসে তিনি ওখানে দরেজমিনে খোঁজখবর নিতে যান। এবার গিয়ে সংগ্রহ করে এনেছেন একটি বিচিত্র এবং মুখরোচক সংবাদ। ওঁর নবনিযুক্ত ম্যানেজার নাকি চাকরিতে যোগদান করতে গিয়েছিল সস্ত্রীক! বোঝ কাণ্ড! যে ছোকরার 'গব্বোধারিণী' ওঁর মন্ত্রশিষ্যা, তারই এই বেচাল! মেয়েটির বর্ণনা শুনেছেন, সনাক্ত করতে পারেননি। দুদিন সেখানে থেকেই নাকি মেয়েটা বেগতিক বুঝে কেটে পড়েছে।

—ওঃ এই ব্যাপার? তা ম্যানেজারের চরিত্র নিষ্কলুষ রাখার দায়টা কি মালিকের?

—কিছুটা। কোন একটা অজুহাত তো চাই। না হলে তাকে তাড়াবেন কেমন করে?

—তাড়ানোর দরকারটাই বা কিসের? রঞ্জনের অপরাধ?

—হিমালয়াস্তিক! তুমি মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাটকটা দেখেছ?

—না। কেন?

—সেটা তোমার দেখা থাকলে সহজে বোঝানো যেত। রঞ্জন চক্কোত্তির একমাত্র অপরাধ—বিচক্ষণ ডাক্তারের প্রগ্‌নসিস্ উপেক্ষা করে সে বহাল তবিয়তে ম্যানেজারি করে চলেছে আর মাসান্তে পাঁচশ টাকা মাহিনা খিঁচে নিচ্ছে।

—সেটাই আমার প্রথম প্রশ্ন। দিন কয়েক আগে ওখানকার একটি মেয়ে

চিঠিতে আমাকে লিখেছে, রঞ্জন ভালই আছে—তার একদিনের তরেও জরজারি হয়নি, বা…

—সে হালুয়া! তুমিও যে ঠাকুরমশায়ের মতো আমাকে অ্যাকিউজ করছ! আরে বাবা, রুগী যদি বহাল তবিয়তে থাকে তাহলেও কি ডাক্তার দায়ী?

কুনালের এ রসিকতাটা খুব রুচিসম্মত মনে হল না ওর, একটু গম্ভীর হয়ে বলে—না, আমি বলছি…

হঠাৎ স্বর বদলে কুনাল বলে, নিবে যাবার আগে প্রদীপ শেষ বারের মতো দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। শোননি?

অতসী নিশ্চুপ বসে থাকে। শুধু সিলিং ফ্যানের একটা শব্দ। এই অবকাশে চাকরটা নামিয়ে রেখে গেল চায়ের কাপ।

কুনাল অন্য সুরে প্রশ্ন করে, এবার বল, তোমাকে এত শুকনো শুকনো লাগছে কেন? কী ডাক্তারী পরামর্শ চাইতে এসেছ আমার কাছে? শারীরিক অসুবিধাটা কী?

অতসী নয়ন নত করে, অস্ফুটে শুধু বলে, আয়াম ক্যারিয়িং…

কুনাল পূর্বমুহূর্তে ঠোঁটে গুঁজে দিয়েছে একটি সিগ্রেট। দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরাবার উপক্রম করছিল। এ সংবাদে তার হাতটা থমকে গেল। পুরো কাঠিটাই জ্বলে গেল ওর হাতে। কাঠিটাকে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে সিগ্রেটটা নামিয়ে রাখল। একটা নিঃশ্বাস পড়ল তার। বললে, আই সী।

মিনিটখানেক দুজনেই নীরব। তারপর কুনাল নড়েচড়ে বসে। সিগ্রেটটা ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, সে ক্ষেত্রে অনেক আগে আসা উচিত ছিল তোমার। আই থিংক, এটা তৃতীয় মাস, নয়?

—হ্যাঁ, খুব কি দেরী করে ফেলেছি?

—না, মানে এসব হাঙ্গামা একেবারে প্রথম দিকে মিটিয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব, অতসী। ভয় পেও না।

—প্রথম দিকে মিটিয়ে ফেলা মানে? তুমি কি অ্যাবর্শানের কথা বলছ?

—নিশ্চয়। তুমি কি সেজন্যই আসনি?

—না তো। সুস্থ সবল সন্তানই কামনা করছি আমি।

—রঞ্জন তোমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত?

—সে এসব কথা জানেই না।

—সে কি!

—ইতিমধ্যে সে কলকাতায় এসেছে কিনা জানি না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। আর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান নেই আমাদের।

কুনাল অনেকক্ষণ জবাব দেয় না। বুঝে উঠ্‌তে পারে না—সমস্যাটা কোন জাতের। যার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করছে তার সঙ্গে ওর পত্রালাপও নেই কেন? ঝগড়া? কেন? রঞ্জন কি অতসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে···কিন্তু সে-ক্ষেত্রে অতসীর তো ভারমুক্ত হবার প্রেরণাটাই প্রথম আসবে হঠাৎ কুনালের মনে হল—তার সামনে বসে থাকা ঐ মেয়েটাকে সে চেনে না আদৌ। আরও মনে হল—সে নিজেই যদি ঐ কাণ্ডটা করে বসত, তাহলে অতসী কি পারত তাকে প্রত্যাখ্যান করতে? অনেকক্ষণ নীরবে সিগারেট টেনে শেষে বলে, তুমি ঠিক কী চাও বল তো? কী জাতের সাহায্য চাইছ?

—আমাকে কোন নির্ভরযোগ্য গাইনকলজিস্টের জিম্মায় সমর্পণ করে দাও।

—তুমি একা একা তাকে মানুষ করতে পারবে?

—কেন পারব না কুনাল? লোকলজ্জা? আমি ভ্রূক্ষেপ করি না

—কিন্তু তার চেয়ে কি ভাল হয় না, সেই সন্তানকে বৈধ করে নেওয়া? সেটা হয়তো সহজেই হতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

—কী দরকার? সে তো এসব জানে না। হয়তো দু-চার সপ্তাহের মধ্যেই সে···

কুনাল অপেক্ষা করে। বাক্যটা কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল

জানলা দিয়ে কুনাল বাইরের দিকে তাকায় রাস্তার ওপারে গীর্জার ক্রুশ-চিহ্নটা নজরে পড়ল দু একটা নিঃসঙ্গ চিল উড়ছে দূর আকাশে হঠাৎ একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে অতসী যে, দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে একটা মানুষ সান্ত্বনা পাবে যদি জানতে পারে এই পৃথিবীতে সে একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাচ্ছে?

অতসী শুধু না-য়ের ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়ল।

কুনাল ইতস্তত ভাবটা ঝেড়ে ফেলে বললে, কিছু মনে কর না অতসী, সে কি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আই মীন ··

অতসী ওকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল। বলে, সবাই একদিন জানবেই; তড়িঘড়ি কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। ছোটখুকিকেও নয়।

কুনাল সেই খণ্ডমুহূর্তে রঞ্জনকে ঈর্ষা না করে পারছিল না। ওর হাত দুটো নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে বললে, মেডিক্যাল-এথিক্সটা আমার জানা আছে

অতসী। রোগীর গোপন কথা ডাক্তারে বলে বেড়ায় না। যে প্রশ্নটার জবাব দিলে না, সেটা যদি অধিকার বহির্ভূত···

এবারও ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অতসী বললে, সার্টেনলি নট! অধিকার আছে বইকি তোমার। তুমিই তো আমার একমাত্র বন্ধু। আমরা দুজনেই স্বেচ্ছায়···

কুনাল কি এবার নিশ্চিন্ত হল? অতসীকে কেউ বলাৎকার করেনি জেনে খুশি হল?

॥ ১৫ ॥

দিন-আষ্টেক পরের কথা। শনিবার। আড়াইটেয় ছুটি। বেলা বারোটা নাগাদ বংশী এসে জানালো বড়বাবুর টেবিলে একটা বাইরের কল এসেছে। টেলিফোনে কেউ অতসীদিকে খুঁজছে। অতসীর টেলিফোন কল কস্মিনকালেও আসে না। সে এগিয়ে এসে ধরল। কুনাল কথা বলছে। জানালো, আজ সন্ধ্যায় পাঁচটার সময় বাড়িতে তৈরী হয়ে থেক। আমি আসব! গাইনোক-লজিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। আমিই নিয়ে যাব।

অতসী স্বীকৃত হয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখে। বড়বাবু মনোজ ঘোষ বলেন, শরীর-গতিকটা কি ভাল নেই অতসী? কদিন থেকেই দেখছি···

—হ্যাঁ, সে জন্যই ফোন করছিলেন আমার এক আত্মীয়। আজ ডাক্তারখানায় দেখাতে যাব।

—তাই যেও। আজকাল কত্তরকম অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যারামই না হচ্ছে। প্রথম থেকেই ডাক্তার দেখানো বুদ্ধিমানের কাজ।

ফিরে এসে বসল নিজের টেবিলে।

অফিস ছুটি হলে বাসে চাপল। কুনাল অনেক—অনেক দিন পরে আজ আসবে; বিয়ের পর এই প্রথম। কিছু মিষ্টি নিয়ে যাবে না কি? কিন্তু কে জানে, সে হয়তো সেটা পছন্দ করবে না। ভাববে, ফর্মালিটি। তাই বাড়ির কাছাকাছি বাস থেকে নেমে সে একটা মনিহারী দোকানে ঢুকল। এক কৌটা কফি আর নিম্‌কি বিস্কিট কিনে নিল শুধু। দুধচিনি বাড়িতেই আছে। নেই কফি।

বাড়ির কাছাকাছি এসে মনে হল, সর্দারজীর হোটেলে বেঞ্চিতে যে লোকটা

বসে আছে তার মুখটা চেনা-চেনা। বাইরে প্রখর রৌদ্র, লোকটা বসেছে ছায়ায়; তার উপর পাশ ফিরে। একনজর দেখেই দৃষ্টিটা সরিয়ে নিল অতসী। তালা খুলে ঘরে ঢুকবে—লোকটা হঠাৎ দেখতে পেল ওকে। প্যান্ট-শার্ট, পায়ে চপ্পল, কাঁধে একটা ঝোলাব্যাগ। এগিয়ে আসতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল অতসী। তালার ছিদ্রে চাবিটা প্রবেশ করাতে পারছে না আর। হাতটা এতই কাঁপছে। মাত্র তিনমাসে কী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা হয়েছে ওর। প্রদীপ কি নিববার আগে···

কোনক্রমে বললে, তুমি। কতক্ষণ এসেছ?

এক গাল হেসে রঞ্জন বললে, হাওড়া স্টেশনে এসেছি বেলা বারোটায়। এখানে তিনটেয়।

অতসী এতক্ষণে নামলেছে; কিন্তু বুকটা ধক্ ধক্ করছে। এতটা উত্তেজিত হবারই বা কী আছে? বড়মামা নেই, নির্জন বাড়ি···তাই? কিন্তু ও কি জানে না? ও কি চেনেনা ঐ ছেলেটাকে? কিন্তু তিনমাসে যদি তার মানসিক পরিবর্তনও ঘটে থাকে? গাল দুটি যেমন লাল হয়েছে, পুরন্ত হয়েছে—হৃদয়টাও যদি তেমন কামনার রঙে রক্তিম হয়ে থাকে?

—বেলা বারোটায় হাওড়ায় এসেছ তো অফিসে আসনি কেন?

রঞ্জন ম্লান হেসে বলে, চল, ভিতরে চল, বলছি—

দুজনে ভিতরে আসে। অতসী সদরে আগড় দেয়। ওর মুখোমুখি হতে রঞ্জন বলে, কে কতটা জানেন, জানি না তো। তাই অফিসে দেখা করতে সাহস হল না।

দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে ঘরের দিকে। অতসী জানতে চায়, সেই যে চাকরিতে জয়েন করতে গেছিলে তারপর এই এলে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি যদি আজ রাত করে ফিরতাম? বা আদৌ বাড়ি না ফিরতাম?

—আমি যে জানতাম, অফিস থেকে তুমি সোজা বাড়ি ফিরবে। সন্ধ্যা পাঁচটায় তোমাকে ডাক্তারবাবু দেখতে আসবেন।

চমকে ওঠে অতসী। বলে, তুমি তাও জানতে? কেমন করে? আমি তো আজ সকালে ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। তখনো তোমার ট্রেনটা ইন করেনি।

—চল, বলছি।

রঞ্জন দাওয়ার উপর তার কাঁধব্যাগটা নামিয়ে রাখে। শার্টটা খুলে ফেলে। ঘামে-ভেজা গেঞ্জিটাও। বালতিতে তোলা জল ছিল। মুখ হাত ধুয়ে নেয়।

দড়ি থেকে টেনে অতসী তার গামছাটা পেড়ে নামায়। বাথরুম থেকে সাবানটা নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে সে তার শোবার ঘরের তালাটা খুলে ফেলেছে। ঘরে ফ্যান নেই। হাতপাখাটা নিয়ে বারান্দাতেই মাদুর পেতে বসে। রঞ্জনও এসে বসে। অতসী ওকে হাওয়া করতে করতে বলে, এবার বল ?

রঞ্জন ওর হাত থেকে তালপাখাটা কেড়ে নেয়। বলে, ডাক্তারবাবু আমার কাছে একজন লোককে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, আজ বিকাল পাঁচটায় তিনি তোমাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাবেন। আমাকে লিখেছিলেন পাঁচটার মধ্যে এখানে অবশ্য অবশ্য আসতে। যে ছেলেটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিল তার হাতে ঠিক সময়ে আসতে পারব কি না তা জানাতে লিখেছিলেন।

অতসীর কান দুটো ঝাঁঝা করছে। এই হচ্ছে কুনালের মেডিক্যাল এথিক্সের নমুনা! রোগিনীর গোপন সংবাদ সঙ্গোপনে রাখা। কী ভেবেছে কুনাল ? আজ সন্ধ্যায় সে এলে অতসী সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবে তার সাহায্য নিতে। বলবে, ধন্যবাদ। আপনাকে কিছু সাহায্য করতে হবে না।

সামলে নিয়ে বলে, তুমি তাঁকে কী জানালে ? সময়ে উপস্থিত হবে ?

—হব না ? আমিই তো কালপ্রিট ! তুমি ভারমুক্ত হতে নার্সিং হোমে যাবে, আর আমি নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে বসে থাকব ?

আশ্চর্য ! অপরিসীম আশ্চর্য। তুমি নিজে হাতে একটা চারাগাছ পুঁতেছিলে। হঠাৎ জানতে পারলে, সে গাছ ফুলে ফলে ভরে উঠেছে—তুমি ভ্রূক্ষেপও করলে না ! খবরটা শুনে বললে, তাই নাকি ?

ও আবার কবি বলে বড়াই করে ! একবার মনে হল—সিদ্ধান্তটা পাল্টে নেয়। এমন একটা অমানুষের সন্তানের ভার সে আজীবন বইতে পারবে না।

কিন্তু ! সেই অজাত ভ্রূণের কী অপরাধ ?

—একটা কথা বলব, অতসী ?

কুঞ্চিত-ভ্রূভঙ্গে অন্য দিকে তাকিয়ে অতসী বলে, কী ?

—তোমার ঐ সিদ্ধান্তটা কি কোনমতেই বদলানো চলে না ?

—কোন সিদ্ধান্ত ?

—ঐ…ইয়ে…মানে, অ্যাবর্শানের ?

এ আলোচনা একটুও ভাল লাগছিল না অতসীর এ কী বিড়ম্বনায় তাকে ফেলল কুনাল ? তাকিয়ে দেখে, উত্তরের অপেক্ষায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে ছেলেটা। যাহোক কিছু বলতে হয়। বলে, আর কী করতে পারি আমি ?

—না! তা তো বটেই। কিন্তু ধর, আমি যদি তোমাকে রেজিষ্ট্রি-মতে বিয়ে করি?

অতসী চোখ তুলে তাকায়। ওর চোখে চোখ রেখে বলে, কেন? আমার পেটে যেটা এসেছে তাকে বাঁচাতে?

—না, না—শুধু তাই নয়। ইয়ে হয়েছে···এই তিনমাসে আমি বুঝতে পেরেছি···মানে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল এ কয়মাস···

হঠাৎ উদ্গত কান্নায় গলাটা বুজে যায় অতসীর। কিন্তু না, ভেঙে পড়লে তো চলবে না। সে কেমন করে ওকে বলবে, অতসীকে পেলেও সে বাঁচবে না। নিবে যাওয়ার আগে, অন্ধকারে চিরকালের মতো বিলীন হবার আগে, এ শুধু প্রদীপশিখার শেষ দপদপানি। মনটা হুহু করে ওঠে। মুহূর্তমধ্যে সিদ্ধান্তে এল অতসী: তুমি যদি তাই চাও রঞ্জন, তবে তাই হবে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসল ছেলেটা। ছেলেটা নয়, সে রাত্রের সেই সুপ্ত সিংহটা। দুই থাবা বাড়িয়ে দিয়ে ধরল অতসীর দুই বাহুমূল। সজোরে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে অতসীর ঘামে-ভেজা মুখটা চুমায় চুমায় ভরে দিল।

অতসী কোনক্রমে বলে অ্যাই! কী হচ্ছে! চারিদিকে দু-তিন-তলা বাড়ি!

—তবে ঘরে চল?

লুটানো আঁচলটা বুকে তুলে নেয়। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে সে প্রবেশ করে তার শয়নকক্ষে। এগিয়ে গিয়ে বসে বড় মামীর ডবল-বেড খাটে। রঞ্জন ঘরের একমাত্র দক্ষিণের জানলা দুটো যতক্ষণ বন্ধ করতে ব্যস্ত ততক্ষণে ওর দিকে পিছন ফিরে কাঁপা-কাঁপা হাতে পিঠের দিকে বোতামগুলো খুলতে থাকে অতসী।

প্রায় আধঘন্টা পরে।

বালিশে আধশোয়া অতসী প্রশ্ন করে, কটা বাজল গো?

রঞ্জন চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। মণিবন্ধের ঘড়িটা দেখে বলে, পাঁচটা বাজতে এখনও সওয়া-ঘন্টা বাকি।

—গা ধোবে তো? ওঠ। আমিও তৈরী হয়ে নিই।

—তাড়া কি? তুমি তো আজ আর নার্সিং হোমে যাচ্ছ না।

—যাচ্ছি। কুনাল তোমাকে মিছে কথা জানিয়েছিল। কেন লিখেছিল জানি না, কিন্তু সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ!

—উনি আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় আসবেন না?

—আসবেন। আমরা গাইনোকলজিস্টের কাছেও যাব। তবে ভয়মুক্ত হতে নয়।

রঞ্জন উঠে বসে বালিসটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বলে, মানে?

—আমি আজ গাইনোর কাছে যাচ্ছিলাম জাস্ট চেক আপ করাতে। কুনাল জানে, আমি সুস্থ-সবল সন্তানই চেয়েছিলাম।

—আশ্চর্য! অথচ আমাকে কিছু জানাওনি? আমাদের বিয়ে না হলেও ..

—হ্যাঁ। কারণ তোমার চোখে যে আমি—'অতসীদি'। তোমার ধারণায় যে, সে রাত্রের ওটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।

রঞ্জন অনেকক্ষণ জবাব দিল না তারপর উঠে গিয়ে জামার পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে আনে মৌজ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, তোমাকে দোষ দিতে পারি না। আমার তখন ধারণা হয়েছিল, তুমি কোনদিনই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলবে এ আমার পাগলামি। আর তাতেই আমার ধারণা হয়েছিল—সে রাত্রে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে···

অতসী ওর চুলটা এলোমেলো করে দিয়ে বলল, বদ্ধ পাগল একটা। কিন্তু তোমার দাদা-বৌদিকে···

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে রঞ্জন বললে, ওঁরা হয়তো কিছুটা আন্দাজ করেছেন

—সে কি? কেমন করে?

—তোমাদের ঐ নাম-করতে-নেই-এর কৃপায় বুড়ো ভামটা মাজুদিহি থেকে ফিরেই বাগুইআটি গেছিল—দাদা-বৌদির কান ভাঙাতে বৌদি আমাকে লিখেছে—ব্যাপারটা কী, তা জানাতে। জানতে চেয়েছে আমার বউএর পরিচয়ে সত্যিই কেউ গিয়েছিল কি না। কালই তাঁদের সব কথা খুলে বলব

—কাল? আজ রাত্রে নয়?

একটা আড়ামোড়া ভেঙে রঞ্জন আবার আরাম করে শোয় বলে, না। আজ রাত্রে আমি তোমার অতিথি। ভালমন্দ রান্নার জোগাড় দেখ। না হলে চল —চীনা হোটেলে গিয়ে চাও মিঙ আর চিলি চিকেন খেয়ে আসব দুজনে। ভয় ছিল তোমার বড়মামাকে ও সর্দারজী বলেছে, 'উনি আজকাল এখানে থাকেন না। ব্যাস্ আমা তে পা বাবো

—কিন্তু ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে তোমার ঝগড়াটা বাধল কী নিয়ে?

রঞ্জন বিস্তারিত জানালে ঘটনাটা

ঠাকুরমশাই মাজুডিহি গেছিলেন পিরিওডিক্ ইন্সপেক্শনে। বিনা কারণেই তিনি গায়ে পা তুলে ঝগড়া শুরু করে দিলেন। কিছুটা কথা-কাটাকাটির পর তিনি যখন রঞ্জনকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবার হুমকি দিলেন তখন—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বোমার মতো ফেটে পড়েছিল দোবেজী। শান্ত শিষ্ট ধর্মভীরু মানুষটা রুখে দাঁড়ালো। ঠাকুরমশাই তাতে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন: তোকেও তাড়াব! যা, তুইও যা! ঘর ছেড়ে দে আমার! তোকেও বরখাস্ত করলাম!

রঞ্জন বললে, তুমি আন্দাজ করতে পারবে না অতসী, তারপর কী কাণ্ড হল। কাঠ-চেরাই কলের সব কটা মজদুর এককাট্টা হয়ে ঘিরে ধরল মালিককে। বললে, দোবেজী কিম্বা তাদের বাবুজীর যদি চাকরি যায়, তবে তারাও কেউ ওখানে কাজ-কাম করবে না। তারা মেহনতী মানুষ! অন্য কোনো কাঠ-চেরাই কলে কাজ খুঁজে নিতে দেরী হবে না ওদের। ঠাকুরমশাই তখন ক্ষেপে ব্যোম্ হয়ে গেছে। চিরকাল সে ওদের রক্ত চুষেছে, কেউ কখনো প্রতিবাদ করেনি—আজ এতবড় কথায় লোকটা হিতাহিত জ্ঞান হারালো। বললে, ঠিক হ্যায়, তোরাও যা! সবকটাকেই বরখাস্ত করলাম আমি। কাল সকালের মধ্যেই সবাই আমার কারখানা ছেড়ে চলে যাবি। আমি সাঁওতাল মুনিষ নিয়ে আসব! কালই!

অতসী কুনুই-এ ভর দিয়ে আধশোয়া হয়েছে। বলে, তারপর?

—তারপর একটা ভোজবাজি হল যেন। চেরাই কলের সর্দার ভিখু—একটা দানব—এক পা এগিয়ে এসে বললে, ঠাকুর-মোশা! কাল সকালে সাঁওতাল ভাইয়েরা ছাইভস্মের কী চেরাই করবে? ভুক্কো তারা না ডুবতেই তো আজ ভোর রাতে তোমার কাঠ-গুদামে আগুন লাগবে! হ্যাঁ ঠাকুর মোশা', কত টাকার লগ্ লাদ দেওয়া আছে গো তোমার? লাখো রুপেয়া?

ঠাকুরমশাই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। তোৎলা হয়ে গেল লোকটা। বললে, তু—তুই এতবড় কথাটা বল্‌লি ভিখ্‌ন? আমি থানায় গিয়ে এখনই···

দানবটা কুঠার কাঁধে এক পা এগিয়ে এসে বললে, লেকিন থানায় যাবে কোনটা? তোমার মুণ্ডুটা না ধড়টা?

ঠাকুরমশাইয়ের বা হরে গেছে।

—শুনিয়ে মালিক! ইয়ে কোই নয়া বাৎ নহী হৈ! মৈনে দশবরিষ জেলমে খা; পুচিয়ে ইনলোগোঁ কো!

বুঝিয়ে দিয়েছিল—আজ ছেড়ে দিলাম; কিন্তু বিজন বনে ভবিষ্যতে যখন

তুমি কাজ তদারকিতে আসবে, তখন ওখানে তোমাকে পুঁতে ফেললেও—খানা দূর অস্ত্—কাকপক্ষীতেও টের পাবে না!

—তারপর?

—ঠাকুরমশাই ওখানে জলস্পর্শ করেনি। ফিরে এসেছিল সেদিনই। আমি সরাইকেল্লায় গিয়ে সরকারী দফ্তরে দরবার করি। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও। ওঁরা বললেন, আমাদের যা কর্মীসংখ্যা তাতে আইন-মোতাবেক আমরা শ্রমিক ইউনিয়ন দাবী করতে পারি। তাই করেছি আমরা। সরাইকেল্লার এক বাঙালী উকিলবাবুকে লাগিয়েছে। ঐ কোঁটাকাটা অর্ধপিশাচটাকে আমি দেখে নেব।

—ও কীভাবে প্রতিশোধ নিতে পারে?

— নিতে পারে নয়, নিচ্ছে। ও বুঝে নিয়েছে, আমিই পালের গোদা। তাই ফিরে এসেই দাদা-বৌদির কাছে গিয়ে আমার নামে লাগিয়েছে। দ্বিতীয়ত আমার মাইনা থেকে ইন্সিওর প্রিমিয়ারের মোটা টাকাটা এবার থেকে কেটে নেবে বলে হুমকি দিয়েছে। উকিলবাবু বলেছেন, আইনত সে তা পারে।

—ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম মানে?

—আমাকে যখন চাকরি দেয় তখন বুড়ো ভামটা বলেছিল, সিকিউরিটি হিসাবে আমাকে একটা ইন্সিওরেন্স করতে হবে বিশ হাজার টাকার। প্রিমিয়াম সেই দিয়ে যাবে, তবে নমিনি ঐ ঠাকুরমশাই।

ধীরে ধীরে খাটের উপর উঠে বসে অতসী। বলে, কী বললে? লাইফ ইন্সিওর করেছ? ঠাকুরমশাই নমিনি? কবে ইন্সিওর করেছ?

—ঐ তো বললাম, চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এই তিনমাস হল।

—বিশ হাজার টাকা! তোমাকে হেল্থ এক্সামিনেশান করাতে হয়নি?

—কেন হবে না? ঐ ডাক্তারবাবুই তো করেছিলেন।

—'ঐ ডাক্তারবাবু' মানে? কুনাল? সে তোমার পলিসিতে তিনমাস আগে ডাক্তার হিসাবে সই দিয়েছে?

—হ্যাঁ। এতে অবাক হবার কী আছে?

অতসীর মুখে জবাব যোগায় না। আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! কুনাল? সব জেনেশুনে ঐ 'মৃত্যুপথযাত্রীর পলিসিতে ডাক্তার হিসাবে সই দিয়েছে। হ্যাঁ, সে ভগবান মানে না, কিন্তু মেডিক্যাল এথিক্স? দেশের আইন? শুধু ডিগ্রী খোয়ানো নয়, জেলখাটার সম্ভাবনাও যে আছে—প্রতারণার দায়ে।

—কই বললে না তো? এতে অবাক হবার কী আছে?

—আসছি বাথরুম থেকে।—বলে, ঘর ছেড়ে উঠে যায়।

স্নানঘরে অর্গলবদ্ধ নিরালায় সে ভাবতে থাকে—এখন কী তার করণীয়, কতটা ওকে বলা চলে? কুনাল এখন কি ওর শত্রুপক্ষে? অনেক পরে মুখে চোখে জল দিয়ে ফিরে এসে বললে, একটা কথা রঞ্জন। সেদিন তুমি এরিক সেগল্-এর 'লাভ স্টোরি' গল্পটা আমাকে শুনিয়েছিলে। নিশ্চয় মনে আছে তোমার। গল্পে বলা হয়েছে—জেনী তার চরম দুর্ভাগ্যের কথাটা প্রথম জানতে পেরেছিল তার স্বামীর কাছ থেকে নয়, ডক্টর শেফার্ডের কাছ থেকে। তোমার কি মনে হয় ডক্টর শেফার্ড জেনীর স্বামীকে না জানিয়ে ঐ খবরটা তাকে জানিয়ে অন্যায় করেছিলেন?

এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা হঠাৎ কেন পেশ করল, সে কথা জানতে চাইল না রঞ্জন। বোধকরি সে নিজেও অমন উলটো-পালটা প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলে হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত কৌতূহল তার মাথায় জাগে—অতসী কলেজ জীবনে প্রেম করেছিল কি না, তার প্রাক্তন প্রেমিক এখন তার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে, ইত্যাদি। তাই অতসীর কৌতূহলের উৎস সম্বন্ধে কোন কৌতূহল হল না তার। একটু ভেবে নিয়ে বললে আমার মতে অন্যায় করেননি। দেখ অতসী, অলিভারের পক্ষে তার স্ত্রীকে কথাটা বলা কঠিন, কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুপথযাত্রীকে একজন না একজন তো খবরটা জানাবেই? মানে জানাতে হবেই?

—কেন? জেনী যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুই না জানত, তাতেই বা ক্ষতি কী?

—বাঃ! তা হয় না সেটা অন্যায় হত। জেনীর প্রতি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন সেটা তাকে দেওয়া উচিত। দেখ, ডক্টর শেফার্ড তাকে আগেভাগে জানিয়েছিলেন বলেই সে শান্ত সমাহিত চিত্তে অনিবার্য পরিণামকে বরণ করে নিতে পারল। বলির পাঁঠার মতো বীভৎসভাবে হাড়িকাঠ ছেড়ে পালাতে চায়নি।

নতমস্তকে অতসী কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বললে আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? আমার যদি ঐ অসুখটা করে, আর তুমি যদি আমাকে জানাতে, আমি জেনীর মতো সেটা সইতে পারতাম?

—যাঃ! কী সব আডাক কুডাক ডাকছ। এসব কথার কোন মানে হয়?

—না, বল না? তোমার কী মনে হয়? আমি পারতাম?

রঞ্জন গম্ভীরভাবে বলে আমার বিশ্বাস তুমি পারতে। যা অনিবার্য, তাকে শান্ত চিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই তো বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

—যুক্তি দিয়ে সব সময় কি 'ইমোশানকে পরিচালনা করা যায় ?

—না, যায় না। যাওয়া উচিত। তুমি পারতে। তোমার মনের জোর আছে।

—আর তুমি নিজে হলে ?

ভ্রূ দুটি কুঁচকে ওঠে ওর। বোধকরি কিছু একটা সন্দেহ জাগে তার মনে। একটু ঝুঁকে আসে সামনের দিকে। বলে, কী বলতে চাইছ বল তো ?

অতসী দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াতেও সাহস পায় না। যদি বুঝে ফেলে ! কিন্তু বোঝাতেই তো চাইছে। বলতেই তো চায়। সে জন্যই তো এই দীর্ঘ তির্যকপন্থার ভূমিকা।

—দু মীন, আমার লিউকেমিয়া হয়েছে ?

সরাসরি প্রশ্ন ! কিন্তু সরাসরি জবাবটা জোগালো না অতসীর মুখে। বলে, প্রথম দিকে সেই রকমই আশঙ্কা করেছিলেন ডাক্তারবাবু। সেজন্যই কুনাল তোমার ব্লাড-স্যাম্পেল নিয়ে আসে। আর সেই উৎকট ধারণার বশবর্তী হয়েই ঐ কয়ালোকিন্বর তোমাকে পাঁচশ টাকা মাহিনায় বহাল করে। ঐ ইন্সিওরেন্সটা করায় !

মন্নন ধীরে ধীরে নেমে পড়ে ডবল্-বেড খাট থেকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় রুদ্ধ জানলার কাছে। পাল্লা দুটো খুলে দেয়। পড়ন্ত সূর্যের এক ঝলক আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। দমকা একটা হাওয়া। দূরে বড় রাস্তা দিয়ে একটা মিনি-বাস তীক্ষ্ণ শীৎকারে স্থানটাকে সচকিত করে উর্ধ্বশ্বাসে কোথায় ছুটেছে—যেন হাড়িকাঠ থেকে পালাতে চাইছে একটা বলির পাঁঠা। সামনে-বাড়ির ছাদে একটা অল্পবয়সী বউ—শ্যামলা রঙ তার, পরনে শান্তিপুরে লাল-সাদা ডুরে—পরখ করে দেখছে, ভিজে কাপড়গুলো শুকিয়েছে কিনা। ছাদে একটা খালি-গায় হাফপ্যান্ট পরা ছেলে—ঐ নতুন বউয়ের 'দ্যাওর' নাকি ?—ঘুড়ি ওড়াচ্ছে : ভো কাট্টা ! এই মুহূর্তেই পৎপৎ করে উড়ছিল ওর এক-তেল পখিয়ালটা। ভাখ্ না ভাখ্ এসে হাজির হল ঐ দো-তেল পেট-কাটা। পখিয়ালটা গোঁৎ খেয়েছিল ঠিক সময়েই—দো-তেলটাকে তল্-টান নিতে দেবে না ! সে ছেড়ে খেলতে চায়, কিন্তু দো-তেল-এ বোধহয় কাঁচগুঁড়োর নয়া মাঞ্জা—সে টেনে খেলাই পছন্দ করল ! পখিয়ালের তলপেট নিয়ে চড়চড় করে উঠে গেল মুহূর্তমধ্যে। আগের খণ্ডমুহূর্তে দখিনা বাতাসে যে পৎপৎ করে উড়ছিল, এখন সে ডানে-বাঁয়ে হেলতে দুলতে নামছে অনিবার্য আকর্ষণে, মা-পৃথিবীর দিকে। যেন মাতাল। গলি দিয়ে একপাল অর্ধউলঙ্গ ছেলে লগি হাতে ছুটছে কাটা ঘুড়িটা ধরতে।

রঞ্জন এক দৃষ্টে দেখছিল ঘুড়ির প্যাঁচ। অথবা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অতসী নিশ্চুপ অপেক্ষা করছিল খাটে বসে। আকাশের ঘুড়ি সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু দেখতে পেল রঞ্জনের পিছন ফেরার ভঙ্গিটা। কাটা ঘুড়ির মতো টলতে টলতে সে এগিয়ে এসে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। ম্লান হাসল। বললে, আশ্চর্য! এটা তো আমার আশঙ্কাই হয়নি কোনদিন।

—হওয়ার কথাও তো নয়। তেমন ইঙ্গিত তো তোমাকে কেউ দেয়নি তখন!

—'তখন'কার কথা আমি বলছি না অতসী। বলছি 'এখন'কার কথা।

অতসী জানতে চায় না, তার মানে কী?

—করালীকিঙ্কর লোকটাকে আমি চিনি। লিউকেমিয়ার পজেটিভ রিপোর্ট হাতে না পেলে—দু-তিনজনকে দিয়ে ভেরিফাই না করে—সে এই বোকামি করত না! এখন অনেক—অনেক কিছু বুঝতে পারছি···

না, কাঁদবে না অতসী। জেনী কাঁদেনি, অল কাঁদেনি! হে ঈশ্বর! কান্নায় যদি ভেঙে পড়তে হয়, তবে যেন দুজনে একসঙ্গেই ভেঙে পড়ে। রঞ্জন এখনো শক্ত—এখন অতসীর ভেঙে পড়া চলবে না।

—কেন তুমি ট্রেনের কামরায় ঐ সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলে। জামসেদপুরে না গিয়ে হঠাৎ মাদুডিহি যাবার ইচ্ছে কেন হল তোমার!···শুধু করুণা করে, আমাকে জন্মের শোধ আনন্দ দিতে সেদিন রাত্রে—

খাটের উপর উবুড় হয়ে পড়ে অতসী। অস্ফুটে বলে, না! না! বিশ্বাস কর!

—থামো। তোমরা সবাই সমান! শুধু করুণাই করেছ আমাকে! ভিক্ষা দিয়েছ!

দুহাতে মুখটা ঢাকা দেয় রঞ্জন। কাঁদেনি কিন্তু সে।

অতসী কিন্তু পারল না। ওর পিঠটা শুধু ফুলে ফুলে উঠছে। অনেক—অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেল, যেন বহু দূর থেকে ছেলেটা জানতে চাইছে, কতদিন মেয়াদ আছে আমার? তুমি কিছু জান?

অতসী না-য়ের ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়ে।

রঞ্জন মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নেয়। বলে, 'সরি' বলব না, ওটা বলা বারণ। কিন্তু স্বীকার করছি—আমি অন্যায় বলেছি অতসী! গোটা রামায়ণটাই তো জন্ম নিয়েছে করুণার উৎসমুখে! না···তুমি করুণা করেই শুধু ভালবাসনি আমাকে। 'মা নিষাদঃ' শ্লোকটার শেষ শব্দটা যেন কী ছিল অতসী?

ওকে শক্ত হতে হবে। আঁচলে চোখ মুছে খাটের উপর উঠে বসে এতক্ষণে। বলে, একটু দুধ গরম করে দেব? খাবে?

এতক্ষণে হাসল। বললে, তাতে আমার নির্দিষ্ট সাতশ' বারো ঘণ্টার মেয়াদটা কি এক সেকেণ্ডও বাড়বে?

অতসী জবাব দিতে পারে না—না, বাড়বে না। সংখ্যাটা যদি তাই হয়, তবে তাই থাকবে।

—তার চেয়ে দুধটা তুমিই গরম করে খাও অতসী। তুমিই তেতে পড়েছ। এই দেখ, আমি তো পড়িনি—'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়। এই শেষ কথা বলে, যাব আমি চলে।'

অতসী কি উঠে গিয়ে ওর হাতটা ধরবে? মাথায় আলতো করে হাত বুলাবে?

—তাছাড়া আমার এ দেহের লক্ষকোটি জীবকোষ যখন ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনো তো আমি মরব না! আমার একটি জীবকোষ যে নিরাপদে সঞ্চিত রাখা আছে তোমার দেহের সেফ ডিপজিট-ভল্টে। ঐ এক গ্লাস দুধে তাকে বাঁচিয়ে রাখ অতসী! ওটাই তো বেঁচে থাকবে 'আমি' হয়ে। আমার 'আমি'।

অতসী খাট থেকে নেমে পড়ে। বুক থেকে তার আঁচল খসে পড়েছে — খেয়াল নেই; চুল তার আলুথালু—ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর দিকে এক পা অগ্রসর হতেই বাঁ হাত তুলে পাগল কবিটা বাধা দিয়ে বললে, "May there be no moaning of the bar, when I put out to sea."

অতসী থমকে গেল। সচেতন হল। আঁচলটা টেনে নিল বুকে। এলো-খোঁপাটা জড়িয়ে নিল মাথায়। রঞ্জন একদৃষ্টে তাকিয়েছিল ঐ খোলা জানলা দিয়ে, গরাদ-ঘেরা একমুঠো আকাশের দিকে, যেখানে আর একটা একতেলের ধরতাই দিচ্ছে খিলখিল-হাসি বৌদি তার বাচ্চা দেওরকে। এ ঘরের এই নিদারুণ আঘাতে পাশের বাড়িতে কোন পরিবর্তন হয়নি। দুনিয়া আছে বেদাগ! হঠাৎ এপাশে ফিরে রঞ্জন বললে, কাগজ-কলম আছে অতসী? আমার···আমার একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। এখনই, এই মুহূর্তেই।

অতসী নিঃশব্দে উঠে গেল। লেটার-প্যাড আর কলমটা বাড়িয়ে ধরে।

—না, চেয়ার-টেবিল নয়। আমি শুয়ে শুয়ে লিখি।

বালিসটা বুকের তলায় টেনে নিয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করবে, হঠাৎ তার নজরে পড়ল অতসী এসে দাঁড়িয়েছে খাটের পাশে। তার হাতে একটা জলের গ্লাস আর কী দুটো ট্যাবলেট।

—কী ওটা ?

—ওষুধ। খেয়ে নাও।

কীসের ঔষধ, কেন খাবে, জানতে চাইল না কবি। হাত বাড়িয়ে ট্যাবলেট দুটো নিয়ে মুখে পুরে দেয়। চকচক্ করে জলটা খেয়ে ফেলে। কলমের খাপটা খুলে অতসীর দিকে বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে বলে, প্লীজ ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি ফর হাফ-অ্যান আওয়ার।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ঘুমের ওষুধের কল্যাণে ক্লান্ত কবি তার অসমাপ্ত কবিতার উপর মাথা রেখে অঘোর ঘুমে চলে পড়েছে। এক পক্ষে এ ভালই হল। কুনালের সঙ্গে অনেক অনেকগুলো বোঝাপড়া বাকি আছে তার। সেগুলো রঞ্জনের উপস্থিতিতে না হাওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রথম কথা—কোন অধিকারে সে অতসীর গোপন কথা রঞ্জনকে জানালো। দ্বিতীয়ত, তাহা মিথ্যা কথাই বা লিখল কেন ? আর সবচেয়ে বড় কথা— কোন নীতিবোধের দোহাই পেড়ে কুনাল ডাক্তার একটা নিশ্চিত মৃত্যু-পথযাত্রীর ইন্সওরেন্স পলিসিতে ডাক্তার হিসাবে স্বাক্ষর দিল।

দরজা খুলেই কিন্তু ভূত দেখেল যেন।

খোলা দরজার ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে—কুনাল নয়, বন্দনা।

—ছোটখুকি! তুই ?

দিদির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দনা বলে, হ্যাঁ আমিই! এখন মার আর ধর, আমি কিচ্ছুটি বলব না।

অতসীর অশ্রুর উৎস তাহলে এখনও নিঃশেষিত হয়নি ? ছোটবোনের অশ্রুসিক্ত মুখটা দুহাতে তুলে ধরে বললে, অ্যাদ্দিনে মনে পড়ল মুখপুড়ি।

—হ্যাঁ পড়ল। অমন একটা কথা শুনেও কি পোড়া মুখটা লুকিয়ে রাখব ?

—'অমন একটা কথা' মানে ? কী কথা ?

—যে কথাটা তুমি ওকে বারণ করেছিলে আমাকে জানাতে।

এতক্ষণে নজর হল—ছোটখুকির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কুনাল। গরুড় মুদ্রায়। বললে, আসামী হাজির! শাস্তি নিতে। বল, কী শাস্তি বিধান করলে, দেবী ?

অতসী আঁচল দিয়ে চোখ মুছে শুধু বন্দনাকেই বললে, আয়, ভিতরে আয়।

কানের সঙ্গে মাথার মতো বিনা-আহ্বানে কুনালও ভিতরে এল। সদর দরজায় খিল দিতে দিতে একটা স্বগতোক্তি করে: দ্বিরাগমনের জামাই আদর!

অতসী জবাব দেয় না। বন্দনা জানতে চায়, উনি আসেননি ? রঞ্জনবাবু ?

—হ্যাঁ এসেছেন। ঘুমাচ্ছেন।

কুনাল যথারীতি ফোড়ন কাটে, নাড়িটা দেখ্‌তে হচ্ছে। এমন অবেলায় ঘুম?

অতসী বন্দনার দিকে ফিরে বলে, ঘণ্টাখানেক আগে ওকে জানাতে বাধ্য হয়েছি, অসুখটা কী। ও কবিতা লিখতে চাইল। কাগজ কলমের সঙ্গে দুটো কাম্পোজও দিয়েছি ওকে।

কুনাল পুনরায় স্বগতোক্তি করে, কার প্রশমিত হয় কম্পোজে! ভাল ওষুধ।

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে অতসীর। কিন্তু এবারেও সে আত্মসংবরণ করে। বন্দনার সামনে ওকে অপমান করতে মন সরে না। বিশেষ, এটা তারই বাড়ি। কুনাল এ বাড়ির জামাই। আর কথাটাও তো ভুল নয়—ফিরাগমন না হলেও, জামাই হিসাবে এই প্রথম সে এল এ বাড়িতে।

কুনাল নিজেই গোটানো মাদুরটা বারান্দায় পেতে নিল। জুতো-মোজা খুলে পা গুটিয়ে বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরায়। বলে, অতসী! আসামীর সেল্‌ফ-ডিফেন্স না শুনেই কিন্তু ফাঁসির হুকুম দিচ্ছ তুমি।

এতক্ষণে অতসী ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে। বল্‌লে, না। তোমার জবাবদিহিটা আগে শুনতে চাই। কেন তুমি···

—থাক থাক। আমার প্রাথমিক এজাহারটা শোনার পরেই না হয় চার্জ-সীটটা ফ্রেম কর—

বন্দনাও বসে পড়ে। অস্ফুটে দিদিকে বলে, ওর সত্যিই দোষ নেই রে!

বন্দনা কতটুকু জানে? অতসী দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে থাকে উদাস, কিন্তু উৎকর্ণ। কুনালের বক্তব্যটা আগে শোনা যাক।

—শোন বন্দনা। তোমাকেই বল্‌ছি। অনেক-অনেক দিন আগে তোমার দিদির সঙ্গে 'এথিক্স' বিষয়ে আমার একটা অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশান হয়েছিল। আমার পিতৃশত্রু পরম পূজনীয় করালীকিঙ্কর হাত সাফাই করে একটা সাতহাজার টাকার তমশুককে বিশ হাজারে রূপান্তরিত করেছিলেন। কেমন করে ঐ অলৌকিক কাণ্ডটা ঘটেছিল আমি জানি না। বোধকরি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়! এ ভাবে ইচ্ছাময়ীর আশীর্বাদে তিনি সাদা জলকে হামেহাল সরবতে রূপান্তরিত করতে পারেন, তা তুমি জান। আমি তোমার দিদিকে প্রশ্ন করেছিলুম, আমি যদি 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' পদ্ধতিতে প্রতিশোধ নিই, তাতে তাঁর নৈতিক সমর্থন আছে কি না। তিনি জানিয়েছিলেন— সমর্থন নেই! সেটা হবে অধর্ম! আমি মনে না নিলেও মেনে নিয়েছিলুম—কারণ সে আসলে আমি তাঁর করুণার প্রত্যাশী ছিলুম। তিনি অকরুণ হয়ে তা সত্ত্বেও দূরে সরে গেলেন---তাও তোমার অজানা

নয়। তারপর অনেক-অনেক দিন কেটে গেছে। হঠাৎ সম্প্রতি এল একটা সুযোগ। এবার আমি সে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেছি। লোকটা আমার বাড়িতে এল একটা বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে। একটি সম্ভাব্য লিউকেমিয়া রোগীর ব্লাড-কাউন্ট করে বাৎলে দিতে হবে, তার ঐ শিবের অসাধ্য ব্যামোটা হয়েছে কিনা। এমনটা তো হতেই পারে। কিন্তু লোকটা আরও জানতে চাইল—যদি পজেটিভ রিপোর্ট পাই, তাহলে আমাকে বলে দিতে হবে রোগী ক-মাস বাঁচবে। কেন রে বাপু? এতটা অ্যাকুরেট হিসাবের কী দরকার? আমি যখন মনে মনে ধাঁধাটা সল্‌ভ করছি, তখন একই নিঃশ্বাসে অর্থপিশাচটা জানতে চাইল আমি এল, আই, সি-র এন্‌লিস্টেড ডাক্তার কি না। ধাঁধার উত্তরটা বুঝে ফেললুম। প্রথমটা আমি ভেবেছিলুম, কোনও উত্তরাধিকার বা উইল ঘটিত ব্যাপার; কিংবা ও জানতে চায়—কোনও অধমর্ণের রক্ত কতদিন শোষণ করা চলবে। কিন্তু এল, আই, সি সংক্রান্ত প্রশ্নটা পেশ করায় আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না। পরে দেখা গেল—রুগী হচ্ছে রঞ্জন চক্রোত্ত। ঠিক হ্যায়। রুগীর পরিচয়ে আমার কী দরকার? কিন্তু না। অচিরেই জানতে পারলুম, ঐ রঞ্জন চক্রবর্তী এমন একজন মহিলা অন্তর রঞ্জিত করাছলেন, যে হৃদয়ের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি কুনাল ডাক্তার। আমি ব্লাড-সাম্পেল নিয়ে এলুম। বারে বারে পরীক্ষা করে দেখলুম, সে নির্দোষ। তার লিউকেমিয়া হয়নি। কিছুদিন চেঞ্জে গিয়ে থাকলে —কলকাতার এই দূষিত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে কোন খোলামেলা আবহাওয়ায়…

অতসী বাধা দিয়ে বলে, য়ু মীন, তুমি ওর নেগেটিভ রিপোর্ট পেয়েছিলে?

বাহুল্যবোধে কুনাল সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে চলে,

—কিন্তু বাড়ির দলিল আর বন্ধকী তমশুকটা এই মওকায় আমাকে হাতাতে হবে। এ ছাড়া অস্বীকার করব না—যে লোকটা হাত সাফাই করে এতদিন আমার রক্ত চুষেছে তার উপর হাতসাফাই করেই প্রতিশোধ নেবার একটা উদগ্র বাসনা ছিল আমার। তৃতীয়ত, বুড়ো ভামটার ঘাড় ভেঙে যদি ঐ বেকার পাগল কবিটার একটা উপকার করা যায়—সেটাই বা মন্দ কী? একটা 'অ্যাকিউট কেস অব লিউকেমিয়ার' স্লাইড নিয়ে পি, এম ৪০৩, রঞ্জন চক্রবর্তীর নামে চিহ্নিত করে রিপোর্ট তৈরী করলুম। খামের উপরেও লিখলুম রঞ্জনের নাম। বড়শির মাথায় ঐ টোপটা গেঁথে দেরাজে বন্ধ করে আমি ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে থাকি। রাত দশটায় ডিস্‌পেন্সারি বন্ধ হবার মুখে পিশাচটা এল। এসে হাঁ করল। আমি রঞ্জনের নামটুকু মুছে ফেলে ওর মুখ-গহ্বরে

স্লাইডটা ফেলে দিলুম। ও কপাৎ করে গিলে ফেলল··শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি! দুজনেই জানি, পার্টনার ইন ক্রাইম সুযোগ পেলেই ডবল্-ক্রস করবে। দুজনেই সতর্ক। পরস্পরের মৃত্যুবাণ নিজের এক্তিয়ারে রাখতে চাইছি। ফলে করালী প্রথমেই সেই স্লাইডটা নিয়ে আর কোন একজন অথবা একাধিক স্পেশালিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল। সকলের প্রগ্‌নসিস্‌ই হুবহু মিলে গেল। এ রোগী তিন-চার মাসের মধ্যে শিওফুঁকে ন মনিকে পাইয়ে দেবে নগদ বিশ হাজার টাকা। হ্যাঁ, লোভটা বাড়তে বাড়তে অঙ্কটা ঐ বিশ হাজারেই উঠেছিল। করালী বদান্যতা দেখিয়ে রঞ্জনের গর্ভোধারিণীর প্রতি করুণা প্রকাশ করল। পাঁচশ টাকা মাস মাহিনায় রঞ্জনকে বহাল করল ম্যানেজার পদে। আর নেমকহারাম ছোকরা সেই সাঁওতালী গাঁয়ে গিয়ে দিনকে দিন তাগড়াই কোঁৎকা হয়ে উঠতে শুরু করল! বেচারি করালীকিঙ্কর! সে স্বপ্নেও ভাবেনি, ছেলেটা বহাল তবিয়তে বছরের পর বছর টিকে থাকবে, প্রৌঢ় হবে, বৃদ্ধ হবে, তবু মরবে না!·····একী? একী? অতসীর কী হল?

বন্দনা তার দিদির এলিয়ে পড়া দেহটা জড়িয়ে ধরে স্বামীকে ধমক দেয়, রঙ্গ-রসিকতা বন্ধ রেখে একটু ওষুধ মষুধ দাও না বাপু!

—কিচ্ছু দরকার নেই! তোমার দিদি আনন্দে হার্টফেল করবে না। বাকিটা শোন: বুঝলে বন্দনা! তোমার দিদির বিশ্বাস—তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন শুধু পরের উপকার করতে! পরের জন্য প্রাণ দিতে। তাই তাঁকে মিথ্যার কুহকে প্রলুব্ধ করেছিলুম একটি মৃত্যুপথযাত্রীর শেষের কটা দিন মধুর রসে ভরে দিতে। তার মানে আর এক জাতের টোপ। তোমার দিদিও এসেছিলেন আমার ল্যাবরেটারিতে। সেদিনও আমি টোপ নিয়ে বসেছিলুম ছিপ হাতে। তিনি হাঁ করলেন; আমি ওঁর মুখবিবরে ফেলে দিলুম পরোপকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার টোপটা। তিনিও কপাৎ করে গিলে ফেললেন!···কিন্তু ছিপে খেলিয়ে তোলা বড় সহজ নয়। ঐ পাগল কবিটা ব্যাগড়বাই শুরু করল। তোমার দিদির সঙ্গে তার কী নিয়ে মন কষাকষি বুঝে উঠতে পারি না—কিন্তু খবর পেলুম—দুজনের পত্রালাপ বন্ধ। মুখ দেখাদেখি নেই। সাঁওতালী গ্রামটার নামটাও ছাই জানি না। অগত্যা ঠিকানা সংগ্রহের জন্য দৌড়াতে হল বাণ্ডইআটি। লোক পাঠিয়ে রীতিমতো গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সাহায্যে আসামীকে ধরে এনেছি। আমার এজাহারের এখানেই সমাপ্তি। শুধু একটা করুণ অধ্যায় নিবেদন করার আছে। দিন-তিনেক আগে অভ্রান্ত গ্রহাচার্য-মশাই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, বাবাজী, আমি আর কিছু চাই না—শুধু বুঝিয়ে বল দিকিন্, তুমি হাত-

সাকাইটা করলে কখন? আমি বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলেছিলুম, এটা কী বলছেন কপালীকাকা! ছি ছি ছি। হাতসাফাই কেন হবে? ডাক্তার মাত্রেই তো ভুল করে। আমি একা তো নই। তিন তিনজন ডাক্তার একই ভুল কেন করবে বলুন? এ অলৌকিক ঘটনার একমাত্র ব্যাখ্যা—অঘটন আজও ঘটে। আপনি-আমি তো নিমিত্ত মাত্র। এ শুধু ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা!

অতসী আর বন্দনা দুজনেই খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে।

কুনাল হাত দুটি জোড় করে বলে, আমার এজাহার শেষ হয়েছে হুজুরাহন। এবার বলুন, কী শাস্তি আমার প্রাপ্য?

অতসী হাতপাখার বাঁট দিয়ে ওর পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বলে, এই শাস্তি। এবার বল তো ডাক্তার-সাহেব—ঐ ঘুমন্ত মানুষটাকে এখনই টেনে তোলা কি ঠিক হবে?

কুনাল এক বিঘৎ জিব বার করে বললে, সর্বনাশ! কক্ষণো নয়। মাঝরাতে কাম-পোজের রুগীর ঘুম ভাঙাতে হবে—ওর কানে কানে শোনাতে হবে কাম-মোহিতের শুভ-বার্তা। ধীরে ধীরে, সইয়ে, সইয়ে-বসিয়ে-বসিয়ে। রঞ্জনের ঐ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাকষার কবিতাটা এখনও শেষ হয়নি তো। হঠাৎ এই দুঃসংবাদটা শুনলে অসমাপ্ত কবিতার দুঃখে রঞ্জন হার্টফেল করতে পারে।

অতসীর বারে বারে চোখে জল আসছে। জুৎসই জবাব জোগাচ্ছে না তার মুখে। বন্দনা তার দিদিকে মদৎ দিতে এগিয়ে আসে। বলে, 'রঞ্জন' কী? তোমার বড় ভায়রা নয়? 'বড়দা' বলবে।

—সে হালুয়া। অতসী আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। ও ছোকরা আবার অতসীর চেয়ে…

—খবরদার! দিদির নাম ধরে ডাকবার হক্ আছে তোমার। আমি কিছু মনে করব না। যেহেতু এককালে তুমি তার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করেছ, কিন্তু জামাইবাবুকে কক্ষণো 'ছোকরা ছোকরা' বলবে না বলছি!

এবার অতসীর হাতের তালপাখার বাড়িটা পড়ল তার ছোটখুকির পিঠে।

—